দ্বীনী দাওয়াত

হযরত মাওলানা ইলয়াস
(রহমতুল্লাহি আলাইহি)
ও তাঁর

দ্বীনী দাওয়াত

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

মোহাম্মদী বুক হাউস
৫০,বাংলাবাজার,ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস (রহঃ) ও তাঁর

দ্বীনী দাওয়াত

মূল

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদঃ

মওলানা আবু তাহের মেসবাহ

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দাওয়াতের নববী উছূল

হযরত আল্লামা সৈয়দ সোলাইমান নদভী (রঃ)

'মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার কাজ যখন শেষ প্রায় তখন সৈয়দ ছাহেবকে একটি পরিচিতি-ভূমিকা লেখার অনুরোধ করা হলো। নীচের প্রবন্ধটি সে অনুরোধেরই ফসল। তবে গ্রন্থ-ভূমিকা হিসাবে লেখা হলেও উপযোগিতার দিক থেকে এ লেখা অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রবন্ধের স্বকীয় মর্যাদারও অধিকারী। সুপ্রিয় পাঠক ও তাবলীগী মেহনতে নিবেদিত সাথী বন্ধুরা যদি গভীর চিন্তামনস্কতার সাথে এ লেখা পড়েন তাহলে তারা অত্যন্ত কল্যাণপ্রসূ ও অন্তর্জ্ঞান প্রসারী দিকনির্দেশনা পাবেন আশা করি।

–মুহাম্মদ মনযুর নোমানী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

ইসলাম এক ঐশী জীবনবিধান আর মুসলিম উম্মাহ হলো সে জীবনবিধানের ধারক, বাহক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মুসলিম জনসাধারণই শুধু নয় বরং ওলামা ও মাশায়েখগণ পর্যন্ত অবহেলা উদাসীনতায় এ মহাসত্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন। ফলে মুসলমানরাও আজ পৃথিবীর অপরাপর জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার সংজ্ঞা অনুসারে নিজেদেরকে নিছক একটি জাতি রূপে ধারণা করে থাকে। একদল তাদের জাতীয়সত্তার সৌধ নির্মাণ করেছে ভৌগলিক সীমারেখার উপর। আর অন্য দল ভাষা, বর্ণ বা রক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর। মুসলিম সমাজে যাদের কিছুটা বোধ ও বুদ্ধি আছে তারা খুব বেশী হলে এই মনে করেন যে, মুসলমানদের জাতিসত্তা অঞ্চল ও ভাষাভিত্তিক নয় বরং এক ধর্মভিত্তিক। অথচ প্রকৃত সত্য তাদেরও চিন্তা-রেখার বহু উর্ধ্বে। আর তা এই

যে, মুসলমান হলো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ পায়গাম বহনকারী জাম'আত, যাদের একমাত্র জীবন–কর্তব্য হলো এ পায়গামকে রক্ষা করা এবং সার্বজনীন দাওয়াতের মাধ্যমে মানব সমাজে এর প্রসার ঘটানো। এ পায়গাম ও জীবনবিধান গ্রহণকারীরা ভাষা বর্ণ ও ভৌগলিকতার উর্ধ্বে সুনির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব সম্পন্ন এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত। এ পরিবার–বন্ধনই হলো তাদের জাতীয়তা এবং এখানেই মুসলিম জাতীয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

এ পরম সত্য অনুধাবনের পর মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো পূর্ণ জ্ঞান অর্জনপূর্বক এই আসমানী পায়গাম অনুসরণ করা এবং তালীম ও দাওয়াতের মাধ্যমে এর প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করা এবং এর অনুসারীদের নিয়ে পূর্ণ দায়দায়িত্বমূলক একটি সার্বজনীন ভ্রাতৃ–পরিবার গঠন করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, মাত্র এক শতাব্দীর সময় ব্যবধানেই মুসলিম উম্মাহ তাদের এই জাতীয় দায়িত্ব বিলকুল ভুলে গিয়েছিলো। আমাদের শাসকবর্গ দেশ জয় ও দেশ শাসনে তুষ্ট ছিলেন এবং রাজস্ব–সম্পদের স্রোতে গা ভাসানো এবং বিলাস জৌলুস ভোগ করাকেই জীবনের সার্থকতা ভেবে বসেছিলেন। আলিম ওলামা ও জ্ঞানসেবীগণ পঠন–পাঠন ও নিবিষ্ট অধ্যয়নেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। দায়মুক্ত নির্ঝট জীবনই ছিলো তাদের কাম্য। অন্যদিকে মাশায়েখ ও ছুফী দরবেশগণ খানকার ভাবগম্ভীর পরিবেশেই আত্মসমাহিত ছিলেন। জীবনের কোলাহল ও জিন্দেগীর তুফান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। ফল এই দাঁড়াল যে, নেতৃত্ব ও পথ নির্দেশনাহীন মুসলিম উম্মাহ তার নিজস্ব অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে গাফেল ও বেখবর হয়ে গেলো এবং উম্মাহর সকল শ্রেণীর দৃষ্টিপথ থেকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে গেলো।

মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব

কোরআন সুন্নাহর প্রত্যক্ষ বাণী ও নির্দেশ থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহ তাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুবর্তিতায় বিশ্বের সকল জাতির কল্যাণ ও হিদায়াতের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত এবং বিশ্বসভায় 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' এর সুমহান দাওয়াতি দায়িত্ব পালনের জন্যই তারা উত্থিত। তাই আলকোরআন পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায়

ঘোষণা করছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে মানুষের (কল্যাণের) জন্য। তোমরা সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মন্দকাজ হতে নিবৃত্ত করবে।

আলোচ্য আয়াতের বাণীনির্যাস এই যে, বিশ্ব জাতিবর্গের কল্যাণ স্বার্থেই মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীর বুকে কল্যাণ ও সুকৃতির প্রসার এবং অকল্যাণ ও কুকৃতির প্রতিরোধের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার সেবা করে যাওয়াই তার অস্তিত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের প্রতি মুসলিম উম্মাহ যদি অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করে তবে সে তার 'জীবন–লক্ষ্য' অর্জনে ব্যর্থ প্রমাণিত হবে এবং তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতাই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। এর কয়েক আয়াত উপরে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এ আসমানী দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া প্রত্যেক যুগের (প্রত্যেক অঞ্চলের) মুসলমানদের উপর কেফায়া (বা আপেক্ষিক) ফরয। অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ মুসলিম জামা'আতকে এ কাজে অবশ্যই লেগে থাকতে হবে। যদি মুসলিম উম্মাহর সকলেই এ দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তাহলে গোটা উম্মাহ দায়িত্ব বিচ্যুতির অপরাধে পাকড়াও হবে। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত সংখ্যক জামাত এ কাজে নিয়োজিত থাকলে গোটা উম্মাহর পক্ষ হতে ফরয আদায় হয়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছে–

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *

তোমাদের একটি জামাত অবশ্যই এমন থাকা চাই; যারা কল্যাণের পথে ডাকে এবং সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত করে আর এরাই হলো সফলকাম।

এখানে দাওয়াতি জামাতকেই গোটা উম্মাহর কামিয়াবি ও সফলতার যিম্মাদার সাব্যস্ত করে তাদের মোট তিনটি কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। যথা– মুসলিম উম্মাহ তথা গোটা বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের পথে আহ্বান। সৎ

কাজের প্রসার এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ। মুসলিম উম্মাহর মাঝে এ মুবারক জামাত যতদিন যে হারে বিদ্যমান ছিলো (ততদিন সে হারে দাওয়াত ও তাবলীগের এ গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায় হয়ে এসেছে। কিন্তু 'খায়রুল কুরূন' বিষয়ক হাদীছ [১] অনুসারে ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনপরবর্তী যুগে ক্রমসংকোচনের ফলে দাওয়াতি মেহনত জামাত–পর্যায় থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে নেমে এসেছিলো।

রাজ্যক্ষমতা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়

মূলতঃ 'রাজ্য ও রাজস্ব'কে জীবনের চরম ও পরম মনে করার কারণেই এ পথে সবচেয়ে বড় গোমরাহির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে হাদীছে নববীর এ সতর্কবাণী–

إِنِّىَ لَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الفَقْرَ وَ لٰكِنْ اَخَافُ اَن تُبْسَطَ عَلَيْكُم الدُّنْيَا

আমি তোমাদের অভাব–দারিদ্র্য নিয়ে শংকিত নই। আমি বরং শংকিত (সমাগত ভবিষ্যতে) তোমাদের উপর দুনিয়ার ছড়াছড়ি নিয়ে।

মুসলমানদের উপর পৃথিবী যখন সম্পদ প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের ছায়া বিস্তার করলো তখন রাজ্য শাসন ও রাজস্ব গ্রহণকেই তারা নিজেদের জীবন–স্বার্থকতা বলে ধরে নিলো এবং ইসলামের বিজয় ছেড়ে মুসলমানদের রাজ্য জয় নিয়েই তুষ্ট হয়ে গেলো। অর্থাৎ মুসলিম পরিচয়ধারী শাসকের দেশ শাসনকেই তারা পরম প্রাপ্তি মনে করে বসলো। অথচ আসল উদ্দেশ্য তো ছিলো ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী সিয়াসতের ইনসাফপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেশ জয় ও শাসন ক্ষমতাকে এ পথের সর্বাধিক শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা। এ ভাববক্তব্যই এসেছে সামনের আয়াতে–

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ

১। خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

আমার যুগই হলো সর্বোত্তম যুগ, তারপর যারা এর সংলগ্ন, তারপর যারা এর সংলগ্ন।

وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ *

ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে পৃথিবীতে আমি শাসন ক্ষমতা দিলে তারা ছালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত করবে। আর সর্বকর্মের পরিণতি আল্লাহরই অধিকারে।

মুসলিম উম্মাহ নবীর স্থলবর্তীঃ

নবুওয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ হলো নবীর স্থলবর্তী। তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে তিনটি নববী দায়িত্ব দান করা হয়েছে অর্থাৎ আহকাম ও বিধানের পাঠদান, কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান এবং আত্মসংশোধন–এগুলো মুসলিম উম্মাহর উপরও ফরয়ে কিফায়ারূপে অর্পিত হয়েছে এবং যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর বরেণ্য ইমামগণ পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে এ তিন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। তাঁদেরই মেহনত মুজাহাদার নূরানী বরকতে জগত এখনও ইসলামের রোশনীতে ঝলমল। আলোচ্য 'দায়িত্বত্রয়' সামনের আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে।

رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ *

এবং তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন।

শিক্ষা ও দীক্ষার সমন্বয়

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত 'দায়িত্বত্রয়' অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। মানুষকে তিনি আল্লাহর আয়াত ও আহকাম শুনিয়েছেন এবং আসমানী কালাম ও রব্বানী হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এখানেই তিনি দায়িত্ব শেষ করেননি। বরং আপন নূরানী ছোহবত ও সংস্পর্শ দ্বারা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা দ্বারা হৃদয় ও আত্মার যাবতীয়

কলুষ কালিমা থেকে তাদেরকে পবিত্রও করেছেন। কলবের রোগ ব্যাধির সুচিকিৎসা করেছেন এবং পাপ পংকিলতা দূর করে মানব চরিত্রকে শিশির ধোয়া ফুলের সৌন্দর্য দান করেছেন। এভাবে জাহেরী ও বাতেনী–এ উভয় দায়িত্ব সমান গুরুত্বের সাথে যুগপৎ আঞ্জাম পেয়ে এসেছে। পরবর্তী তিন 'কল্যাণযুগ' পর্যন্ত উভয় ধারার মিশ্র প্রবাহই বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ যিনি ওস্তাদ ছিলেন তিনিই শায়খ ছিলেন। যিনি দরসের মসনদ আলো করে বসতেন তিনিই নির্জন রাতের নিদ্রাপুরীতে যিকিরের জীবন–স্পন্দন জাগাতেন এবং অনুগামীদের তাযকিয়া ও আত্মসংশোধনের দায়িত্ব পালন করতেন। মোটকথা, ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন– এই তিন কল্যাণযুগে উস্তাদ ও শায়খ তথা 'শিক্ষীক ও দীক্ষক' এর বিভাজন মোটেই নজরে পড়ে না।

শিক্ষা ও দীক্ষার বিভাজন

উম্মাহর জীবনে তারপর এমন একটা সময় শুরু হলো যখন জাহেরী ইলমের বিদগ্ধ জ্ঞানীগণ হয়ে পড়লেন বাতেনী জগতে 'শূন্যহৃদয়।' পক্ষান্তরে বাতেনী জগতের জীবন্ত হৃদয় পুরুষগণ জাহেরী ইলম থেকে হয়ে গেলেন অজ্ঞ–বঞ্চিত। যুগ হতে যুগান্তরে যাহির ও বাতিনের এ ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়েই চললো। শেষ পর্যন্ত 'শিক্ষার' জন্য মাদরাসার এবং 'দীক্ষার' জন্য খানকাহর পৃথক অস্তিত্ব দেখা দিল এবং মসজিদে নববীর এ মিশ্র আলোকধারার তাজাল্লী ও বিকিরণ মাদরাসা ও খানকাহর আলাদা ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়লো। ফল এই দাঁড়ালো যে, মাদরাসা থেকে ওলামায়ে দ্বীনের পরিবর্তে ওলামায়ে দুনিয়া বের হতে লাগলো। অন্যদিকে খানকাহর অধিবাসীরা ইলম ও শরীয়তের উচ্চমার্গীয় জ্ঞান–রহস্য হতে অজ্ঞ–বঞ্চিত থেকে গেলো।

শিক্ষা ও দীক্ষার ঐক্যেই সফলতা

অবশ্য কল্যাণ যুগোত্তর সময়েও কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবধারা অব্যাহত ছিলো, যাঁদের মাঝে নূরে নবুওয়তের এ দুই বর্ণচ্ছটার একত্র প্রতিফলন ঘটেছিলো। আর গভীর পর্যবেক্ষণে এটাই দেখা যায় যে, নূরে নবুওয়তের উভয় ধারার ধারক ছিলেন যাঁরা তাঁদের দ্বারাই ইসলাম উপকৃত

হয়েছে এবং ইসলামী উম্মাহ ফয়েয হাছিল করেছে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)–এর সযত্ন পরিচর্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও শরীয়তি জ্ঞান যেমন সজীবতা লাভ করেছে তেমনি হাকীকত ও মারেফাতের ইলমও তাঁরই মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হযরত শায়খ আবু নাজীব সোহরাওয়ারদী শায়খে তারীকত যেমন ছিলেন তেমনি জগদ্‌বিখ্যাত নিজামিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য অধ্যাপকও ছিলেন। আর হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ)–এর কথা তো বলাইবাহুল্য। একই সাথে বিদগ্ধ আলিম ও শায়খে তারীকত ছিলেন তিনি। এমনকি ইমাম বুখারী, ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ মুহাদ্দিস, যাহেরী ইলমের সাধকরূপেই যাঁদের সাধারণ পরিচিতি তাঁরাও জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের সার্বিকতার অধিকারী ছিলেন। মধ্যস্তরীয় আলিমদের মধ্যে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও হাফেয ইবনে কাইয়িম (রহঃ)–কে 'অজ্ঞ' লোকেরা 'বিশুষ্ক হৃদয়' মনে করলেও তাঁদের জীবনচরিত কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কল্যাণসুধায় পরিপূর্ণ। ইবনুল কাইয়িমের مَنَازِلُ السَّالِكِيْنَ ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন, সহজেই বোঝা যাবে যে, 'জৌলুস ও আত্মসৌন্দর্য' উভয় সাজেই তিনি সজ্জিত ছিলেন।

ভারতবর্ষেও ঐ সকল মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব গুণেই ইসলামের আলো প্রসার লাভ করেছে যাঁদের মাঝে মাদরাসা ও খানকাহর গুণসার্বিকতা বিরাজমান ছিলো। আর যেহেতু তাঁরা নববী আদর্শের নিকটতর ছিলেন সেহেতু তাঁদের রূহানী ফয়েয ও বরকত দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছিলো। দিল্লীর আকাশের নক্ষত্র শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ) থেকে শুরু করে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) পর্যন্ত একে একে সবাইকে দেখুন; জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের অপূর্ব সম্মিলনদৃশ্যই আপনার চোখে পড়বে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে তাঁদের ফয়য–বরকতের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ব্যাপ্তি পরিস্ফুট হবে। তালিমের মসনদে বসে তারা يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ এর প্রদীপ্ত প্রকাশ ঘটাতেন। আবার খানকাহর ভাবগম্ভীর পরিবেশে يُزَكِّيْهِمْ এর তাজাল্লী বিকিরণ করতেন।

পরবর্তীকালে যাঁরা এ মহান উত্তরাধিকার ধারণ করেছিলেন তাঁদের পরিচয় বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ

নূরাণী চেহারায় আজীবন সিজদার নিশানিতেই তাঁদের পরিচয়–বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পৃথিবী তাঁদের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ করেছে এবং দ্বীনি তাবলীগ ও আত্মসংশোধনের যে মহান খিদমত তাঁদের দ্বারা আঞ্জাম পেয়েছে তা থেকেও যাহির–বাতিন তথা জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের এ সার্বিকতাই প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহর চিরন্তন বিধান হিসাবে আগামী পৃথিবীতেও দ্বীনের ফয়েয ও বরকত তাঁদেরই দ্বারা প্রসার লাভ করবে, যাঁদের ব্যক্তি সত্তায় মাদরাসা ও খানকাহর উভয় শ্রোত অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে। مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ উভয় 'জলধী' কে তিনি দান করেছেন অভিন্ন প্রবাহ।

বস্তুতঃ বিনিদ্র রাতের অশ্রুধারায় চোখের জ্যোতি উজ্জ্বলতা পায়। আর মুখের ভাষা সজীব হয় যিকিরের ফল্গুধারায়। ইসলামের ইতিহাসে তাই দেখা যায়; যাঁরা ছিলেন নিঝুম রাতের ইবাদতগুজার তারাই ছিলেন যুদ্ধদিনের সিপাহী শাহসওয়ার সুদীর্ঘ তেরশ বছরের জীবন–চরিত ভাণ্ডার এ দাবীর সত্যতাই প্রমাণ করে। হৃদয়ের উষ্ণতা ছাড়া মুখের মুখরতা কিংবা কলমের গতি–চঞ্চলতা মরীচিকার ছলনা মাত্র। ক্ষণিক ঝলমলানি যতই মুগ্ধতা আনুক, জীবন পিপাসায় শীতলতার পরশ থেকে তা একেবারে বঞ্চিত।

নবুওয়তি ভাবধারাই উম্মতের জীবনধারা

এটা অবধারিত সত্য যে, নবুওয়তের মেযাজ ও ভাবধারা থেকেই মুসলিম উম্মাহর প্রাণ ও জীবনধারা উৎসারিত হতে পারে। এর বিশেষ কারণ এই যে, প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠীর স্বকীয় স্বভাব ও নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে। কোন সংস্কার ও সংশোধন প্রয়াশ যতক্ষণ জাতীয় স্বভাব ও প্রকৃতির অনুকূল না হবে ততক্ষণ তা সজীবতা ও সফলতা পেতে পারে না। বর্তমান যুগে বিভিন্ন দল ইসলামী উম্মাহর সংস্কার ও সংশোধন প্রয়াসের দাবীদার। কিন্তু তাদের হাল–অবস্থা কি? একদল তো মনে করে বসলো যে, মুহম্মদী নবুওয়তের যামানা পুরোনো হয়ে গেছে। এখন নতুন যুগের নতুন সমাজ ও নতুন চাহিদার আলোকে স্থানীয় ও দেশীয় নতুন নবুওয়তের প্রয়োজন। এ (উদ্ভট) চিন্তাতাড়িত হয়ে তারা নয়া নবুওয়তের দাওয়াত দিলো এবং যথারীতি ব্যর্থ হলো। মিল্লাতে মুহম্মাদী থেকে তাদের সম্পর্ক কেটে গেলো। আরেকদল মুহম্মদী নবুওয়ত

তো বহাল রাখলো কিন্তু মুহম্মদী ওয়াহীর নয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করলো এবং হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করে কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আপন বুদ্ধিবৃত্তি ও যুগপ্রকৃতিকেই 'নির্ধারক' এর মর্যাদা দিলো, যেন তারা এক নতুন কোরআনের দাবীদার। ফলে মিল্লাতে মুহম্মদীর সাথে এ দলের সম্পর্ক কমজোর হয়ে গেল এবং حسبنا كتاب الله [১] বলে কোরআনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা এবং নামায, রোযা ও হজ্জের নতুন নতুন ধারণার মাধ্যমে এক নতুন শরীয়ত তৈরী হয়ে গেলো। তৃতীয় একদল কিতাবুল্লাহ ও হাদীছে রাসূলুল্লাহকে স্বীকার করেও প্রতিটি আয়াত ও হাদীছকে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করতে চায়। ফলে মুজিযাকে তারা অস্বীকার করেছে। জান্নাত জাহান্নামের হাকীকত উপেক্ষা করেছে এবং রিবা ও সুদের বৈধতা দাবী করে বসেছে। এমনিভাবে জীবনসংশ্লিষ্ট বহু বিষয়কে তারা দ্বীন ও শরীয়তের পরিবর্তে বুদ্ধি ও 'প্রকৃতির নিয়ম' দ্বারা নির্ধারণ করতে চেয়েছে। ফলে অনুগত মুমিন জামা'আত না হয়ে তারা হয়েছে দ্বীনে মুহম্মদীর বিকৃত ব্যাখ্যাকারী জামাত। নতুন চিন্তার তৃতীয় একটি দলও আত্মপ্রকাশ করেছে। নবুওয়ত বা কোরআনের নবায়ন তাদের দাবী নয়। নামায, রোযা ও হজ্জের আধুনিক রূপায়ণও তাদের কাম্য নয়। কিন্তু এক নতুন ইমামত ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অভিলাষী তারা, যার মাধ্যমে ইসলামের 'নতুন ব্যবস্থা' গড়ে উঠবে। ঈমান, কুফর, নেফাক, ও আমীরের আনুগত্যসম্পর্কিত নতুন রূপরেখা তৈরী হবে এবং মুসলিম সমাজে ইউরোপীয় 'ইজম' ধর্মী এক নুতন আন্দোলনের সূচনা ঘটবে। বিশেষতঃ মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়ের মাঝে ইজমীয় উম্মাদনার সাহায্যে এই 'ইসলামি ইজম' ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং কালাম ও ফিকাহ শাস্ত্রীয় বিষয়ে নতুন ইজতিহাদী ধারায় নিজস্ব সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। বর্তমান বিপ্লববাদী যুগে হয়ত বা এ দল অস্থির তরুণ সমাজকে স্থির ও আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে 'সফল' প্রমাণিত হবে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির চোরা পথে ইলহাদ তথা নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার যে ঢল নেমে আসছে তার মুকাবেলায় 'কার্যকর' ঢাল হতে পারে। কিন্তু এই অভিনব চিন্তা ও পন্থা উম্মতের সর্বস্তরে গ্রহণ–উপযোগী নয় (এবং নতুন

১। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

ফেতনার সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত নয়)। و لعل الله يحدث بعد ذلك امرا (হয়ত বা আল্লাহ এরপর কোন সমাধানের 'উদ্ভব' ঘটাবেন।)

মোটকথা, উম্মতে মুহম্মদীর মেযাজ ও স্বভাব প্রকৃতির অপরিহার্য দাবী এই যে, দা'ঈ, দাওয়াত ও দাওয়াতি তরীকা-এ তিনটি বিষয় পূর্ণাংগভাবে নববী সুন্নত ও নববী তরীকা মুতাবেক হবে। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রে দা'ঈ নিজেও হবেন প্রথম দা'ঈ মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বন যত 'নিবিড়' হবে দাওয়াতের প্রাণশক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর দাওয়াতও হবে নববী দাওয়াতের অভিন্ন প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ দাওয়াত হবে খালেছ ঈমান, ইসলাম ও নেক আমলের। সর্বোপরি ইসলামের প্রথম দা'ঈ জনাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দাওয়াতি তরীকা গ্রহণ করেছিলেন সেটাই হবে আমাদের দাওয়াতি জীবনের তরীকা। বলাবাহুল্য যে, এ তিনটি ক্ষেত্রে নবুওয়াত যুগের সাথে যত নিকট সাদৃশ্য বজায় থাকবে দাওয়াতের প্রাণশক্তি এবং প্রভাব ও বিস্তৃতিও সেই পরিমাণে হবে। লক্ষ্যচ্যুতি ও পদস্খলন হতে নিরাপদ থাকা এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে স্থির, অবিচল থাকাও তত সহজ হবে। যুগে যুগে যে সকল মহান সংস্কারকের সংস্কার-প্রচেষ্টাকে উম্মাহ সাদরে গ্রহণ করেছে তাঁদের জীবন-ইতিহাসও উপরোল্লেখিত মূলতত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করে।

মোটকথা, দাওয়াতের কামিয়াবির জন্য অপরিহার্য শর্ত এই যে, ইলম ও আমল, চিন্তা ও চেতনা, দাওয়াতি পথ ও পন্থা এবং রুচি ও মেযাজের ক্ষেত্রে দা'ঈ হবেন সকল নবী-রাসূল, বিশেষতঃ শেষনবী ও শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। ঈমানী বিশুদ্ধতা ও দৃশ্যগত আমলি পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি তার অন্তর্গত অবস্থাও হবে নবুওয়তি রূপ-প্রকৃতির অনুগামী। আল্লাহপ্রেম, আল্লাহভীতি ও আল্লাহমুখী সম্পর্কের ভাব ও ভাবনায় তিনি হবেন বলীয়ান। আচার আচরণে নববী সুন্নত অনুসরণে তিনি হবেন স্বতঃস্ফূর্ত। আল্লাহরই জন্য হবে কারো প্রতি তার ক্রোধ ও ভালবাসা এবং বিদ্বেষ ও অনুকম্পা। উম্মাহর প্রতি গভীর মমতা এবং মানবতার প্রতি উপচে পড়া দরদ হবে তার দাওয়াত ও সংস্কার প্রয়াসের

চালিকা শক্তি এবং আম্বিয়া কেরামের বারংবার ঘোষিত মূলনীতি إِنْ أَجْـرِىَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ ১ অনুযায়ী আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না তার। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে তিনি হবেন এমন নিবেদিতপ্রাণ ও সমর্পিতচিত্ত যে, পদ ও পদবী, সম্পদ ও প্রাচুর্য এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের মোহ কিংবা আয়েসী জীবনের ভোগ বিলাসের হাতছানি কোন কিছু তার সংগ্রামমুখর ও বিপদসংকুল পথ চলার মুখে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না।

তার 'উঠা-বসা, চলা-ফেরা, বলা-কওয়া; মোটকথা জীবনের প্রতিটি গতি ও স্পন্দন হবে একমুখী ও এককেন্দ্রিক।

إِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

আমার ছালাত ও ইবাদাত এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

আমাদের আলোচিত ব্যক্তি— এ মাপকাঠিতে

আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে যে মহান দা'ঈ ও তাঁর দাওয়াতি মেহনতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; আমার দু'চোখের সৌভাগ্য এই যে, আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর নূরাণী চেহারার প্রতিটি ভাবরেখা, তাঁর ঘর-বাহিরের বিভিন্ন গতিবিধি ও আচরণধারা এবং তাঁর ভিতরের দরদ ও অন্তর্জ্বালা বারবার আমি দেখেছি, শুনেছি এবং কাছে থেকে অনুভব করেছি। কপালে যাদের এ সৌভাগ্য জুটেনি তারা সজাগ অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে এ বইটি পড়ুন; এ সব ক'টি বিষয় আপনার সামনে বেশ পরিস্ফুট হবে। সেই সাথে দাওয়াতের উছূল ও কর্মপন্থা এবং দাওয়াতের হাকীকত ও সারবত্তা পূর্ণ হৃদয়ংগম হবে।

ওয়ালিউল্লাহী খান্দান

শেষ যুগের মুসলিম ভারতে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ)-এর

১। আমার আজর ও প্রতিদান আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না।

খান্দানকে আল্লাহ পাক এতদঞ্চলের 'মেরুকেন্দ্রের' মর্যাদা দান করেছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষে তৈমুর বংশীয় শাসকদের ভ্রান্ত শাসনে ইসলামের যে ক্ষতিসাধন হয়েছিলো তার ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের সুমহান দায়িত্ব এ ভাগ্যবান পরিবারের ওলামা মাশায়েখ ও তাঁদের অনুগামীদের হাতেই অর্পিত হয়েছিলো। সে ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে। আজকের এ দাওয়াতি মেহনতের প্রবর্তক–পুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস (রহঃ) এ 'স্বর্ণসূত্রের' সাথেই সম্পৃক্ত।

আমাদের আলোচিত ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)–এর প্রমাতামহ মাওলানা মুযাফফর হোসাইন ছাহেব ছিলেন হযরত শাহ মুহম্মদ ইসহাক (রহঃ)–এর প্রিয়তম ছাত্র এবং হযরত শাহ মুহম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রহঃ)–এর বিশিষ্ট শিষ্য ও খলিফা। অন্যদিকে মাওলানা মুযাফফর ছাহেব (রহঃ)–এর আপন চাচা মুফতী এলাহী বখশ (রহঃ) ছিলেন হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) এর বিশিষ্ট ছাত্র ও নিবেদিতপ্রাণ শিষ্য। পরবর্তীতে তিনি আপন শায়খ (হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহঃ)–এর খলীফা হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)–এর হাতে বাইআত হন। চাচা–ভাতিজা উভয়ে ছিলেন সমকালের স্বনামধন্য মুফতি ও শিক্ষক। তাদের তাকওয়া পরহেযগারি ও ধার্মিকতার পূর্ণ প্রভাব খান্দানের অধিকাংশ সদস্যের জীবন ও চরিত্রে বিস্তার লাভ করেছিলো, যার বিশদ বিবরণ সংশ্লিষ্ট জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

হযরত মাওলানার আব্বা ও দু' ভাই ছিলেন উচুঁ স্তরের ধার্মিক পুরুষ ও আধ্যাত্মিক বুজুর্গ। তাঁর আব্বা–ই হলেন প্রথম ব্যক্তি যার সাথে মেওয়াতীদের আন্তরিক ভালবাসা ও হৃদয়–সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। পরবর্তীতে তাঁর বড় ভাই মাওলানা মুহম্মদ ছাহেব (রহঃ) ক্ষুধা–অনাহার ও 'আল্লাহ ভরসা'র পাথেয় সম্বল করে মরহুম পিতার আধ্যাত্মিক মসনদে আসীন হয়েছিলেন। হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) হলেন এ সিলসিলার তৃতীয় পুরুষ।

সমকালীন তাবলীগী মেহনতের ব্যর্থতা ও কারণ

ইংরেজী ১৯২১ সনের পূর্বাপর সময়ের কথা। ভারতবর্ষে আর্য সমাজীয় 'শুদ্ধি আন্দোলনের' প্রভাবে দেহাতি অঞ্চলের অশিক্ষিত নওমুসলিম সমাজে

ধর্মত্যাগের এক দাবানল ছড়িয়ে পড়লো। হঠাৎ জ্বলে উঠা এ দাবানল নিভিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত অস্তিত্ব নিরাপদ করার উদ্বেগ–আকুলতায় মুসলিম সমাজে স্বভাবতঃই সাজসাজ রব পড়ে গেলো। বহু তাবলীগী সংস্থা ও ধর্মপ্রচার সংঘ আত্মপ্রকাশ করলো। বিপুল পরিমাণ চাঁদা সংগৃহীত হলো এবং সর্বত্র বেতনভুক্ত মুবাল্লিগ ছড়িয়ে দেয়া হলো। মুসলিম যুক্তিবাদী ও তর্কবাগিশগণ বাহাস বিতর্কের ঝড় তুলে ময়দান গরম করলেন। বছর কয়েক এ সকল কর্মকাণ্ড বেশ ধুমধামের সাথেই চলতে লাগলো। কিন্তু ধীরে ধীরে এক সময় ধর্ম রক্ষার জোশ–জযবা স্তিমিত হয়ে এলো এবং প্রচার সংস্থাগুলো একে একে বিলুপ্ত হতে লাগলো। অর্থ সংকট ও চাঁদা–স্বল্পতার কারণে মুবাল্লিগগণ চাকুরীচ্যুত হতে থাকলেন। বাহাস বিতর্কের জন্য যুক্তিবাদী আলিমদের দাওয়াত ও চাহিদা হ্রাস পেতে লাগলো। এভাবে এক সময় অশান্ত সমুদ্র বিলকুল শান্ত হয়ে গেলো। কিন্তু কেন এ নিদারুণ ব্যর্থতা? কি এর কারণ? কারণ এই যে, এ সব হুলস্থুল কর্মকাণ্ড কর্মী পুরুষদের আত্মনিমগ্নতা ও হৃদয় নিবিষ্টতার ফসল ছিলো না। দা'ঈ ও মুবাল্লিগদের অন্তরেও ছিলো না দ্বীন ও দ্বীনী দাওয়াতের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ। বরং সবকিছুর মূলে ছিলো মারহাবা ও জিন্দাবাদের মোহ এবং স্থূল মুনাফার লোভ–লালসা। অথচ দাওয়াত ও তাবলীগের আবেগ জযবা এবং আধ্যাত্মিক দীক্ষা দানের মেহনত মুজাহাদা তো বাজার দরে খরিদ করার জিনিস নয়। এটা তো প্রবল ধারায় উৎসারিত হয় আল্লাহতে সমর্পিত হৃদয়ের অন্তসলীলা থেকে।

দাওয়াত ও তাবলীগের নববী নীতি

আম্বিয়া কেরামের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং মেহনত ও মুজাহাদার মূল বুনিয়াদই এই যে, আপন শ্রম ও পরিশ্রমের দান ও প্রতিদান কোন মাখলুকের কাছে তারা আশা করেন না।

وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

এ দাওয়াতি মেহনতের কোন বিনিময় তোমাদের কাছে আমি চাই না। আমার প্রতিদান তো দেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এটাই হলো তাঁদের সকলের সর্বকালের সার্বজনীন সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা।

এমন কি আপন কাজের কোন স্বীকৃতি ও প্রশংসাও তাঁরা কামনা করেন না কোন বান্দার কাছে। যুগে যুগে নববী দাওয়াতের সর্বব্যাপী আকর্ষণ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাবের উৎস হলো দু'টি শক্তি। মাখলুকের যে কোন দান প্রতিদানের প্রতি তাঁদের পূর্ণ বিমুখতা এবং তাঁদের জীবন ও চরিত্রের চিরপবিত্রতা। সূরা ইয়াসীনে সত্যের প্রতি আহ্বানকারী কতিপয় দা'ঈর মর্মস্পর্শী বিবরণ এসেছে। প্রথম দা'ঈকে প্রত্যাখ্যানের পর তাঁর সমর্থনে পরবর্তী দা'ঈর আগমন হলো। অবশেষে শহরপ্রান্ত থেকে এক সৌভাগ্যবান মানবের আবির্ভাব হলো। দরদী মনের সবটুকু আকুতি ঢেলে দিয়ে স্বজাতির উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী আহ্বান জানিয়ে তিনি বললেন–

يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ *

হে আমার জাতি! রাসূলগণের অনুসরণ করো। তাঁদের কথা মেনে নাও যাঁরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। তদুপরি তাঁরা সত্য পথের পথিক।

সুতরাং বোঝা গেলো; জীবন ও চরিত্রের শুচি–শুভ্রতা, আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং জাগতিক চাওয়া–পাওয়ার প্রতি পূর্ণ বিরাগই হচ্ছে দা'ঈ ও মুবাল্লিগের আকর্ষণীয়তা ও সফলতার মূল উৎস।

আম্বিয়া কেরামের দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বিতীয় চালিকা শক্তি হলো মানব প্রেম ও মানব কল্যাণের আকুতি। পথহারা মানুষের বরবাদি–আশংকায় হৃদয় তাঁদের যন্ত্রণাদগ্ধ হয়। এ শুভচিন্তায় ব্যাগ্র–ব্যাকুল হয় যে, কোনভাবে যদি মানুষের সংশোধন হতো! যদি তাদের এ ধ্বংসযাত্রা মুক্তিযাত্রায় মোড় নিতো! নিছক পিতৃস্নেহের টানে বাপ যেমন সন্তানের কল্যাণকামী ও সংশোধন প্রয়াসী হয় ঠিক সেই অনুভূতি ও প্রেরণা এবং ভাব ও চেতনা ক্রিয়াশীল হবে দা'ঈ ও উম্মতের মুবাল্লিগের অন্তরে। মানুষের কল্যাণচিন্তায় একটা অস্থির যন্ত্রণা অনুভূত হবে তাঁদের দরদী হৃদয়ে। স্বজাতির উদ্দেশ্যে হযরত হুদ (আঃ) বলেছেন–

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ * اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ
وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ *

হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নই। আমি তো রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। আপন প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত।

হযরত ছালেহ (আঃ) তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করে মর্মজ্বালা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ *

হে আমার জাতি! আপন প্রতিপালকের পায়গাম আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। কিন্তু (কি করবো) তোমরা তো আপন কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।

কাওম হযরত নূহ (আঃ)–এর প্রতি গোমরাহী ও ভ্রান্তির অপবাদ আরোপ করলো আর তিনি প্রতিবাদ করে বললেন–

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ
وَ اَنْصَحُ لَكُمْ *

হে আমার কাওম! আমি বিভ্রান্ত নই। আমি তো রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। আপন প্রতিপালকের পায়গাম আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই আর তোমাদের মঙ্গল চাই।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি মনোভাব ও তাবলীগের অবস্থা আলকোরআন বারবার আলোচনা করেছে এবং প্রতিবারই এটা সুপরিস্ফুট হয়েছে যে, উম্মতের প্রতি কি অপরিসীম দরদ–ব্যথা ছিলো তাঁর পবিত্র হৃদয়ে। এমন ব্যথা যার কঠিন নিষ্পেষণে পিঠের হাড় পর্যন্ত গুঁড়িয়ে যায়।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ *

আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি এবং তোমার উপর থেকে সে বোঝা সরিয়ে দেইনি যা তোমার পিঠ ভেংগে দিয়েছিলো।

উম্মতের দরদ ব্যথায় ও চিন্তা ব্যাকুলতায় তিনি এমন বিপর্যস্ত ছিলেন যে, বেঁচে থাকাও তাঁর কাছে কষ্টকর মনে হচ্ছিলো। তাই আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা

দিয়ে বললেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوا مُؤْمِنِيْنَ *

তারা ঈমান আনছে না বলে আপনি বুঝি প্রাণ বিসর্জন দিবেন!

একই বক্তব্য এসেছে সুরাতুল কাহাফের এক আয়াতে—

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا *

তারা যদি ঈমান না আনে তাহলে কি আপনি আফসোস করে তাদের পিছনে জান দিবেন।

এমন দয়ামায়া ও ভালবাসার কারণেই উম্মতের যে কোন কষ্ট তাঁর কাছে ছিলো অসহনীয়। মনেপ্রাণে তিনি চাইতেন, সকল খায়র বরকতের দুয়ার যেন তাদের জন্য খুলে যায়। রাসূলের এই চির কল্যাণকামী পবিত্র রূপটিই তুলে ধরা হয়েছে আলকোরআনের এই আয়াতে—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ *

তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য হতে এক রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁর কাছে তোমাদের যে কোন কষ্ট অসহনীয়, তোমাদের মংগল কামনায় যিনি ব্যাকুল, মুমিনদের প্রতি যিনি দয়াবান, মেহেরবান।

দাওয়াত ও তাবলীগের তৃতীয় মূলনীতি হলো সহজ–সরল ও সুকোমল আচরণ এবং আন্তরিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সম্ভাষণ যাতে শ্রোতা দা'ঈর ইখলাছ, আন্তরিকতা ও সহৃদয়তায় বিমুগ্ধ হয় এবং ভালবাসার উত্তাপে তার হৃদয় মোমের মত গলে যায়। ফলে প্রতিটি বক্তব্য ও আবেদন মর্মমূলে প্রবেশ করে একটা অস্থির আলোড়ন তোলে। ফিরআউনের মত খোদায়ী দাবীদার কাফিরের কাছে হযরত মুসা (আঃ)–এর মত মহান মর্যাদার অধিকারী নবীকে যখন পাঠানো হলো তখন এ উপদেশই দেয়া হলো—

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا *

তোমরা উভয়ে তার সাথে নরম কথা বলবে।

যে কোন মূল্যে ইসলামের ক্ষতি সাধন ও শিকড় কর্তনের অপচেষ্টায় মদীনার মুনাফিকরা কেমন আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলো এবং ইসলামী দাওয়াত ও মুহম্মদী রিসালতকে ব্যর্থ করার অপতৎপরতায় কেমন নগ্নভাবে মেতে উঠেছিলো তা তো সবারই জানা কথা। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন—

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَّهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا *

আপনি তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর হোন, তাদেরকে উপদেশ দান করুন এবং তাদের বিষয়ে তাদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বলুন।

মুনাফিকদের সাথেই যখন এমন কোমল আচরণ ও হৃদয়গ্রাহী সম্ভাষণ অবলম্বনের আদেশ করা হচ্ছে তখন সহজেই বোঝা যায় যে, সরল ও বেবুঝ আম মুসলমানের প্রতি দা'ঈ ও মুবাল্লিগদের অনুভূতি ও মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? এবং তাদেরকে দ্বীন বোঝানোর দাওয়াতি পন্থা কি হওয়া উচিত? এ কারণেই আল্লাহ পাক অবশ্যপালনীয় এ দাওয়াতি মূলনীতি নীচের আয়াতে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ *

আপন প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন এবং (প্রয়োজনে) তাদের সাথে সর্বোত্তম উপায়ে বিতর্ক করুন।

ইসলামের দা'ঈরূপে দু'জন ছাহাবীকে আল্লাহর রাসূল যখন ইয়ামানের দিকে পাঠালেন তখন যাত্রালগ্নে তাদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিলো এই—

يَسِّرَا وَّ لَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَّ لَا تُنَفِّرَا

সহজ করো; কঠিন করো না এবং সুসংবাদ দাও; নিরুৎসাহিত করো না।

শুনতে যদিও দু'শব্দের সাদামাটা দু'টি বাক্যমাত্র কিন্তু এ নববী ইরশাদ দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মপন্থার এক পূর্ণাংগ দর্শন ও রূপরেখা ধারণ করছে। অর্থাৎ দাওয়াতের ক্ষেত্রে দা'ঈ ও মুবাল্লিগদের কর্তব্য হলো প্রারম্ভিক স্তরে কঠোরতার পরিবর্তে মানুষের সামনে দ্বীন ও শরীয়তের সহজ থেকে সহজ রূপ ও স্বরূপ তুলে ধরা। জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া। আমলের ছাওয়াব ও ফযীলতের কথা বলা। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের ব্যাপ্তি আলোচনা করা। এভাবে তাদেরকে দ্বীনের পথে চলার হিম্মত ও সাহস যোগানো।

অবশ্য এর অর্থ মৌল আকীদা বিশ্বাস ও ফরয ওয়াজিবের ক্ষেত্রে তোষণ ও শৈথিল্য প্রদর্শণ মোটেই নয়। কেননা শরীয়তে কোন অবস্থাতেই এর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বরং আচরণে কোমলতা ও কর্মপন্থায় নমনীয়তা অবলম্বনই হলো আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য। ফরয-ওয়াজিব বাদে বিভিন্ন ফরযে কেফায়া ও সুন্নতের ক্ষেত্রে কিংবা কোন রকম ফেতনার আশংকা নেই এমন সব ক্ষেত্রে (শুরুতে) বেশী কঠোরতা সংগত নয়। তদ্রূপ ইমাম মুজতাহিদদের মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সকলকে একটি মাত্র মত গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। এইভাবে মাসায়েলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক প্রদত্ত 'অবকাশ'কে 'উচ্চতম' তাকওয়া ও সংযমের জন্য সংকীর্ণ করা সমীচীন নয়।

সীরাত ও হাদীছগ্রন্থে এ ধরনের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। আকায়েদ ও ফরয আহকামের ক্ষেত্রেই শুধু আলকোরআনে নমনীয়তা ও তোষণনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, আকায়েদের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নমনীয়তার আবদার ছিলো কাফিরদের وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (ওরা চায় আপনি কিছুটা নমনীয় হোন, তাহলে ওরাও নমনীয় হবে।) কিন্তু সে অনুমতি আল্লাহর রাসূলকে দেয়া হয়নি।

এ মূলনীতির অনিবার্য দাবী হলো দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে ক্রম গুরুত্বপূর্ণতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।[১] এ কারণেই দাওয়াত ও তাবলীগের শুরুতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও রিসালাতের উপরই শুধু জোর দিয়েছেন। তাওহীদী কালিমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া

১। অর্থাৎ প্রথমে গুরুত্বপূর্ণতম বিষয়টির দাওয়াত পেশ করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণতম বিষয়টি পেশ করতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে

কোন মাবুদ নেই) দ্বারাই শুরু হয়েছিলো তাঁর দাওয়াত। "আমাদের কাছে কি আপনার দাবী?" কোরাইশের এ জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেছিলেন, (আমার দাবী) একটা মাত্র কালিমা, একটা মাত্র কথা। যদি তোমরা তা মেনে নাও তাহলে আরব আজম সব তোমাদের আনুগত হবে। শুধু বলো; আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহম্মদ আল্লাহর রাসুল।

বস্তুতঃ আল্লাহর একত্ব এবং রাসূলের আনুগত্য তথা তাওহীদ ও রিসালাতই হচ্ছে সেই সারগর্ভ বীজ যাতে সুপ্ত রয়েছে যাবতীয় আহকাম ও বিধানের ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ বিরাট বৃক্ষ। সুতরাং মানব হৃদয়ের উর্বর মাটিতে তাওহীদ ও রিসালাতের বীজ বপন করা উচিত সর্বাগ্রে। তারপরে পর্যায়ক্রমে আসবে আহকাম ও বিধানের প্রসংগ।

স্বয়ং আলকোরআনের অবতরণ পদ্ধতিও এই দাওয়াতি মূলনীতি ও কর্মপন্থার উৎকৃষ্ট নমুনা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রথম দিকে আলকোরআনে জান্নাত জাহান্নাম ও তারগীব তারহীব সম্বলিত মন নরমকারী আয়াতই শুধু নাজিল হয়েছে। পরবর্তীতে মানুষ যখন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো তখন হালাল হারাম সম্বলিত আয়াত সমূহ নাজিল হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই যদি মদ হারামের আয়াত নাজিল হতো তাহলে কে মানতো তা?

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেলো যে, কোরআন অবতরণের ক্ষেত্রেও তাবলীগের 'পর্যায়ক্রম নীতি' অনুসৃত হয়েছে।

তায়েফের প্রতিনিধি দল দরবারে নববীতে হাজির হলো এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের নামায মওকুফ করার শর্ত পেশ করলো। কিন্তু যে ধর্ম গ্রহণে আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার জযবা নেই তা কি কাজে আসবে? তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন-

لا خير فى دين لا ركوع فيه

নামাযবিহীন ধর্ম কল্যাণবিহীন।

এরপর তারা তাদের ওশর মাফ করার এবং মুজাহিদীন ফৌজে বাধ্যতামূলক ভর্তি হতে অব্যাহতি দানের শর্ত পেশ করলো।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত দু'টো কবুল করে নিয়ে বললেন, মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর এরা স্বেচ্ছায় ওশরও দিবে এবং জিহাদেও শরীক হবে।

মুহাদ্দিছগণ লিখেছেন যে, নামায যেহেতু প্রতিদিন পাঁচবার সার্বক্ষণিক ফরয সেহেতু তাতে শিথিলতা করা হয়নি। পক্ষান্তরে জিহাদে অংশগ্রহণ যেহেতু ফরযুল কিফায়া। তদুপরি সময় ও পরিস্থিতি সাপেক্ষ। তদ্রূপ ওশর ও যাকাতের ফরযিয়ত [১] যেহেতু এক বছরের অবকাশপূর্ণ, তদুপরি বিলম্বে আদায়যোগ্য সেহেতু এ দুটি ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো হয়েছে। এভাবে এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রজ্ঞাপূর্ণ 'নীতি ও মূলনীতি' সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যেখানে যাচ্ছো সেখানে কিতাবীরাও বাস করে। সেখানে গিয়ে প্রথমে তাদেরকে তুমি 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহম্মদ আল্লাহর রাসূল।" এ দাওয়াত দেবে। যদি তারা তা কবুল করে তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এটাও যদি তারা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা ধনী সমাজ থেকে উসূল করে গরীব সমাজে বিতরণ করা হবে। এ আদেশ যদি তারা মেনে নেয় তাহলে বেছে বেছে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না। আর মজলুমের আহাজারি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা মজলুমের আহাজারি ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই। (সরাসরি তা আল্লাহর আরশে পৌঁছে যায়।)

এ হাদীছ থেকেও দাওয়াতের প্রজ্ঞাপূর্ণ পর্যায়ক্রম প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিতে দাওয়াত ও তাবলীগের যে সকল মূলনীতি বিশিষ্টতা লাভ করেছে তন্মধ্যে একটি হলো, 'দাওয়াত নিবেদন।' অর্থাৎ মানুষের আগমন প্রতিক্ষায় বসে না থেকে তিনি ও তাঁর প্রেরিতগণ দূরদূরান্তের বস্তিতে মানুষের দুয়ারে হাজির হতেন এবং সত্যের

১। ফরয হওয়া

দাওয়াত পেশ করতেন। এভাবেই আল্লাহর রাসূল মক্কা থেকে সেই 'পাথর খাওয়া' তায়েফে সফর করেছেন এবং নেতৃস্থানীয়দের ঘরে ঘরে তাবলীগ করেছেন। হজ্জ মৌসুমে আগত প্রতিটি গোত্রের কাফেলায় গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং মানুষের উপহাস পরিহাস উপেক্ষা করে তাদের সামনে হকের পায়গাম তুলে ধরেছেন। মানুষের সন্ধানে মানুষের দুয়ারে ধরনা দেয়ার এ নববী-কোরবানীর পথ ধরেই এক সময় সেই মহাভাগ্যবান ইয়াছরাবীদের [১] দেখা পাওয়া গেলো, যাদের মাধ্যমে 'ঈমান-সম্পদ' মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হলো।

হোদায়বিয়া সন্ধির পরে শান্তি ও স্বস্তিকালীন সময়ের সুযোগে মুসলিম দূতগণ ইসলামের বার্তা নিয়ে মিশর, ইরান ও হাবশার রাজদরবারে পৌঁছেছিলেন এবং ওমান, ইয়ামান, বাহরাইন ও সিরীয় সীমান্তের সরদারদের মজলিসে হাজির হয়েছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন ছাহাবী আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে গিয়ে ইসলামের তাবলীগ করেছেন। হযরত মুছআব বিন ওমায়র (রাঃ) গিয়েছেন মদীনায় এবং হযরত আলী ও মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) গমন করেছেন ইয়ামন অভিমুখে। যুগে যুগে দেশে দেশে ওলামায়ে হক ও আইম্মায়ে দ্বীনের এটাই ছিলো অনুসৃত পন্থা।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, হকের পায়গাম পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর বান্দাদের দুয়ারে গিয়ে হাজির হওয়া দা'ঈ ও মুবাল্লিগের নিজস্ব কর্তব্য।

খানকাহর স্থির বাসিন্দাদের বর্তমান আচরণ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, হকপন্থী এই সাধক পুরুষদের কর্মনীতি সবসময় বুঝি এমনই ছিলো। এ ধারণা আগাগোড়া ভুল। তাঁদের জীবন-কাহিনী পড়ে দেখুন; কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা? কোথায় আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ করেছেন? তারপর কোথায় কোথায় গিয়ে সত্যের আলো ও হিদায়াতের নূর ছড়িয়েছেন? আর শেষ বিশ্রামের জন্য কোথায় গিয়ে মাটির আশ্রয় পেয়েছেন? এই 'সফরি-জিহাদ' তারা এমন এক সময় করেছিলেন যখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। রেল-বিমানের গতিও ছিলো না মানুষের কল্পনায়। তাই "ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী" বলার মতো গর্ব ছিল না তাদের।

আজমীরের হযরত মঈনুদ্দীন চিশতির জন্ম সীস্তানে। আধ্যাত্মিক সাধনা আফগানিস্তানে[১] আর সত্য প্রচার করেছেন রাজপুতানার কুফুরস্তানে। হযরত ফরীদ শোকরগঞ্জ সিন্ধুর উপকূল পথে দিল্লী হতে পাঞ্জাব চলাচল করেছেন। তাঁর শিষ্য উপশিষ্যদের মধ্যে সুলতানুল আওলিয়া হযরত নিযামুদ্দীনের এবং পরবর্তীতে তাঁর খলীফাদের জীবন–কথা পড়ুন। সফরের পথ পরিক্রমা লক্ষ করুন। আর মানচিত্র খুলে দেখুন, কোন দূর দূরান্তে ছড়িয়ে আছে তাঁদের মাজার। কেউ দক্ষিণাত্যে, কেউ মালয়ে, কেউ বাংলাদেশের দূর পাড়াগাঁয়ে। কেউ বা যুক্তপ্রদেশের অখ্যাত কোন এলাকায়।

ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের আরেকটি বড় মূলনীতি হলো 'অভিযাত্রা'। অর্থাৎ দ্বীনের সন্ধানে স্বদেশ স্বজন ছেড়ে বের হয়ে পড়া এবং যেখানে দ্বীন হাছিল করা সম্ভব সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া। আবার ফিরে এসে স্বজাতির মাঝে দ্বীনের ফয়য বিস্তার করা। সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত শানে নুযূল–এর বিচারে যুদ্ধ ও জিহাদবিষয়ক হলেও শব্দের 'ভাব ব্যাপকতা'র বিচারে যে কোন কল্যাণঅভিযাত্রাই এর অন্তর্ভুক্ত। কাযী বায়যাবীও তাঁর তাফসীর–গ্রন্থে সে ইংগিত করেছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا *

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের হিফাযত ও নিরাপত্তার আয়োজন করো এবং আলাদা আলাদা অথবা দলবদ্ধভাবে ঘর থেকে বের হও।

সূরাতুল বারায় তো বিশেষভাবে এ বিষয়েই একটি আয়াত রয়েছে।

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا

সব মুসলমান ঘর ছেড়ে বের হবে তা তো সম্ভব নয়। তবে সব দল থেকে একটা 'উপদল' কেন এ উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বের হয় না যে, তারা দ্বীনের সমঝ লাভ করবে। আর যখন স্বজাতির মাঝে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করবে যাতে তারাও মন্দকাজ পরিহার করে চলে।

১। আফগানিস্তানের চিশত অঞ্চলে।

নববী যুগে এভাবেই বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল আকারে মানুষ মদীনা মুনাওয়ারায় আসতো এবং দশ বিশ দিন মদীনায় থেকে দ্বীনের ইলম ও আমল হাছিল করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতো এবং অবশিষ্টদের দ্বীন শেখানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতো।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক যুগে মসজিদে নববীর চত্বরে ছিলো আসহাবে ছুফফার অবস্থান, যাদের ঘরবাড়ী সহায় সম্পদ কিছুই ছিলো না। বনে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করাই ছিলো তাঁদের দিবসের জীবিকা অন্বেষণ। তারপর নিরব নিশিতে চলতো শিক্ষকের খিদমতে দ্বীন অন্বেষণ। আবার প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকায় তালীম তাবলীগের কাজেও প্রেরিত হতেন তাঁরা। এভাবে জীবন–ব্যস্ততার মাঝেও দ্বীন শিক্ষা, নববী সান্নিধ্য লাভ এবং ইবাদতে আত্মনিয়োগ– এই ছিলো তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আছহাবে ছুফফার জীবনধারা থেকে বোঝা যায় যে, এ ধরনের জামা'আত তৈরী রাখাও উম্মাহর সমষ্টিগত দায়িত্ববিশেষ। আরো জানা গেলো যে, এই জামা'আত বিশেষ তারবিয়াত দ্বারা তৈরী হতো এবং নববী ছোহবতের জাহেরী ও বাতেনী বরকত লাভে ধন্য হতো এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করতো।

প্রধানতঃ সান্নিধ্যপরশ, মৌখিক শিক্ষা, আহকাম ও মাসায়েল আলোচনা এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ ও আদান প্রদানই ছিলো তালীম ও শিক্ষার পদ্ধতি। তাঁদের রাত হতো ইবাদত জাগরণে জীবন্ত আর দিন হতো দ্বীনী কর্মে মুখরিত।

সর্বাধিক মূলানুগ দাওয়াত এটা

এ পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের নীতি ও মূলনীতি সম্পর্কে যা কিছু বলা হলো তাতে আশা করি ইসলামের তাবলীগী দর্শন ও দাওয়াতি পদ্ধতি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও পূর্ণাংগ ধারণা আপনার সামনে ফুটে উঠেছে। এবার আমরা যদ্দুর বুঝি তাতে পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি যে, আগামী আলোচনায় দাওয়াত ও তাবলীগের যে তত্ত্বগত ও কর্মগত মূলনীতি ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে তা সমকালীন ভারতের সকল দ্বীনী আন্দোলনের তুলনায় মূল উৎস তথা সুন্নতে রাসূলের অধিকতর নিকটবর্তী।

তাবলীগ ও দাওয়াতের গুরুত্ব

হিকমতপূর্ণ দাওয়াত ও তাবলীগ তথা আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার হলো ইসলামের মেরুদণ্ড। ইসলামের ভিত্তি, শক্তি, ব্যাপ্তি ও অগ্রগতি সবকিছু এরই উপর নির্ভরশীল এবং অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় আজ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, অমুসলমানকে মুসলমান করার চেয়ে নামের মুসলমানকে কামের মুসলমান এবং জাতীয় পরিচয়ের মুসলমানকে ধর্ম পরিচয়ের মুসলমান রূপে গড়ে তোলা অনেক বেশী জরুরী ও কার্যকর। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুরবস্থা ও মর্মন্তদ অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا ১ এ উদাত্ত আহ্বান সর্বশক্তিযোগে প্রচার করাই হলো সময়ের সবচে' বড় প্রয়োজন। দেশে দেশে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে এবং দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে মুসলমানকে মুসলমান বানানোর দাওয়াতি মেহনতেই আজ আত্মনিয়োগ করতে হবে। এমন মেহনত ও মোজাহাদা এবং ত্যাগ ও কোরবানী আমাদেরকে পেশ করতে হবে যা দুনিয়াদার লোকেরা দুনিয়ার তুচ্ছ মান-সম্মান এবং ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য করে থাকে। ত্যাগ ও কোরবানীর জযবা থেকেই মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় উদ্দেশ্যের পথে প্রিয় সবকিছু বিসর্জনের এবং বাধার বিন্ধাচল অতিক্রমের এক অপরাজেয় শক্তি। ত্যাগ ও কোরবানীর এ পথেই আজ আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে সুদৃঢ় পদক্ষেপে। নিজেদের মাঝে এমন কর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করতে হবে যা ছাড়া দ্বীন বা দুনিয়ার কোন কাজ না কখনো হয়েছে; আর না কখনো হবে।

এ যুগে দাওয়াতি মুজাহাদার এমন উম্মাদনার নমুনা যদি দেখতে চান তাহলে আসুন, মূল কিতাব শুরু করুন।

ওয়াসসালাম

নগণ্য সৈয়দ সোলায়মান নদভী

মে ১৯৪৭ ভুপাল

১। হে মুসলমান! তোমরা মুসলমান হও।

ভূমিকা

মুহম্মদ মঞ্জুর নোমানী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১৩৫৮ হিজরীর যিলকদ মুতাবিক ডিসেম্বর ১৯৩৯ এ আমরা তিনবন্ধু নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে সাহারানপুর এসে একত্র হলাম। উদ্দেশ্য, কয়েকটি দ্বীনী মারকায পরিদর্শন এবং সেখানকার ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সে আলোকে নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ।

আমাদের সফরের নির্বাচিত দ্বীনী মারকাযগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকায় শেষ নামটি ছিলো দিল্লীর নিযামুদ্দীন তাবলীগী মারকায।

এ মারকাযের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) সম্পর্কে তিন বন্ধুর কাফেলায় আমার জানাশোনাই ছিলো বেশী। আর যদ্দুর মনে পড়ছে, মারকায ও তার মুরুব্বীকে দেখার আগ্রহ সফরসংগীদের মাঝে আলোচ্য জীবনী গ্রন্থের লেখক মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভীরই ছিলো বেশী।

আমার জানাশোনার সূত্র ছিলো এ সিলসিলার সুপরিচিত সকল মুরুব্বীর সাথে সাধারণ পরিচয় সম্পর্ক। দেওবন্দের ছাত্রজীবন থেকেই মারকাযের সাথে আমার ধর্মীয় ও চিন্তাগত যোগসূত্র এবং ভক্তি ও ভালবাসার সুমধুর সম্পর্ক-সৌভাগ্য গড়ে উঠেছিলো। ফলে এ মহলের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমার অপরিচিত ছিলেন না। এ ছাড়া হযরত মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)-এর উপস্থিতিতে মেওয়াতের এক তাবলীগী জলসায় শরীক হওয়ারও সুযোগ আমার হয়েছিলো।

তবে এ বাস্তব সত্য আমি স্বীকার করি যে, হযরত মাওলানা সম্পর্কে আমার জানাশোনা ছিলো একেবারেই সাদামাটা ও প্রাথমিক পর্যায়ের। আমি শুধু ভাবতাম, একজন দ্বীনদরদী হক্কানী আলিম ইখলাছের সাথে তাবলীগী কাজ

করছেন। জাহেল গাফেল দেহাতি মুসলমানদের কালিমা শেখাচ্ছেন, নামায রোযায় লাগাচ্ছেন। সুতরাং জাযাকাল্লা খায়র। এ-ই ছিলো মাওলানা ও তাঁর তাবলীগী ফিকির সম্পর্কে আমার চিন্তার দৌড়।

এখন আমার মনে হয়, এ ধরণের অস্পষ্ট ও ভগ্ন ধারণা অনেক সময় কাজের হাকীকত বোঝা ও উপকৃত হওয়ার পথে বড়সড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ভাবে যে, এ সম্পর্কে তো আমি জানি (এবং সুধারণাই রাখি) কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এ ধরণের 'অর্ধ-জানা' এবং তা থেকে সৃষ্ট 'নীচু' ভাবনার কারণে অন্তরে চাওয়া পাওয়ার সেই ব্যাকুলতা জাগে না যা সত্যের সন্ধানে সচেষ্ট মানুষের 'ধারণামুক্ত' হৃদয়ে জেগে থাকে। আমার মনে হয়; স্বদেশের ও সমকালের মহান ব্যক্তিগণের সান্নিধ্য-কল্যাণ থেকে অধিকাংশ নিকটজনের বঞ্চনার সাধারণ কারণ সম্ভবতঃ এটাই ছিলো।

হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) সম্পর্কে আমার বন্ধু আলী মিয়াঁর [১] জানাশোনার পরিধি ছিলো শুধু এই যে, তাঁর মরহুম আব্বার জনৈক দোস্ত (মুনশী মুহম্মদ খলীল ছাহেব) দু' একবার তাঁর সামনে হযরত মাওলানার প্রসংগ তুলেছিলেন। আরেকবার মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভীর সফরসংগী হিসাবে কর্ণাল সফরকালে এক মজলিসে তাবলীগ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এক ব্যক্তির মুখে তাবলীগী মেহনতের আলোচনা শুনেছিলেন। পরবর্তীতে সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী সাহেব মেওয়াতের এক সংক্ষিপ্ত সফরে প্রভাবিত হয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী আন্দোলন" নামে একটি 'অনুভবমূলক' প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মওদূদী সম্পাদিত তরজমানুল কোরআন এর ৫৮ হিজরী শাবান সংখ্যায় প্রকাশিত এ প্রবন্ধটিও মাওলানা আলী মিয়াঁ পড়েছিলেন।

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন। আমিও যদ্দুর জানি তাকে বলতাম। তবে হযরত মাওলানা সম্পর্কে এমন কোন ধারণা যেন তিনি না করে বসেন যা বাস্তবে না পেয়ে তাকে হতাশার শিকার হতে হয় সেজন্য অতিঅবশ্যই একথা আমি বলে দিতাম

১। আলোচ্য জীবনী গ্রন্থের লেখক মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, ওরফে আলী মিয়াঁ।

যে, তাঁর জিহ্বায় এক ধরনের জড়তা আছে; ফলে অনেক সময় নিজের উদ্দেশ্যও তিনি পুরো বুঝিয়ে বলতে পারেন না।

আল্লাহর কি শান! এক অনিবার্য প্রয়োজনে জরুরী তলবের কারণে দিল্লী থেকেই আমাকে রায়বেরেলী ফিরে আসতে হলো। আর আলী মিয়াঁ ও তার সফরসংগী [১] মৌলভী আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব এম, এ, প্রথমে নিযামুদ্দীন ও পরে মেওয়াতে গেলেন এবং মেওয়াত থেকে ফিরে হযরত মাওলানার সাক্ষাৎ সৌভাগ্য লাভ করলেন। এ ঐতিহাসিক সফরের বিশদ বিবরণ মাওলানা আলী মিয়াঁ নিজেই আলফোরকানের যিলহজ্জ সংখ্যায় 'এক সপ্তাহ কয়েকটি দ্বীনী মারকাযে' শিরোনামে লিখেছিলেন।

পরবর্তীতে আলী মিয়াঁর চিঠিপত্র থেকে হযরত মাওলানার খিদমতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত এবং মাওলানার দাওয়াত ও বক্তব্যের সাথে তাঁর ক্রমবর্ধমান নিবিড় সম্পর্কের কথা জানতে পারছিলাম। এক সময় তাঁর সংগে আমারও মাওলানার খিদমতে যাতায়াতের সুযোগ হলো। এ সম্পর্কিত ঘটনা-অনুঘটনা ও অনুভব অনুভূতি মাঝে মধ্যে আলফোরকানের পাতায়ও ছাপা হতো। কিন্তু এখন সেগুলোর বিশদ বিবরণ উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু বলতে চাই যে, হযরত মাওলানার খিদমতে যাতায়াত, বিভিন্ন সফরকালীন অন্তরংগ সান্নিধ্য এবং বিশদ বক্তব্য শ্রবণের ফলে দু'টি ধারণা আমাদের মন মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হলো।

প্রথমতঃ তাঁর দাওয়াতি দর্শন অতি গভীর ও মৌলিক এক চিন্তা দর্শন। নিছক আবেগ-জযবার ফল বা ফসল নয়; বরং আল্লাহ পাকের বিশেষ মদদ, সেই সাথে দ্বীনী উছূল সম্পর্কিত সুগভীর চিন্তা, কোরআন-সুন্নাহর ব্যাপক অধ্যয়ন, শরীয়তের স্বভাব প্রকৃতির সাথে নিবিড় পরিচয় এবং প্রথম ইসলামী যুগ ও ছাহাবা কেরামের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধির মজবুত বুনিয়াদের উপর এ দাওয়াত সুপ্রতিষ্ঠিত। কতিপয় বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও চেষ্টার সমষ্টি নয় মোটেই। সমগ্র কাজের জন্য একটি সুসংগত ও সুবিন্যস্ত রূপরেখা রয়েছে তাঁর মাথায়। কিন্তু তিনি মনে করেন, এজন্য ধারা বিন্যাস ও পর্যায়ক্রম খুবই জরুরী।

১। আলী মিয়াঁর প্রত্যক্ষ বন্ধু ও (সেই সুবাদে) আমার পরোক্ষ বন্ধু।

এ মহাসত্য উদ্‌ঘাটনের পর হযরত মাওলানার দাওয়াতি চিন্তাদর্শন ও কর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার এবং দাওয়াতের চিন্তাগত ও ধর্মীয় ভিত্তিমূল আলিম ও বুদ্ধিজীবী মহলে যুগোপযোগী ভাষায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ধারায় তুলে ধরার একটা সুতীব্র চাহিদা অন্তরে জাগ্রত হলো।

১৩৬২ হিজরীর রজব মাসে হযরত মাওলানার লৌখনো সফরকালে কয়েকদিন তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকার এবং মুখপাত্ররূপে কখনো কখনো বক্তব্য রাখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। এক মজলিসে মাওলানা আলী মিয়াঁও হযরত মাওলানার মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ দ্বীনী দাওয়াতের যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সাধারণ চিন্তার লোকেরা সহজে বুঝতে পারে না মাওলানা আলী মিয়াঁ সেগুলোকে তাঁর সে বক্তব্যে এমন সুচিন্তিত বিন্যাস ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পেশ করেছিলেন যে, খোদ আমার জন্য আলোচ্য দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে গিয়েছিলো। তাই তক্ষুণি তাঁকে আমি জোর অনুরোধ করে বললাম, সব কাজ ছেড়ে আপনার আজকের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে ফেলুন। কিংবা এটাকেই নতুনভাবে প্রবন্ধাকারে লিখে ফেলুন। এটা এই দ্বীনী দাওয়াতের জোর দাবী এবং আপনার কর্তব্য। হযরত মাওলানা (রহঃ)ও আমার অনুরোধ সমর্থন করলেন এবং সম্ভবতঃ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী দাওয়াত কিতাবখানা তিনি লিখেছিলেন, যা আলফোরকান প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পরবর্তীতে আমি নিজে হযরত মাওলানার শেষ অসুস্থতাকালীন বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে "দ্বীনী নোছরত ও ইছলাহে উম্মতের এক মেহনত" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে একটি বিশেষ আংগিকে দাওয়াতের পরিচিতি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ছিলো। এটা ঠিক যে, কোন লেখা কোন মানুষের বিকল্প হতে পারে না। তবু এই ভেবে মন এখন কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হয়েছে যে, দিল দেমাগের আমানত আজ কাগজের সোপর্দ হয়ে গেলো। আর কাগজ দুর্বল মাধ্যম হলেও তার বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত।

অন্তরে দ্বিতীয় প্রভাব ছিলো হযরত মাওলানার সুমহান ব্যক্তিত্বের। নিয়মিত আসা যাওয়া, ঘরে সফরে সান্নিধ্য পাওয়া ও পরিচয় নিবিড়তা যতই বৃদ্ধি পেলো তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিমুগ্ধতা আমাদের হৃদয়ে ততই গভীর থেকে গভীরতর হতে

লাগলো। কতিপয় অর্ন্তজ্ঞানী বন্ধুসহ আমরা সকলে এ বিষয়ে একমত ছিলাম যে, এ যুগে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এবং নবুওয়াতের সত্যতার জীবন্ত মুজিযাবিশেষ। ইসলামের চিরন্তনতা, ছাহাবা কেরামের ইশক ও প্রেম এবং কল্যাণযুগের ধর্ম ব্যাকুলতা ও দ্বীনী জযবা ইত্যাদির নমুনা রূপে এ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে।

মানুষের স্বভাব এই যে, যখন সে কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করে এবং তার গুণমুগ্ধ হয় তখন সে মনেপ্রাণে চায় যে, তার আপনজনেরাও এ ব্যক্তিত্বের নিকট সান্নিধ্যে আসুক এবং অন্য সকলের সাথে তারাও এ সম্পদ সৌভাগ্যের ভাগিদার হোক। এ স্বভাব তাড়নায় আমাদেরও মনের আকুতি ছিলো যে, সমসাময়িক বন্ধুগণ কল্যাণযুগের সম্পদ ভাণ্ডারের এই শেষ 'স্মারক মুক্তাটি'কে কাছে থেকে দেখুন। তাদের চক্ষু শীতল হোক। জীবন ধন্য হোক। কিন্তু ভাগ্যের উপর কারো হাত নেই। মানুষের উপরও মানুষের ক্ষমতা নেই। আমাদের দূরদর্শী ও সত্যদর্শী অনেক বন্ধু যারা খুব সহজেই হযরত মাওলানার কাছে আসতে পারতেন এবং আপন যোগ্যতা ও অন্তরংগতা বলে তাঁর স্নেহপাত্র হতে পারতেন। তারপর নিজেরা অশেষ দ্বীনী ও রূহানী কল্যাণ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে মানব সমাজেও তা বিতরণের মাধ্যম হতে পারতেন। কিন্ত আফসোস 'অতিব্যস্ততা' বা অন্য কোন কারণে মাওলানার জীবদ্দশায় তারা আসতে পারেননি। ফলে তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্ব, তাঁর সমুজ্জ্বল গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর দাওয়াতের হাকীকত ও মর্মবাণী উপলব্ধি করার অবকাশ তাদের হয়নি।

নিজেদের মাঝে প্রায় আমরা বলাবলি করতাম যে, আমরা যদি হযরত মাওলানার জীবন ও কর্ম বর্ণনা করি তাহলে দূরের লোকেরা ভাববে অতিশয়োক্তি। পক্ষান্তরে কাছের লোকেরা মনে করবে অত্যোল্লোক্তি। বস্তুতঃ 'শ্রবণ' কখনো 'দর্শন'-এর বিকল্প হতে পারে না। তাই সমৃদ্ধতম শব্দ ভাণ্ডারও এখানে অচল। কেননা শব্দের গতি হয় এগিয়ে যায় নয়ত পিছিয়ে পড়ে। কাগজের লেবাস যেভাবেই তৈয়ার করা হোক তা কোন শরীরে পূর্ণ খাপ খায় না। হয় ঢিলাঢোলা হবে কিংবা আঁটসাঁট। কোন কিছু যদি কারো নূন্যতম সঠিক ধারণাও দিতে পারে এবং সামান্য মাত্রায়ও তার আসল আকৃতিতে তুলে

ধরতে পারে তবে তা হলো শুধু ঘটনা বিবরণ। কিংবা তার নিজস্ব রচনা (বিশেষত পত্রাবলী) এবং তার প্রাত্যহিক স্বতঃস্ফূর্ত আলাপচারিতা।

খুব নিকট সান্নিধ্য থেকে হযরত মাওলানাকে দেখে অতি সূক্ষ্ম একটি জ্ঞানতত্ত্ব আমাদের আত্মস্থ হয়েছে। তা এই যে, পূর্ববর্তী আকাবির ও বুজুর্গানে দ্বীনের চরিত সংকলন ও জীবনী গ্রন্থগুলোতে যতই সামগ্রিকতা আরোপের চেষ্টা করা হোক না কেন তাদের আসল ব্যক্তিত্ব ও গুণ–কীর্তির ধারে কাছেও নয় সেগুলো। তাছাড়া 'জীবনব্যাপী ঘটনাবলীর' অতি ক্ষুদ্রাংশই সংকলনের আওতায় এসে থাকে। সেখানেও আছে সংকলক ও জীবনীকারের নিজস্ব রুচি ও দৃষ্টিকোণ–এর বিরাট ভূমিকা। কখনো কখনো তো 'সংকলিত' ব্যক্তির চেয়ে 'সংকলক' ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা–চিত্রই তাতে বেশী ফুটে উঠে। সর্বোপরি আবেগ, অনুভূতি ও হৃদয়বৃত্তি তো আর কলমের আঁচড়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কবি সত্যই বলেছেন–

گر مصور صورت آں دستان خواهد کشید
حیرتے دارم که نازش راچسان خواهد کشید

'চিত্রকর মনমোহিনীর চাঁদমুখ যদিও বা আঁকে; বুঝি না তার লীলাময়তা কিভাবে তুলবে ফুটিয়ে!

আর বেচারা জীবনীকার করবেটাই বা কি! বহু ভাব ও ভাবনা এবং বহু তত্ত্ব ও রহস্য তো এমনও আছে যা কাব্যের দিগন্ত ছোঁয়া ও ময়ূর পেখমি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

بسیار شیوها ست بتان را که نام نیست

'মানস' প্রতিমার কত লীলাভংগি আছে যার নাম নেই জানা।

স্বীকার করি, মুহাদ্দিছীনে কেরাম ও সীরাত সংকলকগণ যে প্রশ্নাতীত বর্ণনা বিশ্বস্ততা ও বিষয় সামগ্রিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তার তুলনা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু কতিপয় জীবন্ত ব্যক্তিত্বের নিকটসান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেই হয় যে, শব্দের পরিধিতে যতটা কুলায় ততটাই শুধু তারা করতে পেরেছেন; এর বেশী তো নয়।

তারপরও কোন সন্দেহ নেই যে, ইতিহাস ও জীবনী সংকলন যা কিছু সংরক্ষণ করে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছে শুধু স্মৃতি নির্ভর বর্ণনা পরম্পরা দ্বারা তার শতাংশও সম্ভব হতো না। তাই তো দেখি; যাদের জবিনী সংকলন নেই তাদের অধিকাংশের নামটুকু ছাড়া কিছুই আজ বাকি নেই।

হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)–এর জীবন–চরিত সংকলন প্রশ্নে দীর্ঘদিন আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কেননা সবসময় তিনি দাওয়াতকে তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্ত না করার কথা জোর তাগিদ দিয়ে বলতেন, তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে মানুষকে দাওয়াত দেয়া কোন ক্রমেই তিনি বরদাশ্ত করতেন না। এমন কি শেষ দিকে তো দাওয়াতের পরিচিতি প্রসংগেও তাঁর নাম উল্লেখ করা হোক– এটা তিনি অপছন্দ করতেন। বিনয়, আত্মবিলোপ ও ইখলাছ ছাড়াও এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দ্বীনী হিকমতও ছিলো। কিন্তু দাওয়াতের কর্মী ও কর্মকর্তাগণ (ভূমিকা লেখক ও জীবনী সংকলকও তাদের অন্তর্ভুক্ত) স্বীকার করেন যে, এটা রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। দাওয়াতের স্বার্থেই তার আহ্বায়কের আলোচনা প্রায়শঃ অনিবার্য হয়ে পড়তো; যাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব, ইখলাছ ও আল্লাহমুখিতা সম্পর্কে যারা আস্থাশীল তাদের মাঝে দাওয়াতের প্রতি আস্থা ও সুধারণা জাগরূক হয়। তাছাড়া দাওয়াতের মূলনীতি ব্যাখ্যা এবং এর সুফল সম্পর্কে আহ্বায়কের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দাওয়াতের অগ্রগতির ক্রমপর্যায় তুলে ধরার প্রয়োজন হতো আর তখন অজ্ঞাতসারেই যেন হযরত মাওলানার মেহনত মোজাহাদার আলোচনা শুরু হয়ে যেতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা উপকারীও হতো।

স্পষ্ট মনে আছে, আমি ও মাওলানা আলী মিয়াঁ দিল্লীতে একবার জনৈক আলিম ও লেখক বন্ধুকে 'নিজামুদ্দীনে যান না' বলে বন্ধু সুলভ অনুযোগ করছিলাম এবং দাওয়াতের ধর্মীয় গুরুত্ব ও প্রয়োজন তুলে ধরে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিলাম। এ প্রসংগে যখন মাওলানার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সম্পর্কে বিশিষ্ট সমসাময়িকদের মন্তব্য তুলে ধরলাম তখন পরিষ্কার বোঝা গেলো যে তার চোখে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং ধার ও ভার যেন অনেক বেড়ে গেলো। অন্যকিছু তার জন্য এতটা 'প্রভাবক' প্রমাণিত হয়নি।

এ জাতীয় কিছু অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য দ্বীনী কল্যাণ বিবেচনা করে,

বিশেষতঃ হযরত মাওলানার আশংকাজনক অসুস্থতার সময় বারবার আমার মনে হতো যে, তাঁর জীবন ও কর্ম এবং দাওয়াতের বিশদ ইতিহাস সংকলন করা একান্ত জরুরী। অসুস্থতার শেষ দিকে মাওলানার আলী মিয়াঁ সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে আমার চিন্তা পেশ করতে গিয়ে দেখি, একই ভাবনা তিনি নিজেও ভাবছেন এবং কিছু কিছু জিনিস নোট করা শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে মাওলানার ওয়াফাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গেলো। ফলে 'জীবনী সংকলন' চিন্তা যেন 'জীবন' লাভ করলো। মাওলানার শেষ খেদমত ও আখেরী যেয়ারতের জন্য কাজের পুরোনো সাথী ও কর্মী এবং খান্দানের মুরুব্বী ও আত্মীয় স্বজন প্রায় সকলেই মারকাযে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দু'দিনেই তো ভেংগে যাবে এ মাহফিল! তারপর কেউ জানে না এ 'তারকার মেলা' কখনো কোথাও আর জমবে কিনা! তাই আলী মিয়াঁ এ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করলেন। একটি জীবনী সংকলনের জন্য যে সকল তথ্যউপাত্ত অতি প্রয়োজনীয় সেগুলো তিনি মাওলানা মরহুমের ওয়াকিফহাল আত্মীয়-স্বজন ও পুরোনো সাথীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন এবং বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের সঠিক সন তারিখ জেনে নিলেন এবং দাওয়াতের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নির্ধারণ করে নিলেন।

এ ছাড়া নিজামুদ্দীন থেকে সাথে নিয়ে আসা মূল্যবান পুরোনো পত্রাবলীর সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনার ছিন্নসূত্র তিনি জোড়া দিয়েছেন। দাওয়াতের মূলনীতি ও আদর্শ সম্পর্কিত পত্রাবলীর সবচে' মূল্যবান সংগ্রহ খোদ জীবনীকারের নিকটেই ছিলো। কেননা মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যামূলক সর্বাধিক 'পত্র' আমাদের জানা মতে খোদ জীবনীকারকেই লিখেছিলেন। আর এগুলো কাজেও লেগেছে বেশ। তদুপরি তিনি মাওলানা মরহুমের জীবনী সংকলন কাজে হাত দিয়েছেন শুনে অন্যান্য বন্ধুরাও তাদের সংরক্ষিত পত্রাবলী দিয়ে তাঁকে বেশ কার্যকর সহযোগিতা দান করেছেন।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান সাহায্য পাওয়া গেছে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের কাছ থেকে। ব্যাপক অনুসন্ধানের কষ্ট স্বীকার করে নিজস্ব রোজনামচা ও পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বিভিন্ন তথ্য তিনি জোগাড় করে দিয়েছেন। কখনো কখনো একটি সন তারিখ নির্ণয় করতে কয়েকদিনও

ব্যয় হয়েছে। এভাবে বহু হারানো তথ্য উদ্ধার পেয়েছে এবং আলোচ্য সংকলন পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় মাওলানা মরহুমের চিঠিপত্রের এক বিরাট সংগ্রহ হযরত শায়খুল হাদীছ ছাহেবের সর্বাত্মক প্রয়াস ও মহানুভবতায় আমাদের হাতে এসেছে। তা থেকে প্রায় সত্তর আশিটি উদ্ধৃতি বর্তমান সংস্করণে মূল্যবান সংযোজন রূপে স্থান পেয়েছে। ফলে তাতে নতুন প্রাণ ও নতুন আবেদন সঞ্চারিত হয়েছে। এভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক একাজে বড় সাহায্য করেছেন এবং আমাদের প্রাথমিক প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী তথ্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর মনে হলো মাওলানা (মরহুমের) ঘনিষ্ঠ ও বিশিষ্ট কর্মী বন্ধুরা এটি দেখে দিলে ঘটনার বিশুদ্ধতা ও বিবরণ সম্পর্কে পূর্ণ আশ্বস্তি লাভ হতো। তাই উনিশশ' চৌচল্লিশের ডিসেম্বরে মেওয়াতের এক সফরে কয়েক মজলিসে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শোনানো হলো। এভাবে কিতাবের শেষ পরিমার্জনটুকুও সুসম্পন্ন হলো।

আকাবির ও বুজুর্গানে দ্বীনের জীবনচরিত এবং বিভিন্ন যুগের ধর্মীয় ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস সংকলনের প্রতি আমাদের বন্ধু মহলে মাওলানা আলী মিয়াঁর বিশেষ অনুরাগ রয়েছে এবং আল্লাহ পাক তাঁকে এ বিষয়ে বিশেষ রুচিও দান করেছেন। এ বিষয়ে সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলো তাঁর প্রথম স্বতন্ত্র রচনাকর্ম। আর মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)-- এর জীবনী সংকলন হলো দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ম।

আহলে ইলম ও বুজুর্গানে দ্বীনের জীবনী সংকলনের সৌভাগ্য লেখক পারিবারিক সূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে বিষয়টি তাঁর জন্য অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়, আকর্ষণীয় ও সহজ হয়েছে। লেখকের দাদা মাওলানা হাকীম সৈয়দ ফখরুদ্দীন (রহঃ) ফারসী ভাষায় বিশিষ্ট লেখক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর সাবলীল ও গতিময় লেখনীর অন্যতম স্মৃতি হলো 'মাহরে জাহাঁ-তাব' নামক অপ্রকাশিত বিশাল পাণ্ডুলিপি। (ফারসী ভাষায় রচিত এই বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডটি ফুলস্কেপ সাইজের তেরশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে।) এছাড়া 'সীরাতুস সাদাত' ও তাযকিরাহ ইলমিয়া' নামক অন্যান্য জীবন-চরিত গ্রন্থও তিনি রেখে গেছেন।

লেখকের স্বনামধন্য পিতা মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হাই (রহঃ) (সাবেক পরিচালক নদওয়াতুল উলামা) ছিলেন ভারতবর্ষের ইবনে খাল্লেকান ও ইবনে নদীম! ভারতবর্ষের কয়েকশ' বছরের প্রায় চার হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা আলিম ওলামা, পীর মাশায়েখ, লেখক বুদ্ধিজীবী ও শাসকবর্গের জীবনী সম্বলিত আট খণ্ডের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ نُزْهَةُ الْخَوَاطِر তিনি লিখে গেছেন।

এই মৌরুসী যোগসূত্র এবং নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক রুচি পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আমীরুল মুমিনীন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) এবং (মাকতূবাতে ইমাম রব্বানী সংকলনকালে) হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ)–এর জীবন, চরিত্র, শিক্ষা ও আদর্শ এবং সংস্কার আন্দোলনের যাবতীয় দিক তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। ফলে এই দাওয়াতি মেহনতের বহু দিক ও দিগন্ত এবং বহু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করা তাঁর জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিলো। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর স্বীকৃতির নিজস্ব গুরুত্ব আছে অবশ্যই।

এ সৌভাগ্যবান লেখককে আল্লাহ পাক এছাড়া আরো কিছু বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা দান করেছেন। এগুলোর মূল উপাদান তো সম্ভবতঃ তাঁর স্বভাবজাত। তবে আমার মতে মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)–এর খিদমতে হাজিরি এবং তাঁর সাথে আত্মীক সম্পর্কের মাধ্যমেই এগুলোর বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি ঘটেছিলো। মুলতঃ এ সকল আত্মগত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) ও তার দ্বীনী দাওয়াত বোঝা এবং হৃদয়ংগম করা তাঁর জন্য বেশ সহজ হয়েছিলো। আলোচ্য কিতাব অধ্যয়নকালে পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছ থেকে রোখসত হওয়ার পূর্বে অতি সংক্ষেপে আরো কয়েকটি কথা আরয করা জরুরী মনে করছি।

(ক) গ্রন্থকার তাঁর বিশেষ গুণ ও যোগ্যতাবলে এ মেহনতে অবশ্যই অনেকদূর সফল হয়েছেন এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, অন্য কারো পক্ষে এ পর্যায়ের সফলতা লাভ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। তা সত্ত্বেও বাস্তব সত্য এই যে, হযরত মাওলানাকে কাছে থেকে ও গভীরভাবে দেখার সৌভাগ্য বঞ্চিত লোকেরা এ কিতাবের মধ্যস্থতায় যে ধারণা লাভ করবেন তা বাস্তবের

চেয়ে অনেক কম হবে। আমি নিজেও মাওলানা মরহুমকে তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়ই শুধু অতি কাছে থেকে গভীরভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাস্তব কথা এই যে, প্রত্যেক আগামী দিন মনে হতো গতকাল মাওলানাকে যা বুঝেছিলাম তিনি তার অনেক উর্ধ্বে। এ যুগের এক বড় 'আরিফ ও তত্ত্বজ্ঞানী (বরং একীন ও মারিফাতের ইমাম) হযরত মাওলানার মৃত্যুর প্রায় সাড়ে চারমাস আগে এক উপলক্ষে বলেছিলেন, ইনি তো আজকাল দিনে হাজার মাইল গতিতে ছুটে চলেছেন।

এ মন্তব্যের মর্ম তখন তো কিছুই বুঝিনি। পরবর্তীতে হযরত (রহঃ)–এর সার্বিক অবস্থা থেকে কিছুটা অনুভব করতে পেরেছি যে, কোন উর্ধ্ব যাত্রার প্রতি ছিলো তাঁর ইংগিত।

মাঝে মধ্যে মাওলানা মরহুম তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলন সম্পর্কে বলতেন, এ কাজ হলো প্রথম 'কল্যাণ যুগের' হিরকখণ্ড।

কিন্তু যদি বলা হয় যে, চৌদ্দ শতকের মাওলানা মরহুম নিজেও ছিলেন প্রথম কল্যাণযুগের অত্যুজ্জ্বল এক হিরকখণ্ড, তাহলে আমি কোন অতিশয়োক্তি মনে করবো না। কিতাবের পাতায় পড়া বিগত যুগের বহু ঘটনা আমাদের বস্তু প্রভাবিত মন বিশ্বাস করতে চাইতো না কিন্তু নিজের চোখে হযরত মাওলানা (রহঃ)–এর মাঝে সেগুলোর নমুনা দেখে আলহামদুলিল্লাহ মন এখন এমন আশ্বস্ত যে, হাজার যুক্তি প্রয়োগেও বুঝি তা সম্ভব হতো না। এমন মানুষ সম্পর্কেই তো রোমের তত্ত্বজ্ঞানী বলেছিলেনঃ

اے لقائے تو جواب ہر سوال + مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

সকল প্রশ্নের জবাব শুধু তোমাকে দেখা, সকল সমস্যার সমাধান শুধু তোমার নিরবতা।

(খ) হযরত মাওলানা (রহঃ) ও তাঁর খান্দানের কতিপয় বুজুর্গানের এমন কিছু ঘটনা পাঠক এ কিতাবে দেখতে পাবেন যা সংকীর্ণ চিন্তা ও স্থূল দৃষ্টির এ যুগে হয়ত অবিশ্বাস্যই মনে হবে। কিন্তু এ ধরনের যা কিছু লেখক এখানে পরিবেশন করেছেন অতি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পূর্ণ দায়িত্বের সাথেই করেছেন

(গ) সম্মানিত পাঠকবর্গ যেন এ কথা মনে রাখেন যে, জীবনীকার মাওলানা মরহুমের জীবনের ঐ সমস্ত ঘটনাই শুধু বিশদভাবে লিখতে পেরেছেন যা কোন সফরে কিংবা নিজামুদ্দীনে অবস্থানকালে তাঁর সামনে ঘটেছে। এ কারণে লৌখনো সফরের ঘটনাবলী এবং শেষ অসুস্থতার শেষ দিনগুলোর ধারা বিবরণী বেশ বিস্তারিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, তার জীবনের সিংহভাগ এভাবেই কেটেছে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, লেখক যদি পূর্ণ সময়কাল তাঁর সাহচর্য পেতেন তাহলে কিতাবের কলেবর কেমন হতো এবং বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার কী অমূল্য সংগ্রহ তাতে থাকতো। তবু যা কিছু এ সংকলনে এসেছে আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি ব্যবহারকারীদের জন্য সেটাও অনেক কিছু।

(ঘ) প্রিয় পাঠকবর্গ দেখতে পাবেন যে, এখানে মাওলানা মরহুমের ব্যক্তি পরিচিতির চেয়ে স্বভাবতঃই তাঁর দাওয়াত ও কর্মের পরিচিতি প্রাধান্য পেয়েছে। কেননা আপন ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে যিনি দাওয়াত ও মেহনতের পথে এভাবে বিলীন করে দিয়েছেন তাঁর জীবন চরিত অবধারিত ভাবেই ব্যক্তি নির্ভর না হয়ে দাওয়াত নির্ভর হবে। তাছাড়া লেখকের এত শ্রম স্বীকারের আসল উদ্দেশ্যই তো হলো প্রিয় পাঠকবর্গের নিজস্ব জীবন ও ভুবনকে মাওলানা মরহুমের যুগ সংস্কারমূখী দাওয়াত এবং নবজীবনদানকারী পায়গামের সাথে পরিচিত করে তোলা।

ভূমিকা লিখতে বসে পাঠক বন্ধুদের বেশ সময় নিয়ে ফেললাম। কিন্তু কিতাব ও 'ছাহেবে কিতাব' [১] সম্পর্কে এ ক'টি কথা বলা জরুরী ছিলো। এখন আমি আড়ালে সরে যাচ্ছি। কিতাব আপনার সামনেই রয়েছে। পড়া শুরু করুন। তবে শেষ কথা বলে যাই। শুধু একবার পড়ে তাকে তুলে রাখার মত কিতাব এটা নয়। এ হলো দ্বীন--ঈমান ও ইলম আমলের দাওয়াত। নিজের ও সমাজের জীবন পরিবর্তনের উদাত্ত আহ্বান। পাঠক যদি (মুহূর্তের জন্যও) 'শ্রোতা' হতে পারেন তাহলে গায়বের এ শাশ্বত বাণী তিনি অবশ্যই শুনতে পাবেন।

১। অর্থাৎ যার জীবনী লেখা হয়েছে তার সম্পর্কে

گوئے توفیق و سعادت درمیان افگندہ اند

کس بمیدان درنمی آید سواران راچہ شد

সৌভাগ্যের বল তোমাদের মাঝে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু কেউ যে ময়দানে এলোনা। শাহ সওয়ারদের হলো কি?

এ দাওয়াত হলো খালেছ দ্বীনী মেহনতের এক নবযুগের শুভ সূচনা। যে কাজ ছিলো উম্মতের জীবনের উদ্দেশ্য এবং অস্তিত্বের সার্থকতা তা দীর্ঘ গাফলতির অভিশাপে উম্মতের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ কঠিন সময় সন্ধিক্ষণে যারাই হিম্মত করে আগে বাড়বেন তাদের জন্য খুলে যাবে সৌভাগ্যের আসমানী দুয়ার। সে সৌভাগ্যের পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। আল্লাহর দেয়া সময় ও শক্তি আল্লাহর পথে শুধু ব্যয় করা। কিন্তু এ তুচ্ছ সওদার যা মুনাফা তার বিনিময়ে তো প্রাণ বিসর্জন দেয়াও সহজ। কবি আযুরদাহ সত্যই বলেছেন–

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق مین

ایك جان کازیان ہی سوا سازیان نہین

হে মন আমার! প্রেমের সওদাই তো আসল সওদা। গেলে যাবে শুধু এক প্রাণ, তাতে এমন কি আর ক্ষতি!

মুহম্মদ মনযূর নোমানী
জমাদাল উখরা ১৩৬৪ হিজরী

মাওলানা মুহাম্মদ্ ইলয়াস (রহঃ)
ও
তাঁর দ্বীনী দাওয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

পরিবার, পরিবেশ, প্রতিপালন, শিক্ষা দীক্ষা

মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল ছাহেব

আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগের কথা দিল্লীর উপকণ্ঠে হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ)-এর মাজারের ধারে 'চৌষট্টি খাম্বা' নামে যে ঐতিহাসিক ভবন রয়েছে তার লাল ফটক সংলগ্ন একটি ঘরে সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক বুজুর্গ বাস করতেন। নাম, মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল।

মুযাফফার নগর জিলার ঝান্ঝানা ছিলো তাঁর প্রাচীন পৈত্রিক নিবাস। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর ইন্তিকালের পর মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলবী ছাহেবের খান্দানে দ্বিতীয় বিবাহের সূত্রে কান্ধলায় তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিলো। ফলে কান্ধলা এক সময় তাঁর জন্মভূমির মতই হয়ে গেলো। ঝান্ঝানা ও কান্ধলার এ খান্দান ছিলো সিদ্দীকী বংশধারার অত্যন্ত শরীফ ঘারানা; যাদের মাঝে ইলম ও আমলের ধারা চলে আসছিলো বহু সিঁড়ি পর্যন্ত। ফলে গোটা আতরাফে বিশেষ ইজ্জত ও মর্যাদার চোখে দেখা হতো তাঁদের। ছয় সিঁড়ি উপরে মৌলভী মুহম্মদ শরীফ (রহঃ) পর্যন্ত গিয়ে মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল ও মুফতি ইলাহী বখশ উভয়ের বংশ ধারা মিশে যায়। বংশ তালিকা এই-

মাওলানা ইসমাঈল বিন গোলাম হোসায়ন বিন হাকীম করীম বখশ বিন হাকীম গোলাম মহীউদ্দীন বিন মৌলভী মুহম্মদ সাজিদ বিন মৌলভী মুহম্মদ ফয়য বিন মৌলভী মুহম্মদ শরীফ বিন মৌলভী মুহম্মদ আশরাফ বিন শায়খ

জামাল মুহম্মদ শাহ বিন শায়খ বাবন শাহ বিন শায়খ বাহাউদ্দীন শাহ বিন মৌলভী শায়খ মুহম্মদ বিন শায়খ মুহম্মদ ফাজিল বিন শায়খ কুতুবশাহ।[১]

মুফতী ইলাহী বখশের পরিবার

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)–এর বিশিষ্টতম ছাত্র মুফতী ইলাহী বখশ (রহঃ) ছিলেন সে যুগের সুপ্রসিদ্ধ মুফতী, শিক্ষক ও লেখক। চিকিৎসায় তাঁর অতিউচ্চ সুনাম ছিলো। বুদ্ধিজাত জ্ঞান এবং শরীয়তী ইলম উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। আরবী, ফারসী ও উর্দু কবিতায় ছিলেন উঁচু স্তরের মুন্‌শিয়ানার অধিকারী। সুবিখ্যাত কাব্য দিওয়ান بانت سعاد এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো তার 'ত্রিভাষিক' কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর। এতে তিনি হযরত কা'ব বিন মালিক (রাঃ) এর প্রতিটি আরবী শ্লোকের আরবী, ফারসী ও উর্দুতে কাব্যানুবাদ করেছিলেন।' আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ তাঁর সফল লেখক–জীবনের স্মারক। তন্মধ্যে شيم الحبيب এবং মাওলানা রুমীর 'মছনবী'র পরিশিষ্ট হলো সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

মুফতী ছাহেব (রহঃ) হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী (রহঃ)–এর বায়'আত ছিলেন। তাঁর ইখলাছ ও আত্মবিলোপ এবং লিল্লাহিয়াত ও আল্লাহমুখিতার ছোট্ট এক প্রমাণ এই যে, সমকালের সর্বজনমান্য শায়খ হওয়া সত্ত্বেও ষাট পঁয়ষট্টি বছরের সুপরিণত বয়সে আপন শায়খের যুবক খলীফা হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে তিনি বায়'আত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ মুফতী ছাহেবের প্রায় আটত্রিশ বছরের ছোট ছিলেন। এই পরিণত বয়স, বুজুর্গী ও খ্যাতি–মর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর 'ফয়য' গ্রহণে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ করেননি।[২]

১। এ বংশ তালিকা শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহম্মদ যাকারিয়া ছাহেব কান্ধলবী পাঠিয়েছেন।

২। সৈয়দ ছাহেবের তরীকা ও যিকির সম্পর্কে ملهمات احمديه নামে একটি কিতাবও মুফতি ছাহেব লিখেছেন।

মুফতী ছাহেব ১১৬২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ হিজরীতে তিরাশি বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর পুত্র পৌত্র সকলেই মেধা, জ্ঞান, গুণ ও মর্যাদায় অনন্য ছিলেন। মেধা, বুদ্ধিমত্তা স্বভাবজাত বিদ্যানুরাগ এবং আল্লাহপ্রেম ও আল্লাহমুখিতা হলো এ খান্দানের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। মৌলভী আবুল হাছান ছাহেব রচিত 'গুলজারে ইবরাহীম' হলো খুবই জনপ্রিয় ও উচ্চমার্গীয় তত্ত্বমূলক মছনবী,[১] যা এই কিছুকাল আগেও ঘরে ঘরে পঠিত হতো। (এটা তার সুপ্রসিদ্ধ গন্থ 'বাহরে হাকীকত' এর অংশ বিশেষ।) তাঁর পুত্র মৌলভী নূরুল হাসান এবং চার পৌত্র মৌলভী যিয়াউল হাসান, মৌলভী আকবর, মৌলভী সোলায়মান ও হাকীম মৌলভী ইবরাহীম– এঁরা হলেন এ খান্দানের কৃতি সন্তান।

মাওলানা মুযাফফর হোসায়ন

মুফতী ছাহেবের আপন ভাতিজা মাওলানা মুযাফফর হোসায়ন ছিলেন হযরত শাহ ইসহাক ছাহেবের অতি প্রিয় ছাত্র এবং হযরত শাহ মুহম্মদ ইয়াকুব ছাহেবের মুজায (খলীফা)। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁর সাথীদের তিনি দেখেছেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের বিশিষ্ট সাধক, সাধু পুরুষ। তাকওয়া ও ধার্মিকতা ছিলো তাঁর স্বভাবজাত। এটা সুস্বীকৃত ছিলো যে, সন্দেহযুক্ত কোন খাদ্য কখনো তাঁর পাকস্থলী গ্রহণ করেনি। বিনয় ও সাধুতা, স্থৈর্য ও অবিচলতা এবং নামাযে নিবিষ্টতা ছিলো এমন যা ইসলামী কল্যাণযুগের পুণ্য স্মৃতি মনে করায়। এ সম্পর্কিত বহু ঘটনা এখনো স্থানীয় লোকদের স্মরণে আছে।[২]

মাওলানা মুযাফফর হোসায়ন ছাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল ছাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী। এ বিবাহ হয়েছিলো ১৩ই রজব ১২৮৫ হিজরী মুতাবিক ৩০শে অক্টোবর ১৮৬৮ ইংরেজীতে।

১। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী (রহঃ) বলতেন, সুলূক তথা মারিফাত ও আধ্যাত্মিক সাধনার আগ্রহ ও শওক আমার মধ্যে এ কিতাবের মাধ্যেমেই জাগ্রত হয়েছিলো। (সূত্র– মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)

২। বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন ارواح ثلثة পৃঃ ১৪৭–১৫৫

মাওলানা ইসমাঈল ছাহেবের জীবন

মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব ফটকের উপরের দিকের একটি ঘরে থাকতেন। সংলগ্নস্থানেই একটি ছোট মসজিদ ছিলো। মসজিদের সামনেই ছিলো (বাহাদুর শাহের সম্বন্ধী) মির্যা ইলাহী বখস ছাহেবের 'টিনশেড বৈঠকখানা। একারণেই বাংলাওয়ালী মসজিদ নামে এর পরিচিতি ছিলো। মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব মির্যা এলাহী বখসের বাচ্চাদেরকে পড়াতেন। তিনি খ্যাতি ও লোকসংস্পর্শ পরিহার করে ইবাদত নিমগ্ন জীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন মাকবুল দোয়ার অধিকারী মানুষ। খোদ মির্যা ইলাহী বখসও এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের ফলেই তাঁর উচ্চ মর্তবা অনুভব করতে পেরেছিলেন।

যিকির, ইবাদত,মুসাফির সেবা, কোরআন ও দ্বীন শিক্ষা দান এ-ই ছিলো তাঁর দিন রাতের কাজ। বিনয় ও সেবা পরায়ণতা ছিলো এমনি যে, বোঝা মাথায় পিপাসাকাতর কুলি মজদুররা যখন এখানে এসে উঠতো, তখন তিনি নিজ হাতে তাদের মাথার বোঝা নামাতেন এবং কুয়া থেকে পানি তুলে তাদের পান করাতেন। পরে দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করে বলতেন- "আয় আল্লাহ! "আমি উপযুক্ত ছিলাম না। তবু তোমার বান্দাদের এতটুকু খেদমতের তাওফিক দিয়েছো। এ তোমারই মেহেরবানী।"

জনসমাগম ও ভিড়ের সময় লোটা ঘটি ও পানির বিশেষ ব্যবস্থা করে রাখতেন এবং আল্লাহর পেয়ারা হওয়ার উপায় মনে করে আল্লাহর বান্দাদের সেবা যত্নে নিয়োজিত হতেন। [১] সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহর ধ্যানে ও যিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। বিভিন্ন সময় ও অবস্থা সম্পর্কিত যে সকল 'অযীফা' হাদীছে এসেছে সেগুলো তিনি পাবন্দীর সাথে আদায় করতেন। এভাবে তিনি ইহসান-স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। [৩]

১। সূত্র- মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)

২। ইহসান অর্থ এমন এক আধ্যাত্মিক স্তর যেখানে মানুষের অন্তরে এ বিশ্বাস বিমূর্ত হয়ে উঠে যে, আল্লাহকে সে দেখছে কিংবা অন্তত আল্লাহ তাকে দেখছেন।

৩। আরওয়াহে ছালাছা

একবার তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী (রহঃ)-এর খিদমতে 'সুলূক ও তাছাওউফ' এর সবক নিতে চাইলে মাওলানা গংগোহী তাঁকে বললেন, আপনার সে প্রয়োজন নেই। কেননা তাছাওউফ সাধনার মূল উদ্দেশ্য যা তা আপনি পেয়ে গেছেন। সুতরাং অবস্থাটা কোরআন ছহী পড়ার পর কায়দা বোগদাদী পড়তে চাওয়ার মত হলো।

কোরআন তেলাওয়াতের এমন আশেক ছিলেন যে, মাঠে বকরী চরাবেন আর কোরআন তেলাওয়াত করবেন- এ ছিলো তাঁর বহু দিনের আকাঙক্ষা।

রাতে ঘরের কারো না কারো জেগে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। বারটা একটা পর্যন্ত মেঝ ছেলে মাওলানা ইয়াহয়া কিতাব পড়ায় মশগুল থাকতেন। এরপর তিনি শুয়ে পড়তেন আর মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব জাগ্রত হতেন এবং শেষ প্রহরে বড় ছেলে মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবকে জাগিয়ে দিতেন।

সর্বজনপ্রিয়তা

এমন স্বভাব নির্বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় তিনি ছিলেন যে, 'আমি কষ্ট পেয়েছি' এমন কথা বলার কেউ ছিলো না। সবার জন্য ছিলো তাঁর সমান ভালবাসা। তাই আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন সবার ভালবাসা। ইখলাছ, আল্লাহপ্রেম ও আত্মবিলোপ তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন প্রোজ্জ্বল ছিলো যে, দিল্লীতে তখন বিভিন্ন পথ ও মতের লোকেরা পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কোন্দলে লিপ্ত থাকার কারণে কেউ কারো পিছনে নামাযও পড়তে রাজী ছিলো না। অথচ তাঁর প্রতি ছিলো সকলের সমান আস্থা ও ভালবাসা, সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা। [১]

মেওয়াতের সাথে সম্পর্কের সূচনা

মেওয়াতের সাথে এ খান্দানের সম্পর্কের শুভ সূচনা হয়েছিলো তাঁর জীবদ্দশাতেই। এ সম্পর্কের ইতিহাস এই যে, একবার তিনি এই তালাশ-ফিকিরে বের হলেন যে, কোন মুসলমান পথচারীর দেখা পেলে তাকে মসজিদে ডেকে এনে জামাত করে নামায পড়বেন। কয়েকজন মুসলমানের

১। সূত্র- মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)

দেখা পেয়ে তিনি তাদের গন্তব্য ও উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কাজের সন্ধানে বের হয়েছে শুনে তিনি জানতে চাইলেন, তোমাদের জনপ্রতি মজুরি কত? তারা পরিমাণ জানালো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে আমার কাছে এই পরিমাণ মজুরি পেলে তোমরা থাকতে রাজী আছো? তারা সানন্দে রাজী হয়ে গেলো। তিনি তাদেরকে মসজিদে এনে নামায শেখাতে এবং কোরআন পড়াতে লেগে গেলেন। এভাবে পড়ার বিনিময়ে মজুরি চলতে লাগলো নিয়মিত। কিছুদিনের মধ্যেই তারা নামাযের মজা পেয়ে গেলো। ফলে মজুরি ও পয়সার মোহ কেটে গেলো। বাংলাওয়ালী মসজিদে এভাবেই শুরু হয়েছিলো মাদরাসার বুনিয়াদ। আর এই সরল দেহাতি মুসলমানরাই ছিলেন প্রথম ছাত্র বা তালিবে ইলম। এরপর থেকে দশ বারজন মেওয়াতী তালিবে ইলম নিয়মিত থাকতো এবং মির্যা ইলাহী বখস মরহুমের ঘর থেকে তাদের খাবার আসতো। [১]

মাওলানা ইসমাঈল ছাহেবের ওয়াফাত

১৩১৫ হিঃ চৌঠা শাওয়াল মুতাবিক ২৬শে ফেবঃ ১৮৯৮ সালে মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল ছাহেব ইনতিকাল করলেন। غَفَرَ لَه (তার মাগফেরাত হোক) বাক্যটি ছিলো তাঁর মৃত্যু তারিখ। [২] দিল্লী শহরের বাহরাম তেরাস্তার খেজুরওয়ালী মসজিদে ইনতিকাল হয়েছিলো। জানাযার সহযাত্রীদের এত প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিলো যে, কাঁধে বহনকারীদের সুবিধার জন্য খাটিয়ার উভয় দিকে আলাদা বাশ লাগানো সত্ত্বেও দিল্লী থেকে নিজামুদ্দীন পর্যন্ত (প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথে) বহু লোক কাঁধ দেওয়ার সুযোগই পায়নি। [৩] এ থেকেই মরহুমের সর্বজনপ্রিয়তার কিছুটা আন্দায করা যায়।

১। সূত্র– মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেব কান্ধলবী

২। প্রতিটি আরবী বর্ণের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যামান আছে। যেমন الف। এর সংখ্যামান হলো ১। বাক্যস্থ বর্ণগুলোর সংখ্যা মান হিসাবে কোন ঘটনার তারিখ বের করার একটা নিয়ম আরবী ভাষায় রয়েছে। সুলক্ষণ হিসাবে সেই নিয়মের আলোকে উত্তম কোন বাক্য থেকে ঘটনার তারিখ বের করার রেওয়ায প্রচলিত আছে।

৩। সূত্র– নিযামুদ্দীনের মুরুব্বীগণ

জানাযায় বিভিন্ন দলের বিপুল সংখ্যক লোক শরীক হয়েছিলো বহু আকীদা ও ফেরকায় বিভক্ত যে সকল মুসলমান খুব কমই কোথাও একত্র হতে পারতো এখানে তাদের সকলের অভাবিতপূর্ণ এক সমাবেশ ঘটেছিলো। মাওলানা মরহুমের মেঝ ছেলে মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব বলতেন, আমার বড় ভাই মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের অতিবিনয়নম্র স্বভাবের কারণে আমার আশংকা হলো যে, হয়ত কোন বুজুর্গকে সম্মান করে তিনি নামায পড়াতে বলে দিবেন, আর অন্য ফেরকার লোকেরা তাঁর পিছনে নামায পড়তে অস্বীকার করে বসবে। এভাবে শোকের পরিবেশে একটা অপ্রীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এজন্য আমি নিজেই আগে বেড়ে নামায পড়ানোর ঘোষণা দিয়ে দিলাম। সকলে ইতমিনান ও প্রশান্তির সাথে আমার পিছনে নামায পড়লো এবং বিরোধ গোলযোগের কোন সুযোগ হলো না। [১]

জানাযায় বিশাল জনসমাগমের কারণে একাধিক জামাতের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। ফলে দাফনকার্য কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ছাহেবে কাশফ জনৈক বুজুর্গ শুনতে পেলেন, মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব বলছেন, আমাকে তাড়াতাড়ি রুখসত করো। আমি খুবই লজ্জাবোধ করছি। কেননা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামের জামাতসহ আমার অপেক্ষায় আছেন। [২]

মাওলানার পুত্রগণ

মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল ছাহেবের তিন পুত্রের মধ্যে বড়জন মাওলানা মুহম্মদ ছিলেন প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত। তিনিই পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর [৩] গর্ভজাত পুত্রদ্বয় হলেন, মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ও মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)।

১। সূত্র– শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া

২। সূত্র– মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস

৩। ইনি হলেন মাওলানা মুযাফফর ছাহেবের দৌহিত্রী। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাওলানা মরহুম তাকে বিবাহ করেছিলেন।

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)—এর জন্ম শৈশব ও পারিবারিক পরিবেশ

তাঁর শৈশব কেটেছে কান্ধলায় নানীর বাড়ীতে এবং নিযামুদ্দীনে পিতার সান্নিধ্যে। তখন এই কান্ধলবী পরিবার ছিলো তাকওয়া ও ধার্মিকতার এক অনন্য আদর্শ। পুরুষ মহলের কথা তো বলাইবাহুল্য; তাদের স্ত্রী মহলের ইবাদতনিমগ্নতা ও রাত্রিজাগরণ, যিকির–তেলাওয়াত ও নিয়মিত আমল অযীফার ঘটনাবলীও এ যুগের দুর্বলচিত্তদের ধারণারও বহু উর্ধ্বে। ঘরে স্ত্রীগণ সাধারণভাবে নিজ নিজ সুবিধামত নফল নামাযে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আবার নিকটাত্মীয় পুরুষদের পিছনে তারাবীহ ও নফল নামাযে দাঁড়াতেন। আর রামযানুল মুবারাকে তো কোরআন তেলাওয়াতের যেন বাহার লেগে থাকতো। ঘরে ঘরে বিভিন্ন কোণে কোরআন তেলাওয়াতের মধুগুঞ্জন দীর্ঘ সময় ধরে শোনা যেতো। [১]

স্ত্রী লোকদের কোরআন বোঝার মতো জ্ঞান ও বোধ ছিলো। তাই তারা রস–স্বাদ আস্বাদনপূর্বক তেলাওয়াত করতেন। নামাযে তাঁদের আত্মনিমগ্নতা এমন হতো যে, কখনো কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণে পর্দাযোগ্য পুরুষদের আসা যাওয়া ও ছোটাছুটি টেরও পেতেন না তাঁরা। [২]

কোরআন তরজমা, উর্দু তাফসীর, মাযাহিরে হক, মাশারিকুল আনওয়ার ও হিছনে হাছীন– এই ছিলো পরিবারের মেয়ে মহলের সাধারণভাবে প্রচলিত উচ্চ পর্যায়ের নেছাব বা পাঠ্যসূচী। তখন ঘরে বাইরে পারিবারিক মজলিসে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) ও হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)–এর ঘটনাবলীর সরগরম চর্চা হতো। স্ত্রী–পুরুষ সকলেরই মুখে মুখে আলোচিত হতো ঐ সমস্ত বুজুর্গানের কাহিনী। ঘরের মা–বোনেরা শিশুদেরকে তোতা

১। সূত্র– মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস

২। এধরনের কিছু ঘটনা শুনিয়ে একদিন মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) বলেছিলেন, এমন মায়েদের কোলেই আমরা প্রতিপালিত হয়েছি। পৃথিবীতে এধরণের কোল এখন কোথায় আর পাওয়া যাবে!

ময়নার কিসসা কাহিনীর বদলে ঈমান তাজা করার এসব কাহিনী শোনাতেন। তাছাড়া এগুলো তেমন কোন পুরোনো কথাকাহিনী ছিলো না। ছিলো মাওলানা মুযাফফর হোসায়ন ছাহেবের চোখে দেখা এবং তাঁর কন্যা ভগ্নিদের কানে শোনা ঘটনাবলী। তাই শ্রোতাদের কাছে মনে হতো যেন তা কালকের ঘটনা [১]

উম্মী বী

মাওলানা মুযাফফর হোসায়ন ছাহেবের কন্যা এবং মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)–এর নানী বী আমাতুর রহমান ছিলেন 'রাবেয়া চরিত্রের' এক তাপসী নারী। খান্দানে তাঁর সাধারণ ডাকনাম ছিলো উম্মী বী। নামায ছিলো এমন যে, মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) একবার বলেছিলেন, উম্মী বীর নামাযের নমুনা ও ছাপ আমি মাওলানা গাংগোহী (রহঃ)–এর নামাযে দেখেছি। (আর মাওলানা গাংগোহীর নামায তাঁর সমস্তরেও ছিলো অতি বিশিষ্ট।) [২]

শেষ জীবনে তাঁর অবস্থা ছিলো এই যে, নিজে কখনো খাবার চেয়ে খেতেন না। কেউ সামনে রেখে দিলে তবে মুখে দিতেন। বড় পরিবার হিসাবে কাজের চাপ ও ব্যস্ততার কারণে ভুলে গেলে ক্ষুধা নিয়েই বসে থাকতেন। একবার অনুযোগ করে বলা হলো; এমন দুর্বল অবস্থায় না খেয়ে থাকেন কিভাবে! তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ!তাসবীহ থেকেই আমি রূহানী খাদ্য লাভ করি। [৩]

মাওলানার আম্মাজান

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)–এর আম্মাজান মুহতারামা ছাফিয়্যা খুব উঁচুস্তরের হাফেযা ছিলেন। বিবাহের পর প্রথম পুত্র মাওলানা ইয়াহইয়া

১। মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) একদিন আমাকে বলেছিলেন, সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রহঃ)–এর জীবন বৃত্তান্ত সম্ভবতঃ আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন না। আপনার রচিত "সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ" আমার জানাশোনায় নতুন কিছু সংযোজন করতে পারেনি।

২। সূত্র– মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)

৩। সূত্র– মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)–এর বরাতে)

ছাহেবের দুধের সময় তিনি কোরআন হেফয করেছিলেন। ইয়াদ এত পোক্ত ছিলো যে, সাধারণ হাফেয তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারতো না। রমযানে দৈনিক এক খতম ও অতিরিক্ত দশ পারা কোরআন তেলাওয়াত তাঁর নিয়ম ছিলো।

এভাবে প্রতি রমযানে তাঁর চল্লিশ খতম কোরআন পড়া হতো।[১] তেলাওয়াত এত সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো যে, ঘরের কাজকর্মে কোন অসুবিধা হতো না। বরং তেলাওয়াতের সময় হাতে কোন না কোন কাজ চালিয়ে যাওয়ার ইহতিমাম করতেন। রমযান ছাড়া অন্য সময় গার্হস্থ দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর দৈনিক আমল অযীফা ছিলো এই–

দুরূদ শরীফ– পাঁচ হাজারবার।
ইসমে যাত– পাঁচ হাজারবার।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম– একহাজার নয়শবার।
ইয়া মুগনী– এগারশবার।
ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম– দু'শবার।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– বারশবার।
হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল– পাঁচশবার।
সুবহানাল্লাহ– দু'শবার।
আলহামদু লিল্লাহ– দু'শবার।
লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ– দু'শবার।
আল্লাহুআকবার–দু'শবার।
ইসতিগফার–পাঁচশ বার।
أُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ একশ বার।
حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ একশ বার।
رَبِّ اِنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ একশ বার।
رَبِّ اِنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ একশ বার।
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ একশ বার।

এ ছাড়া কোরআন তিলাওয়াত ছিলো দৈনিক এক মঞ্জিল।[২]

১। তাযকিরাতুল খালীল ২। তাযকিরাতুল খালীল (বরাত মাওলানা ইয়াহয়া)

প্রাথমিক শিক্ষা ও শৈশব–চরিত্র

পরিবারের অন্য শিশুদের মত তাঁরও কোরআন ও মকতব শিক্ষা শুরু হলো এবং পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী শৈশবেই তিনি কোরআন হেফয সম্পন্ন করলেন। এ পরিবারে হেফযুল কোরআন এত ব্যাপক ছিলো যে, মসজিদের দেড় কাতারে মুআয্যিন ছাড়া কোন গায়রে হাফেয দাঁড়াতো না।

মাওলানা ইলয়াস ছাহেবকে উম্মী বী খুবই স্নেহ করতেন। বলতেন, 'আখতার![১] তোমার মাঝে আমি ছাহাবা কেরামের সুঘ্রাণ পাই। কখনো পিঠের উপর সস্নেহে হাত রেখে বলতেন, জানি না কি রহস্য! ছাহাবা কেরামের মতো কিছু আকৃতি আমি তোমার সাথে চলাফেরা করতে দেখি।[২]

শুরু থেকেই মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)–এর মাঝে ছাহাবাসুলভ দ্বীনী জযবা ও ব্যাকুলতার একটা ছাপ বিদ্যমান ছিলো, যা দেখে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) পর্যন্ত বলতেন, মৌলবী ইলয়াসকে দেখলে আমার ছাহাবা কেরামের কথা মনে পড়ে যায়।[৩]

পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিত্বে দ্বীনী জযবা ও আবেগের যে সুসংগঠিত প্রকাশ ঘটেছিলো তা কিন্তু তাঁর স্বভাব ও ফিতরতের মাঝেই নিহিত ছিলো। পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্পর্শ ও বুজুর্গানের জীবনকাহিনী শ্রবণ সে আবেগ–স্ফূলিংগ–এর প্রজ্বলন ঘটিয়েছিলো মাত্র। তাই দেখা যায়; 'শিশু ইলয়াস' এমন কিছু কাজ করতেন যা সাধারণ শিশুদের স্তর থেকে ভিন্ন হতো। তাঁর সমবয়সী মকতবসাথী রিয়াযুল ইসলাম ছাহেব কান্ধলবী বলেন, মকতব জীবনে একদিন লাঠি হাতে এসে তিনি বললেন, মিয়াঁ রিয়ায! চলো; বে–নামাযীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি।

১। মাওলানা ইলয়াস ছাহেবের ডাকনাম।
২। সূত্র– মাওলানা ইলয়াস ছাহেব।
৩। সূত্র– ঐ

গংগোহে অবস্থান

তাঁর মেঝ ভাই মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী (রহঃ)-এর খিদমতে থাকার উদ্দেশ্যে গংগোহ গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন।[১]

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস ছাহেব পিতার সান্নিধ্যে নিযামুদ্দীনে ছিলেন। মাঝে মধ্যে কান্ধলায় নানীর বাড়ীতেও থাকতেন। নিযামুদ্দীনে পিতার স্নেহপ্রাচুর্য এবং ইবাদাত নিমগ্নতার কারণে তাঁর শিক্ষা সন্তোষজনকভাবে হচ্ছিলো না। তাই মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব বিষয়টির প্রতি পিতার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাঁকে নিজের সাথে গংগোহ-এ নিয়ে যেতে চাইলেন। পিতা মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব খুশি মনেই সম্মতি দিলেন এবং মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) ১৩১৪ হিজরীর শেষে বা পনের হিজরীর শুরুতে মেঝ ভাইয়ের সাথে গংগোহ চলে এলেন এবং তাঁর কাছেই পড়া শুরু করলেন। [২]

তখন গংগোহ ছিলো উলামা মাশায়েখদের প্রাণকেন্দ্র। ফলে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস (রহঃ) দিনরাত্র হযরত গংগোহী (রহঃ) ও অন্যান্যদের

১। মাওলানা গংগোহী (রহঃ) মাওলানা খলীল আহমদ ছাহারানপুরী (রহঃ)-এর বিশেষ সুপারিশে এবং মাওলানা ইয়াহয়া (রহঃ)-এর খাতিরে বহুদিন পর নতুন করে হাদীছের দরস শুরু করেছিলেন। এটাই ছিলো হযরত গংগোহী (রহঃ)-এর শেষ বারের মত দরসে হাদীছ দান। বলাবাহুল্য যে, মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেবই ছিলেন এই দরসে হাদীছের আসল রওনক ও মুখ্যছাত্র। তাই তিনি যতক্ষণ বাইরে থাকতেন দরস স্থগিত থাকতো। মাওলানা গংগোহীর এমন অখণ্ড আস্থা ও আন্তরিক ভালবাসা তিনি অর্জন করেছিলেন যে, মাওলানার একান্ত সচীবের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। কিছু সময়ের জন্যও যদি তিনি বাইরে কোথাও যেতেন তখন মাওলানা গংগোহী (রহঃ) অস্থির হয়ে বলতেন, মৌলবী ইয়াহয়া হলো এ অন্ধের লাঠি। (দেখুন, তাযকিরাতুল খালীল, তাযকিরাতুর রাশীদ)

২। সূত্র– শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া

সান্নিধ্য–সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। দ্বীনের জযবা ও আবেগ অনুভূতির লালন ও পরিচর্যা এবং দ্বীনের বুঝ ও সুষ্ঠু চিন্তার উন্মেষের ক্ষেত্রে বুর্জুগানের ছোহবত ও সংস্পর্শ পরশমণিতুল্য যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তা অন্তর্দর্শীদের অজানা নয়। ভবিষ্যতের মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)-এর দ্বীনী ও রূহানী যিন্দেগীতে শৈশবের এ পবিত্র পরিবেশের কল্যাণধারা বিশেষভাবে শামিল ছিলো। স্থান ও পরিবেশগত প্রভাব গ্রহণের জন্য মানব জীবনের উপযোগীতম সময়কাল যেটা হতে পারে মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)-এর সে সময়টা কেটেছিলো গংগোহ-এ। দশ বা এগার বছর বয়সে তিনি সেখানে হাজির হয়েছিলেন। আর ১৩২৩ হিজরীতে হযরত গংগোহীর ইন্‌তিকালের সময় তিনি ছিলেন বিশ বছরের যুবক। অর্থাৎ হযরত গংগোহীর ছোহবতে জীবনের দশটা বছর তাঁর কেটেছিলে।[১]

মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব ছিলেন সুযোগ্য উস্তাদ ও বিচক্ষণ মুরুব্বী। তাই তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, যেন তাঁর প্রতিভাবান ছোট্ট ভাইটি ওলামা ও মাশায়েখের মজলিসি ছোহবতের পূর্ণ ফয়য ও বরকত হাছিল করতে পারে এবং তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে পারে। মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) বলতেন, হযরত গংগোহী (রহঃ)-এর বিশেষ শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত ওলামা-বুজুর্গান যখন গংগোহ তশরীফ আনতেন তখন মাঝে মধ্যে মুহতারাম ভাই আমার সবক বন্ধ করে দিয়ে বলতেন, এখন এঁদের মজলিসে বসে কথা শোনাই তোমার সবক।

হযরত গংগোহী (রহঃ)–এর হাতে বাই'আত

মাওলানা গংগোহী (রহঃ) সাধারণতঃ ছাত্র বয়সে বাই'আত নিতেন না। শিক্ষা সমাপ্তির পরই শুধু বাই'আতের অনুমতি দিতেন। কিন্তু মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)-এর অসাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর বাই'আতের দরখাস্ত কবুল করে নিলেন এবং বাই'আত সম্পন্ন হলো।[২]

১। সূত্র– শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ)

২। সূত্র– শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ)

প্রেমময়তা ছিলো হযরত মাওলানার স্বভাবজাত। তাঁর ফিতরতে শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিলো ইশক ও মহব্বতের স্ফুলিংগ। এবার তা পূর্ণ শক্তিতে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। আপন শায়খের সাথে তাঁর এমন হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে উঠলো যে, শায়খের অদর্শনে তাঁর মন কিছুতেই শান্ত ও তৃপ্ত হতো না। তাই মাঝে মধ্যে গভীর রাতে উঠে শায়খকে শুধু এক নজর দেখার জন্য ছুটে যেতেন এবং চোখ জুড়িয়ে ও মন তৃপ্ত করে ফিরে এসে ঘুমোতেন। এদিকে হযরত গংগোহীরও তাঁর প্রতি ছিলো অশেষ স্নেহ। মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) বলতেন, একবার আমি মুহতারাম ভাইকে বললাম, হযরতের অনুমতি হলে আমি তাঁর পাশে বসে মুতালা'আ (কিতাব অধ্যয়ন) করতে চাই। দরখাস্ত শুনে স্মিত হেসে হযরত গংগোহী (রহঃ) বললেন, কোন অসুবিধা নেই। ইলিয়াসের উপস্থিতি আমার নির্জনতায় ও আত্মনিবিষ্টতায় কোন রকম বিঘ্ন ঘটাবে না।

মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) বলতেন, যিকিরের সময় আমার অন্তরে একটা গুরুভার অনুভব হতো। হযরত গংগোহী (রহঃ)কে বিষয়টি জানালে তিনি চমকে উঠলেন এবং বললেন, মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)ও একই অনুযোগ হাজী ছাহেবের [১] খিদমতে করেছিলেন। হাজী ছাহেব তখন বলেছিলেন, আপনার দ্বারা আল্লাহ পাক কোন কাজ নিবেন।

মাওলানা ইয়াহয়া ছাহেবের শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষক হিসাবে মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিনি প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক পড়াতেন না। বরং নিজেই প্রয়োজনীয় খাতা তৈরী করে দিতেন এবং ছাত্রকে দিয়ে পাঠ আদায় করতেন। শুরু থেকেই তাঁর কাছে সাহিত্যের উপর জোর ছিলো। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)-এর চাহল হাদীছ এবং আমপারা দিয়ে বিসমিল্লাহ করতেন। তিনি বলতেন, মুসলমানের বাচ্চা তো আমপারা মুখস্থ করেই থাকে। সুতরাং শব্দ ইয়াদ করার সমস্যা নেই; এখন শুধু অর্থ জানলেই হলো। তিনি বলতেন, এমনিতেও কোরআন হাদীছের আলফায ও শব্দের নিজস্ব নূর ও বরকত রয়েছে।

১। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)

তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিলো অধ্যয়ন-যোগ্যতা গড়ে তোলা। সুতরাং পাঠ্যবই শেষ করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা ছিলো না। ছাত্রের সামনে সাধারণতঃ টীকা ব্যাখ্যাবিহীন কিতাব দিতেন। আবার নিজেও কোন সাহায্য করতেন না। যখন পূর্ণ আশ্বস্ত হতেন যে, কোন তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ছাড়া নিজস্ব যোগ্যতা বলেই ছাত্রটি কিতাবের কয়েক পৃষ্ঠা বুঝতে ও বোঝাতে পারে। তখন অন্য কিতাব শুরু করিয়ে দিতেন। আরবী ভাষায় পারদর্শিতা এবং শাস্ত্রীয় মৌলিক যোগ্যতার বিষয়টিকেই তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ফলে তাঁর ছাত্র ও শিষ্যদের মাঝে 'শাস্ত্রীয় কুশলতা' সৃষ্টি হয়ে যেতো। [১]

অসুস্থতা ও শিক্ষার বিরতি

শিশু বয়স থেকেই তিনি দুর্বল ও শীর্ণ দেহী ছিলেন। অসুস্থতা লেগেই থাকতো। গংগোহ অবস্থানকালে একবার মারাত্মক স্বাস্থ্যাবনতি ঘটলো। কী এক মাথাব্যথা শুরু হলো যে, কয়েক মাস সামান্য মাথা ঝুঁকানো, এমনকি তাকিয়ার উপর মাথা রেখে সিজদা করাও অসম্ভব হয়ে গেলো। [২]

এ সময় তিনি মাওলানা গংগোহী (রহঃ)-এর পুত্র হাকীম মাসউদ আহমদ ছাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার চিকিৎসার বিশেষ পদ্ধতি ছিলো এই যে, কোন কোন রোগীকে তিনি দীর্ঘ দিনের জন্য 'পানিমুক্ত' রাখতেন। এক ফোঁটা পানিও খাওয়ার অনুমতি ছিলো না তখন। বলাবাহুল্য যে, খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হতো এমন অদ্ভুত 'পানি সংযম' রক্ষা করা। কিন্তু মাওলানা তাঁর স্বভাবগতঃ নিয়মনিষ্ঠা ও আনুগত্যপ্রিয়তার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অটুট মনোবলের কারণে – যা তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রোজ্জ্বল ছিলো। দীর্ঘ সাত বছর এক ফোঁটা পানিও গ্রহণ না করে পূর্ণ 'পানিসংযম' পালন করেছেন। এরপরও পাঁচ বছর তিনি নাম মাত্র পানি পান করতেন। [৩]

১। সূত্র- শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ)

২। সূত্র- ঐ

৩। একথা আমি নিজে মাওলানার মুখে শুনেছি। শায়খুল হাদীছ ও খান্দানের অন্যান্য বুযুর্গের যবানীতে ধারাবাহিকভাবে একথা শোনা গেছে।

এই আশংকাজনক অসুস্থতা এবং বিশেষতঃ মস্তিষ্ক দুর্বলতার কারণে তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ পড়লো। দ্বিতীয়বার তা শুরু হওয়ার কোন আশাও দেখা যাচ্ছিলো না। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত থাকায় তিনি খুবই অস্থির পেরেশান ছিলেন। একদিকে ছিলো তার নতুনভাবে শিক্ষা জীবন শুরু করার অনমনীয়তা, অন্য দিকে ছিলো শুভানুধ্যায়ীদের পুর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ। মাওলানা বলতেন, এ অবস্থায় একদিন মুহতারাম ভাই আমাকে বললেন, আচ্ছা, লেখাপড়া করে শেষ পর্যন্ত করবেটা কি শুনি! আমি বললাম, বেঁচে থেকেই বা করবোটা কি বলুন? এমন মরণপণ মনোভাব দেখে শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিলেন আর তিনি পুনরায় পড়াশোনার হাল ধরলেন।

মাওলানা গংগোহী (রহঃ)–এর ওয়াফাত

১৩৩২ হিজরীতে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী (রহঃ) ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) তাঁর শিয়রের পাশে বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করছিলেন।[১]

মাওলানার চির কোমল হৃদয়ে এ ঘটনার কেমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিলো তা কিছুটা অনুমান করা যায় তার এ মন্তব্য থেকে "বড় শোক আমার জীবনে দু'টি মাত্রই এসেছে– পিতার মৃত্যু ও শায়খের বিদায়।" তিনি আরো বলতেন, ভাই, আমরা তো সারা জীবনের কান্না ঐ দিনই কেঁদে নিয়েছি যে দিন আমাদের হযরত দুনিয়া থেকে রোখসত হয়েছেন।

হাদীছ শিক্ষা সমাপন

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ)–এর দরসে হাদীছের হালকায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৩২৬ হিজরীতে দেওবন্দ হাজির হলেন এবং তাঁর খিদমতে থেকে তিরমিযি ও বোখারী 'শ্রবণ' করলেন।[২]

১। সূত্র– মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)
২। সূত্র– মাওলানার সহপাঠী মাওলানা ইবরাহীম বলয়াবী।

দেওবন্দের দরসে শরীক হওয়ার কয়েক বছর পর চারমাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি আপন ভাই মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেবের খিদমতে দ্বিতীয় দফা হাদীছের দাওরা করলেন।[১]

পুনঃবাই'আত এবং তাসওউফের উচ্চতর সোপানে আরোহণ

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ ছাহেবের ইনতিকালের পর তিনি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেবের খিদমতে বাই'আতের দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)–এর কাছে রুজু করার পরামর্শ দিলেন।[২] তাই তিনি হযরত মাওলানা সাহারানপুরী (রহঃ)–এর সাথে বাই'আতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানে রূহানী জগতের উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে চললেন।

১। দ্বিতীয় দফা দাওরাতুল হাদীছের মজাদার উপলক্ষ খোদ শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব শুনিয়েছেন। মওলবী শের মুহম্মদ নামের এক সীমান্ত প্রদেশীয় আলেম দীর্ঘদিন মাওলানা মাজিদ আলী ছাহেবের কাছে معقولات বা বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে দেশে ফিরে গেলেন। সেখানে ঠিক তাঁর বিবাহের দিন জনৈক তালিবে ইলম তাঁর কাছে ইবনে মাজা শরীফ পড়ার দরখাস্ত করলেন, তিনি লজ্জা প্রকাশ করে বললেন, ভাই! আমার গোটা শিক্ষা জীবন কেটে গেছে معقولات অধ্যয়নে, হাদীছ পড়া আমার মোটেই হয়নি। তবে হাদীছের এক উস্তাদ (মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহয়া ছাহেবের প্রতি ইংগিত) দেখে এসেছি। তাঁর কাছে পড়ে এসে তোমাকে পড়াতে পারবো। উক্ত মাওলানা আপন নববধুকে চারমাসের ভিতরে ফিরে আসার ওয়াদা দিয়ে গংগোহ রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেবের খিদমতে পড়া শুরু করলেন। মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস ছাহেবও তাঁর সহপাঠী হয়ে গেলেন। ইবারত বা হাদীছ পাঠ সাধারণত মাওলানা ইয়াহয়া ও মাওলানা ইলয়াস ছাহেব পড়তেন। সারারাত দরস চলতো। অন্যরা তো দিনে ঘুমোতেন। কিন্তু সীমান্ত মৌলবীকে খুব কমই ঘুমোতে দেখা যেতো। অধ্যয়ননিমগ্নতা এমনই গভীর ছিলো যে, খাদেমকে বলে দিতেন, তরকারী ছাড়া শুধু রুটি রেখে যেয়ো। তিনি রুটি ছিড়ে ছিড়ে মুখে দিতেন আর কিতাব অধ্যয়ন করতেন। সুবহানাল্লাহ!

ইবাদতনিমগ্নতা

মাওলানা রশীদ আহমদ ছাহেবের ইনতিকালোত্তর গংগোহ অবস্থানকালে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো নিরবতায় এবং মুরাকাবা ও ধ্যাননিমগ্নতায়। সারাদিনে একদু'টি কথাই হয়ত বলতেন। শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব বলেন, সে সময় তাঁর কাছে আমরা প্রাথমিক ফার্সী পড়তাম। নিয়ম ছিলো এই যে, হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দুস (রহঃ)-এর মাজারের পিছনে চাটাই বিছিয়ে দু'জানু হয়ে বিলকুল খামুশ বসে থাকতেন। আমরা সেখানে হাজির হতাম এবং তাঁর সামনে কিতাব রেখে আংগুলের ইশারায় সবকের জায়গা দেখিয়ে পড়া শুরু করতাম। পড়া ও তরজমা নিজেরাই করতাম। ভুল হওয়ামাত্র তাঁর আংগুলের ইশারায় সবক বন্ধ হয়ে যেতো। অর্থাৎ আবার মুতালা'আ দেখে পড়া তৈরী করে আসো। সে সময় নফল পড়ারও খুব জোর ছিলো। মাগরিব থেকে এশার কিছু পূর্ব পর্যন্ত নফল নামাযেই মশগুল থাকতেন। তখন বিশ ও পঁচিশের মধ্যবর্তী ছিলো তাঁর বয়স।

প্রেমাকর্ষণের অনন্য উদাহরণ

অনুরাগ ও প্রেমাকর্ষণ ছিলো মাওলানার সহজাত গুণ। অবশ্য আধ্যাত্মিক সাধনায় এ ছাড়া উন্নতি লাভ করাও সুকঠিন। বস্তুতঃ শরীর স্বাস্থ্যের বিপর্যস্ততা সত্ত্বেও যে মহাবিস্ময়কর দ্বীনী খিদমত তিনি আঞ্জাম দিতে পেরেছেন তার পিছনে প্রেমাকর্ষণ ও আত্মনিবেদনের এ সহজাত গুণই ক্রিয়াশীল ছিলো। নচেৎ এমন শরীর স্বাস্থ্যের সাথে এমন অসাধ্য সাধনের কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যায়না।

নিজের এক ঘটনা [১] প্রসংগে শেষ অসুস্থতার সময় তিনি বলেন, একবার অসুস্থতায় আমার এমন দুর্বলদশা হলো যে, দোতালা থেকে নীচে নেমে আসা

১। ঘটনা বর্ণনার উপলক্ষ হয়েছিলো এই যে, জনাব মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব নকশবন্দী দেওবন্দী-এর বিশিষ্ট খলীফা ক্বারী ইসহাক ছাহেব দেহলবী মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)-এর অসুস্থতার খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন। তিনি

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্ভব ছিলো না। এ অবস্থায় হযরত সাহারানপুরী দিল্লী এসেছেন বলে একদিন খবর পেলাম। ব্যস্, ঐ মুহূর্তেই একরকম আচ্ছন্ন অবস্থায় পায়ে হেঁটে দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। মনেই ছিলো না যে, আমি অসুস্থ এবং দু'তালা থেকে নীচে নামাই আমার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

অন্যান্য বুজুর্গান ও মাশায়েখের সাথে সম্পর্ক

এ সময় অন্যান্য মাশায়েখ এবং বিশেষতঃ মাওলানা গংগোহীর খলীফাগণের সাথেও তাঁর সান্নিধ্যমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) প্রমুখের সাথে তো এমন গভীর সম্পর্ক ছিলো যে, তিনি বলতেন, এঁরা আমার দেহ ও আত্মায় মিশে আছেন। আর তাঁরাও মাওলানার ব্যতিক্রমী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর প্রতি বিশেষ ভালবাসা পোষণ করতেন।

জেহাদী জযবা

যিকির ইবাদতের পাশাপাশি শুরু থেকে তাঁর বুকে মুজাহিদসুলভ জযবা ও উদ্দীপনা উদ্বেলিত ছিলো। যাদের জানার কথা তারা অবশ্যই জানতেন যে, তাঁর মহাকর্মময় জীবনের কোন পর্যায়ই এ জযবা ও উদ্দীপনা এবং হিম্মত ও প্রেরণা থেকে শূন্য ছিলো না। মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ)-এর হাতে তাঁর বাই'আতুল জিহাদ ছিলো এ অনন্য সাধারণ জযবারই ফসল।

বুজুর্গানের চোখে তাঁর মর্যাদা

শুরু থেকেই খান্দানের বুজুর্গান ও সমসাময়িক ওলামা মাশায়েখের চোখে তিনি বিশেষ মর্যাদার পাত্র ছিলেন এবং অল্প বয়স সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধ বড় বড় বুজুর্গানও তাঁকে খাতির সম্মান করতেন। বড়ভাই মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

বললেন, আসার মতো অবস্থা তো আমার ছিলো না। শুধু ভালবাসার আকর্ষণ টেনে নিয়ে এসেছে। তখন তিনি নিজের ঘটনা শুনিয়ে বললেন, ভালবাসার আকর্ষণ এমনই শক্তিরাখে।

ছাহেব পিতৃসমতুল্য ছিলেন। কিন্তু ছোট ভাইয়ের সাথে তাঁর আচরণ ছিলো ঠিক যেমন হযরত উছমান (রাঃ)–এর সাথে ছিলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ।

শৈশবকাল থেকে স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে শারীরিক পরিশ্রম তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বরং কিতাব অধ্যয়ন ও যিকির ইবাদতেই তাঁর বেশীরভাগ সময় ব্যয় হতো। পক্ষান্তরে মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব ছিলেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষ। নিজস্ব বাণিজ্যিক কুতুবখানার যাবতীয় কাজকর্ম তিনি সাগ্রহে ও নিবিষ্টচিত্তে আঞ্জাম দিতেন। এটা দু'ভাইয়ের জীবীকারও অবলম্বন ছিলো। কুতুবখানার ব্যবস্থাপক, যিনি মাওলানা ইয়াহয়া ছাহেবের খুব দরদী ও হিতাকাঙক্ষী ছিলেন, একদিন তিনি সহানুভূতিরূপে তাঁকে বললেন, মৌলভী ইলয়াস তো কুতুবখানার কাজে কোন সহযোগিতা করছেন না। অথচ তিনিও তা থেকে উপকৃত হচ্ছেন। তাকেও কোন কাজ দিলে ভাল হয়। মাওলানা ইয়াহয়া ছাহেব এ কথায় মনক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, হাদীছে এসেছে,

هَلْ تُرْزَقُوْنَ وَ تُنْصَرُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

(রিযিক ও আল্লাহর মদদ তো তোমরা তোমাদের দুর্বলদের বরকতেই পেয়ে থাকো।) আমার বিশ্বাস যে, এই (রুগ্ন দুর্বল) ছেলেটির বরকতেই আমরা রিযিক পাচ্ছি। সুতরাং আগামীতে তাকে যেন কোন কিছু না বলা হয়। যা বলার আমাকেই যেন বলা হয়। [১]

আকাবির মাশায়েখ মহলেও তাঁর বিশেষ কদর সমাদর ছিলো। কেননা তাঁর তাকওয়া ও ধার্মিকতা ছিলো সর্বজনবিদিত। তাই কখনো কখনো আকাবির মাশায়েখের উপস্থিতিতে ইমামতির জন্য তাঁকেই আগে বাড়িয়ে দেয়া হতো।

কান্ধলায় একবার শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী, মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেব ছাহারানপুরী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)–এর উপস্থিতিতে তাঁকে ইমাম বানানো হলো। কান্ধলবী খান্দানের বুজুর্গ মওলবী বদরুল হাসান ছাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৌতুক করে বললেন,

১। সূত্র– শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া ছাহেব।

এত বড় বড় বগি আর এমন হালকা ইঞ্জিন! তিনি মাশায়েখের কোন একজন বললেন, এ–তো ইঞ্জিনের গতি ও শক্তির উপর নির্ভর করে। [১]

মাযাহেরুল উলুম মাদরাসায় শিক্ষকতা

১৩২৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে সাহারানপুর হতে এক বিরাট হজ্জ কাফেলা রওয়ানা হলো। মাযাহেরুল উলুম মাদরাসার অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক কাফেলায় শরীক ছিলেন। এ সময় যে কজন নতুন শিক্ষক (সাময়িক) নিয়োগ লাভ করেন মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)ও তাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে মাধ্যমিক স্তরের কিতাব সমূহ পড়াতে দেয়া হলো। হাজী সাহেবানদের ফিরে আসার পর সাময়িক নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যান্যরা অব্যাহতি লাভ করলেও মাওলানা দরসের খিদমতে বহাল থাকলেন। [২]

এ সময় বেশীর ভাগ তিনি ঐসব কিতাবই পড়িয়েছেন যা নিজে আগে পড়েননি। কেননা মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেবের দরসে কিতাব আদ্যন্ত পাঠদানের নিয়ম ছিলো না। তাছাড়া অসুস্থতার কারণেও মধ্যবর্তী কিছু কিতাব বাদ পড়ে ছিলো। [৩] কিন্তু শিক্ষকতায় এসে অনধিত কিতাবগুলোও পূর্ণ দক্ষতার সাথে তিনি পাঠদান করেছেন। [৪] তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক ব্যাপক অধ্যয়নে তিনি খুব মনোযোগী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ফিকাহশাস্ত্রীয় পাঠ্যপুস্তক

১। সূত্র– মৌলভী ইকরামুল হাসান কান্ধলবী।
২। সূত্র– শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া ছাহেব।
৩। সূত্র– ঐ
৪। ইন্তিকালের কয়েক বছর আগে বস্তী জেলার করহী অঞ্চলের হিদায়াতুল মুসলিমীন মাদরাসার মুহতামীম মাওলানা হিদায়াত আলী ছাহেব মাওলানার খিদমতে দিল্লী তাশরীফ এনেছিলেন। আমি (লেখক)ও সেখানে ছিলাম। কথা প্রসংগে মাওলানা হিদায়াত আলী ছাহেব হযরত মাওলানাকে স্মরণ করিয়ে বললেন যে, আমি আপনার

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

هِدَايَة ও كَنْزُ الدَّقَائِق এর সহায়ক হিসাবে بَحْرُ الرَّائِق ، شَامِي মত বিশ্বকোষ জাতীয় ফিকাহ গ্রন্থগুলোও তিনি অধ্যয়ন করতেন। আবার উছূলে ফিকাহ (ফিকাহশাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ) نُورُ الْأَنْوَار এর জন্য حُسَامِي এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ, এমনকি تَوْضِيْح تلويح পর্যন্ত দেখতেন।[১]

বিবাহ

৬ই যিলকদ ১৩৩০ হিজরী মুতাবিক ১৭ই অক্টোবর ১৯১২ ইংরেজী রোজ শুক্রবার বাদ আছর আপন মামা মৌলবী রউফুল হাসান–এর কন্যার সাথে মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)–এর আকদ সম্পন্ন হয়। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)– এই তিন আকাবিরের উপস্থিতিতে বড়ভাই মাওলানা মোহাম্মদ ছাহেব বিবাহ পড়িয়েছেন। মাওলানা থানবী (রহঃ)–এর বিখ্যাত ওয়ায فوائد الصحبت (যা বার বার ছাপা হয়েছে) এ অনুষ্ঠান উপলক্ষেই কান্ধলাতে প্রদত্ত হয়েছিলো।[২]

প্রথম হজ্জ

১৩৩৩ হিজরীতে মাওলানা খলীল আহমদ ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) হজ্জ সফরে যাচ্ছেন শুনে মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)ও হজ্জের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, এ দুই বুজুর্গের অনুপস্থিতিতে গোটা হিন্দুস্তান আমার কাছে অন্ধকার হয়ে আসছে মনে হলো। এখানে থাকার কথা চিন্তা করাও কষ্টকর মনে হতে লাগলো। কিন্তু অনুমতি লাভের প্রশ্ন ছিলো। অদ্ভুত এক দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবস্থা দেখা দিলো। মাওলানার আপন বোন (মৌলভী ইকরামুল হাসান ছাহেবের আম্মা) তাঁর অস্থিরতা দেখে বললেন, আমার অলংকারগুলো নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। পুত্রের এত দীর্ঘ সফর এবং এত দীর্ঘ বিচ্ছেদ মেনে নিয়ে আম্মা সহজে অনুমতি দিবেন এমন আশা ছিলো না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তিনিও অনুমতি দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় পর্যায় ছিলো ভাই মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেবের অনুমতি লাভ। তিনি 'আম্মা অনুমতি দিবেন না' ভেবে নিজের অনুমতিকে মায়ের অনুমতি সাপেক্ষ করলেন। অথচ তিনি তো অনুমতি দিয়ে বসে আছেন। সর্বশেষ পর্যায় ছিলো মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেবের অনুমতি। সফরের ইন্তিজাম আয়োজনের যাবতীয় অবস্থা জানিয়ে এই মর্মে তাঁর খিদমতে চিঠি লিখলাম যে, খরচের তিনটি উপায় হাতে আছে। প্রথমতঃ বোনের অলংকার গ্রহণ। দ্বিতীয়তঃ ঋন গ্রহণ। তৃতীয়তঃ কতিপয় আপনজনের দান গ্রহণ। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে সফরের অনুমতি দিলেন এবং খরচ সম্পর্কে শেষ প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন।[১] এভাবে হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হলো এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)–এর সহযাত্রী হওয়ার সুযোগ হলো। মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেব প্রথম জাহাজে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। আর তিনি ১৩৩৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে দ্বিতীয় জাহাজে মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ)–এর সহযাত্রীরূপে রওয়ানা হলেন এবং রবিউস–সানীতে ফিরে এসে যথারীতি মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন।[২]

মাওলানা ইয়াহয়া ছাহেবের ওয়াফাত

হজ্জের দ্বিতীয় বছর ৩৪ হিজরীর যিলকদ মাসে মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেবের ইন্তিকাল হলো। মাওলানার জন্য এ ঘটনা ছিলো ধৈর্যের

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

কাছে সে সময় মাদরাসার দরসে কুতবী পড়েছি। তিনি খুব সরল মনে কয়েকবার বললেন, হযরত, তখন তো আপনি এত উঁচু স্তরের জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ কথা বলতেন না। এ কথায় হযরত মাওলানা মৃদু হাসলেন মাত্র। অন্য এক সময় তিনি আমাকে বললেন, মৌলবী হিদায়াত আলী আমার কাছে কুতবী পড়ার কথা বলেছেন, আমি নিজে কিন্তু কুতবী পড়িনি। মাদরাসায় পড়িয়েছি।

১। সূত্র– শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া ছাহেব।

২। সূত্র– শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া ছাহেব।

১। সূত্র– মৌলবী ইকরামুল হাসান ও মৌলবী ইনআমুল হাসান

২। সূত্র– শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া ছাহেব।

কঠিন পরীক্ষা। কেননা একাধারে তিনি ছিলেন তাঁর মুরুব্বী, উস্তাদ ও স্নেহশীল ভাই। বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য [১] ও সর্বজনপ্রিয় স্বভাবের কারণে গোটা বন্ধু মহলই মরহুমের বিচ্ছেদ ব্যথায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)-এর হৃদয়ের এ শোকাঘাত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিলো। পরবর্তীতে যখনই তিনি প্রিয় ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতেন একটা আত্মসমাহিত ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। চারপাশের পরিচিত সবকিছু যেন তিনি ভুলে যেতেন। মরহুমের বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্ট্য ও জীবন-ঘটনা উপভোগের সাথে শোনাতেন আর বলতেন, জনাব! ভাই তো আমার এমন ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর বহুমুখী যোগ্যতা, সমঝোতাপ্রিয় মনোভাব, স্বভাব ভারসাম্য, বিভিন্ন পথ ও মতের এবং দৃশ্যতঃ বিপরীত মেরুর লোকদেরকেও একত্র ধরে রাখার স্বভাবযোগ্যতা, এবং অসাধারণ বোধ ও বুদ্ধির ঘটনাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত ও বিশদ বিবরণ দিতেন এবং শাস্ত্রীয় আলোচনায় তাঁর বিভিন্ন গবেষণাজাত মতামত ও বক্তব্যের বরাত দিতেন।

১। মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব আশ্চর্য রকম সতেজ সজীব স্বভাব নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন। بَكَّاء بِاللَّيلِ بِسَام بِالنَّهَار (রাতের নির্জনতায় অশ্রু বিসর্জনকারী অথচ দিনের আলোতে হাস্যোজ্জ্বল) এই ছিলো তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য। একদিকে চলছে মৃত্যু চিন্তায় অঝোর অশ্রু বর্ষণ; অন্যদিকে আবার নির্দোষ হাস্যরসের মাধ্যমে বন্ধুদের চিত্তরঞ্জন। চোখে ঝলমলে অশ্রু, ঠোঁটে মৃদু মধুর হাসি আর মুখে মিষ্টি কথা- তিনি ছিলেন এই তিনের ফুলতোড়া। তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ- উষ্ণতা এবং নির্জন রাতের আহাজারির খবর কম লোকেরই জানা ছিলো। অতি সাধারণ মানুষের মত ছিলো চলাফেরা। মাদরাসায় পড়াতেন অবৈতনিক এবং জীবীকার জন্য করতেন কিতাবের ব্যবসা। কুতুবখানার যাবতীয় কাজ নিজ হাতেই করতেন। হয়ত কোন সাহিত্য গ্রন্থ মুখস্থ পড়াচ্ছেন। সেই সাথে বইয়ের পার্সেলও তৈরী করছেন। জ্ঞান ও ইলমের সাথে অতি উচ্চ পর্যায়ের সহজাত সম্পর্ক ছিলো। আরবী সাহিত্য ও হাদীছ গ্রন্থাদি বিশেষভাবে নখদর্পনে ছিলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বস্তি নিযামুদ্দীনে অবস্থান, অধ্যাপনা ও মাদরাসা পরিচালনা

মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের ওয়াফাত

মাওলানা ইয়াহয়া ছাহেবের মৃত্যুর দু' বছর পর ১৩৩৬ হিজরীর ২৫শে রবিউস-সানী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মাওলানা মুহম্মদ ছাহেব ইন্তিকাল করেন।

ফিরেশতাতুল্য মানুষ মাওলানা মুহম্মদ ছিলেন বিনয়, সহনশীলতা, স্নেহ-কোমলতা এবং আল্লাহভীতি ও আল্লাহপ্রেমের মূর্তপ্রতীক এবং عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا [১] এর জীবন্ত রূপ। সল্পবাক, নির্বিরোধী, নিসংগতাপ্রিয়, এবং সদা কর্তব্যসচেতন এ মহান বুজুর্গ দুনিয়াবিমুখ ও তাওয়াক্কুলপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। বস্তি নিযামুদ্দীনের বাংলাওয়ালী মসজিদে আপন পিতার স্থলবর্তীরূপে তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখানে পিতার হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষার একটি মাদরাসা ছিলো। সাধারণতঃ মেওয়াতী বাচ্চারাই তাতে লেখাপড়া করতো। তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ-ভরসার ভিত্তিতে অল্পেতুষ্টির উপর মাদরাসা চলতো। দিল্লী ও মেওয়াতের অসংখ্য মানুষের অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিলো তাঁর প্রতি। উভয় স্থানেই তাঁর রূহানী ফয়যের কল্যাণধারা প্রবাহিত ছিলো। তাঁর ছুরত দেখে মানুষ তাকওয়া ও পরহেযগারীর শিক্ষা লাভ করতো। চেহারায় ছিলো নূর ও তাজাল্লীর অপূর্ব প্রকাশ। প্রায় সময় ওয়াযও করতেন; তবে বসে বসে আলাপচারিতার ভংগিতে। বক্তৃতার আকৃতি প্রকৃতি তাতে থাকতো না। বরং চারিত্রিক মহত্ত্ব ও সংসার নিরাসক্তি তথা যুহদ বিষয়ক কিছু হাদীছ সরল তরজমা ও মতলবসহ বয়ান করে দিতেন।

১। তারাই রাহমানের বান্দা যারা জমিনে বিনম্রভাবে বিচরণ করে।

একবার চোখের কাছাকাছি একটি ফোঁড়া একে একে সাতবার কাটা পড়ল। চিকিৎসকগণ ক্লোরফরম প্রয়োগ করা জরুরী বললেও তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করে সজ্ঞানেই নিশ্চল পড়ে থাকলেন। চিকিৎসকগণ তাজ্জব বনে স্বীকার করলেন যে, সারা জীবনে আমরা এর নযীর দেখিনি।

মাওলানা মুহম্মদ ছাহেব ছিলেন এমন মহান ব্যক্তি যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো পবিত্র সুন্দর এবং যিকরের সজীবতায় সজীব সবল। হাদীছ মাওলানা গংগোহী (রহঃ)–এর কাছে পড়েছেন। ইনতিকালের পূর্বে ১৬ বৎসর পর্যন্ত কখনো তাহাজ্জুদের নামায ছুটেনি। শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বা–জামা'আত নামায পড়ে বিতরের সিজদায় গিয়ে ইনতিকাল করেছেন। [১]

নিযামুদ্দীনে স্থানান্তরের প্রস্তাব

বড় ভাইয়ের সেবা শুশ্রূষার জন্য মাওলানা ইলয়াস ছাহেব আগে থেকেই দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। চিকিৎসা উপলক্ষে কাছাবপুরস্থ নওয়াবওয়ালী মসজিদে থাকা হচ্ছিলো। সেখানেই মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের ইনতিকাল হলো এবং যথারীতি জানাযা নিযামুদ্দীনে নিয়ে আসা হলো। জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিলো।

কাফন দাফনের পর এই খান্দানের ভক্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস ছাহেবকে নিযামুদ্দীনে স্থায়ী বসবাস শুরু করার জন্য জোর অনুরোধ জানিয়ে বললো;

আপনি এসে পিতা ও ভাইয়ের শূন্যস্থান পুনঃআবাদ করুন। তারা মাদরাসার সর্বপ্রকার খিদমতের ওয়াদাপূর্বক ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু মাসিক চাঁদাও বসালো। মাওলানা তাঁর সারা জীবনের অনুসৃত নীতি ও শর্ত সাপেক্ষে তা গ্রহণ করলেন। [২] তবে তাঁর স্থায়ী আগমনের বিষয়টি হযরত সাহারানপুরীর অনুমতির উপর ঝুলন্ত রাখলেন। সবাই বললো, আমরা নিজেরা গিয়ে অনুমতি আনব। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এভাবে (চাপ প্রয়োগ করে) অনুমতি হয় না। আমি একা কথা বলবো।

১। সূত্র– মাওলানা জাফর আহমদ থানবী
২। সূত্র– মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস ছাহেব

ভাইয়ের কাফন দাফন এবং মাদরাসার সাময়িক ব্যবস্থাপনা থেকে অবসর হওয়ামাত্র তিনি সাহারানপুর এসে শায়খকে সমস্ত অবস্থা অবহিত করলেন। ভক্ত অনুরক্তদের অব্যাহত অনুরোধের ফলে এবং উভয় পুণ্যাত্মা পিতা–পুত্রের পবিত্র হাতে হিদায়াত ও কল্যাণের যে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছিলো তা অব্যাহত রাখার তাগিদে হযরত সাহারানপুরী তাঁকে অনুমতি দান করলেন। তবে সতর্কতার খাতিরে বললেন, আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে মাদরাসা থেকে এক বছরের ছুটি গ্রহণ করা হোক। যদি সেখানে মন বসে এবং স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত হয় তখন স্থায়ী অব্যাহতি গ্রহণ করা যাবে।

শায়খের পরামর্শ মতে মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস ছাহেব মুহতামিম ছাহেব, মাদরাসা মাযাহিরুল উলুম বরাবরে নিয়ম মাফিক যে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন নীচে তা হুবহু তুলে ধরা হলো।

> হযরত মুহতামিম ছাহেব!
>
> মাসনুন সালামবাদ নিবেদন এই যে, ভাই জনাব মাওলানা মুহম্মদ ছাহেব–এর ইন্তিকালের শোকাবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে মাদরাসা নিযামুদ্দীনের ইনতিজাম ও দেখাশোনার জন্য কিছুদিন সেখানে আমার থাকার দরকার। যেহেতু অধিকাংশ শহরবাসী, অধমের মুহিববীন ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ তাগাদা দিচ্ছেন যেন আমি অধম সরাসরি সেখানে অবস্থান করি। তাছাড়া মহান পিতা ও ভ্রাতার শিক্ষা–দীক্ষা ও মেহনত মুজাহাদার বরকতে জ্ঞান ও শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এই মুর্খ গোয়ার মানুষগুলোর মাঝে জ্ঞান ও শিক্ষা এবং ইলম ও তালীম প্রচারের যে সুফল অর্জিত হয়েছে তা দেখে নিজের অন্তরেও আকাঙক্ষা জাগছে যে, কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে উক্ত মেহনত পুনরায় চালুর চেষ্টা করি এবং এই মহান দ্বীনী কাজেও কিছু হিসসা লই। তাই অনুগ্রহপূর্বক এক বছর সময়ের জন্য অধমের ছুটি মঞ্জুর করা হোক। ওয়াসসালাম
>
> ইতি বান্দা মুহম্মদ ইলয়াস আখতার

নৈরাশ্যজনক অসুস্থতা ও জীবনাশংকা

নিযামুদ্দীনে গমনের আয়োজন শুরু না হতেই অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ১৩৩৬ হিজরীর ২০শে জুমাদাল উলা তারিখে অসুস্থ অবস্থায় সাহারানপুর হতে কান্ধলায় পৌঁছলেন। সেখানে অসুখের আরো বাড়াবাড়ি হলো এবং প্লুরিসি (pleurisy) মারাত্মক আকার ধারণ করলো। এক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, শিরা একেবারেই বসে গেলো এবং হাত পা শীতল হয়ে গেলো। ফলে সকলে আশা ছেড়ে দিয়ে 'ইন্না লিল্লাহি' শুরু করলো। কিন্তু এখনো তো তাঁর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনেক কাজ নেয়া বাকি ছিলো। তাই স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে রোগের উপশম হয়ে সুস্থতার লক্ষণ ফুটে উঠলো এবং অল্প দিনেই তিনি রোগশয্যা ত্যাগ করলেন। যেন নতুনভাবে জীবন ফিরে পেলেন।

নিযামুদ্দীনে আগমন

সুস্থ হয়ে তিনি কান্ধলা থেকে নিযামুদ্দীনে চলে এলেন। সে সময় নিযামুদ্দীনের এ দিকে কোন বস্তি ছিলো না। মসজিদের আশে পাশে শুধু বিস্তীর্ণ জংগল ছিলো। কিছুদিন পর শৈশবেই মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেব তাঁর কাছে নিযামুদ্দীনে চলে এসেছিলেন। তিনি বলেন, বাইরে এসে এ আশায় আমি পথ চেয়ে থাকতাম যে, যদি কোন মানুষের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ কোন মানুষের দেখা পেয়ে গেলে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো খুশী হতাম।

একটি ছোট পাকা মসজিদ, একটি বাংলাঘর, একটি হুজরা, দরগাহর দক্ষিণ দিকে সংশ্লিষ্ট লোকদের বসতি আর অল্প ক'জন মেওয়াতি অ-মেওয়াতি গরীব তালিবে ইলম। মোটকথা, মাদরাসা, মসজিদ ও সংশ্লিষ্ট ঘরবাড়ী– এই ছিলো নিযামুদ্দীনের সমগ্র আবাদী।

স্বাচ্ছন্দ্যে চলার মতো আয়ের নিয়মিত কোন সূত্র মাদরাসার ছিলো ন। তাওয়াক্কুল ও আল্লাহভরসা এবং অল্পেতুষ্টি ও পরিচালকের অটুট মনোবলই ছিলো আসল পুঁজি। অশেষ অনটন ও কষ্টসহিষ্ণুতার সাথেই দিনগুজরান হতো। এমনকি অনাহারের পালাও শুরু হতো। কিন্তু তাতে হযরত মাওলানার কপালে চিন্তার রেখা দেখা যেতো না। কখনো ঘোষণা করে দিতেন, আজ খাবার নেই।

যার ইচ্ছা থাকুক যার ইচ্ছা পছন্দ মতো ব্যবস্থা করে অন্য কোথাও চলে যাক। তালিবে ইলমদেরও এমন রূহানী তারবিয়াত হচ্ছিলো যে, অনাহারের ভয়ে কেউ চলে যেতে রাজী ছিলো না। কখনো কখনো বন্য ফল সংগ্রহ করে ক্ষুধা মিটানো হতো। তালিবে ইলমরা জংগল থেকে কাঠ এনে রুটি ভেজে চাটনী সহযোগে খেয়ে নিতো। এমন কঠিন পরিস্থিতেও হযরত মাওলানা মোটেও বিচলিত ছিলেন না। বরং সমাগত সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের কথা ভেবেই তিনি শংকিত হতেন এবং সাথীদের সতর্ক করতেন। কেননা তিনি আশা করছিলেন যে, আল্লাহর চিরন্তন বিধান হিসাবে অনটনের পরীক্ষার পর প্রাচুর্যের পরীক্ষা আসবে।

মাদরাসার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও নির্মাণকাজে মাওলানার বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিলো না। তাঁর পুরোনো সাথী এবং মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র হাজী আব্দুর রহমান ছাহেবের প্রচেষ্টায় হযরত মাওলানার নীতি ও রুচির বিরুদ্ধে দিল্লীর কতিপয় ব্যক্তি কয়েকটি হুজুরা তৈরী করে দিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এত অসন্তুষ্ট হলেন যে, দীর্ঘদিন হাজী ছাহেবের সাথে কথা পর্যন্ত বলেননি। তাঁর ভাষায়– আসল কাজ হলো শিক্ষা ও তালীম, (অমুক) মাদরাসার ইমারাত যখন পাকা হলো তালীম কাঁচা হয়ে গেলো। [১]

দিল্লীর এক বড় ব্যবসায়ী কোন গুরুতর বিষয়ে একবার দু'আর দরখাস্ত করলেন এবং মোটা অংকের নযরানা পেশ করলেন। তিনি দু'আর ওয়াদা তো করলেন কিন্তু নযরানা কবুলের ব্যাপারে ওজর পেশ করলেন। এদিকে হাজী

১। শুভস্মরণীয় হাজী আব্দুর রহমান ছাহেবের জন্ম মেওয়াতের এক অমুসলিম বেনিয়া পরিবারে। শৈশবে স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করে তিনি মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মাদরাসা নিযামুদ্দীনেই মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের কাছে কোরআন ও দ্বীনী শিক্ষা হাছিল করেছেন এবং মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেবের হাতে বাই'আত হয়েছেন। মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের সময় তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য সহকারী ছিলেন। মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)–এর সমস্ত দ্বীনী কাজে তিনি প্রবীণতম সাথী ও সহকর্মী ছিলেন। হযরত মাওলানা তাঁর অতি উচ্চ প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে তাঁর দ্বীনী

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

আব্দুর রহমান ছাহেব মাদরাসার প্রয়োজন ভেবে টাকাটা নিয়ে নিলেন। জানতে পেরে হযরত মাওলানা বার বার পেরেশান হয়ে রইলেন এবং তাগিদপূর্বক তা ফেরত দেয়ালেন। হাজী ছাহেবকে তিনি বারবার বলতেন, দ্বীনের কাজ পয়সায় চলে না। তাহলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অঢেল সম্পদ দেয়া হতো।

ইবাদত ও মুজাহাদা

এ সময়টা ছিলো মাওলানার অসাধারণ রিয়াযাত মুজাহাদার যামানা। অবশ্য মুজাহাদাপ্রিয়তা ছিলো তাঁর স্বভাবগত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে নিযামুদ্দীনে অবস্থানকালে। নির্জনতা ও ধ্যান–সাধনার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিলো এ সময়। হাজী আব্দুর রহমান ছাহেব বলেন, আরব সরায় ফটকে, হুমায়ুন সমাধির দক্ষিণে হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার প্রাচীন ইবাদতখানায়, আব্দুর রহীম খানে খানান–এর মাকবারায় এবং (হযরত মিরযা মাযহার জানেজাঁনা (রহঃ)–এর পীর) শায়খ সৈয়দ নূর মুহম্মদ বাদায়ূনীর মাযারের নিকটে প্রহরের পর প্রহর নির্জনে কাটাতেন। দুপুরের খাবার সাধারণতঃ সেখানেই পৌঁছে দেয়া হতো। রাতের খাবার ঘরে ফিরে খেতেন। সকল নামায জামা'আতের সাথেই পড়তেন। জামা'আত করানোর জন্য আমরা সেখানে চলে যেতাম। সবক পড়ার জন্য কখনো ছাত্ররা সেখানে হাজির হতো। কখনো আবার চক্করওয়ালী মসজিদে এসে পড়িয়ে যেতেন।

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ মনে করতেন। বস্তুতঃ তিনি মেওয়াতের প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন এবং আল্লাহ পাক তাঁকে দ্বীনের বড় দৌলত দান করেছিলেন। তাঁর আসল ঝোঁক ছিলো অমুসলমানদের মাঝে তাবলীগ করা। এ ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবযোগ্যতা ছিলো। এক হাজারেরও বেশী মানুষ তার হাতে মুসলমান হয়েছিলো। শিংগার অঞ্চলে নও মুসলিমদের জন্য একটি মাদরাসা কায়েম করেছিলেন। এর সাথে আজীবন তাঁর সন্তানতুল্য সম্পর্ক ছিলো। মেওয়াতের শরীয়ত বিরোধী রসম রেওয়াজের ইছলাহ ও সংশোধন হলো তাঁর অন্যতম কীর্তি। ৬৪ হিজরীর রবিউস–সানীতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দরসে হাদীছের পূর্বে অযু করে দু' রাকাত নামায পড়ে নিতেন। বলতেন, হাদীছের হক তো আরো বেশী। এ হলো ন্যূনতম পরিমাণ, যা না করলেই নয়। হাদীছ পড়ানোর সময় কারো সাথে কথা বলা কিংবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনে দরস ছেড়ে তার প্রতি মনোযোগী হওয়ার নযির তাঁর এখানে ছিলো না।

ভক্ত খেদমতগাররা তো সাথেই ছিলো। কিন্তু খানার সময় বিলম্বিত হয়েছে বলে কখনোই কারো উপর রাগ করেননি বা খাবার বিস্বাদ হয়েছে বলে দোষ ধরেননি।

দরস নিবিষ্টতা ও পরিশ্রম

সবকসহ ছাত্রদের যাবতীয় বিষয়ে তিনি ছিলেন অতি যত্নশীল। ছোট বড় সকল সবক ছাত্রদেরকে মনপ্রাণ ঢেলে পরিশ্রম করে নিজেই পড়াতেন। কোন কোন দিন আশিজন ছাত্র পর্যন্ত নিজে পড়িয়েছেন কিংবা (উপরের জামা'আতের) ছাত্রদের দিয়ে পড়িয়েছেন। এ থেকেও তাঁর কর্মনিমগ্নতা কিছুটা আঁচ করা যায় যে, এক সময় হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাব মুসতাদরাকে হাকিম–এর দরস ফজরের নামাজের আগেই হয়ে যেতো। [১]

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাওলানার নিজস্ব মতামত ও চিন্তাধারা ছিলো। তাঁর কাছে ছাত্রদের দরসপুর্ব মুতালা'আ ও অধ্যয়নের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। তিনি চাইতেন যে, ছাত্ররা সবক এমনভাবে বুঝে আসবে যাতে উস্তাদের মুখ খোলারই প্রয়োজন না হয়। পাঠ বিশুদ্ধতা, ভাষাজ্ঞান ও নির্ভুল ব্যাকরণ প্রয়োগের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কিতাব নির্বাচনে প্রচলিত মাদরাসা–নিছাব ও পাঠ্যসূচী অনুসরণের কোন বাধ্যবাধকতা ছিলো না। বরং সাধারণতঃ মাদরাসায় পড়ানোর রেওয়াজ নেই এমন বহু কিতাবই পাঠ্য হিসাবে তাঁর পছন্দ ছিলো। বিষয়বস্তু আত্মস্থ করে অন্যকে বোঝানোর যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন পন্থা তিনি উদ্ভাবন করতেন, যা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতো।

১। সূত্র– মাওলানা সৈয়দ রেযা হাসান ছাহেব।

তৃতীয় অধ্যায়

মেওয়াতে তালীম ও দাওয়াতের সূচনা

মেওয়াত

দিল্লীর দক্ষিণে প্রাচীনকাল থেকে 'মেও' জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত যে এলাকা সেটাই মেওয়াত নামে পরিচিত। তখন গোড়গানো (পাঞ্জাব প্রদেশের আনবালা কমিশনারি)–এর বৃটিশ জেলা, ইল্লোর ও ভরতপুরের হিন্দু রাজ্য সমূহ এবং যুক্ত প্রদেশের মথুরা জেলার অংশ বিশেষ মেওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অন্যান্য এলাকার মত মেওয়াতের সীমানা ও আয়তনেও পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন ও আদী মেওয়াতের আয়তন বর্তমান মেওয়াত থেকে স্বভাবতঃই কিছুটা ভিন্ন ছিলো। জনৈক ইংরেজ লেখক [১] প্রাচীন মেওয়াতের সীমানা নির্ধারণ করেছেন এভাবে–

"প্রাচীন মেওয়াত অঞ্চল মোটামুটি ঐ বক্র রেখার ভিতরেই অবস্থিত যা উত্তরে (ভরতপুরের) 'ডিগ' থেকে 'রিওয়াড়ি'–এর অক্ষরেখার কিছুটা উপর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পশ্চিমে 'রিওয়াড়ি'–এর নীচে দ্রাঘিমা রেখার ঐ বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত যা ইল্লোর শহর থেকে ছয় মাইল দূরত্বে পশ্চিমে এবং ইল্লোরের 'বারাচশমা'–এর দক্ষিণে অবস্থিত।"

উক্ত রেখা অতঃপর বৃত্তাকার হয়ে 'ডিগ' অঞ্চলে গিয়ে মিশেছে এবং উক্ত রেখার প্রায় দক্ষিণ সীমানা তৈরী করেছে।

মেওজাতি

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে আর্য বংশ নয় বরং ভারতের প্রাচীন অনার্য বংশধারার সাথেই মেও জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক।'এ হিসাবে তাদের ইতিহাস

১। MAJOR P. W. POWLETT LATE SETTEMENT OFFICER OF ALWER

ঐতিহ্য আর্যবংশীয় রাজপুত্রদের চেয়েও প্রাচীন। ইংরেজ বিবরণ মতে মেওয়াতের খানজাদাগণ মূলতঃ রাজপুত বংশোদ্ভুত। ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস–গ্রন্থগুলোতে 'মেওয়াতী' বলে এই খানজাদাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আইনে আকবরী থেকে জানা যায়, জাদুরাজপুতরাই মুসলমান হয়ে মেওয়াতি নামে পরিচিত হয়েছে।

তারীখে ফিরোযশাহীতে মেওয়াতের নাম সর্বপ্রথম শামসুদ্দীন ইলতুমিশের আলোচনায় এসেছে। দিল্লীর মুসলিম সালতানাতের গোড়ার দিকে মেওয়াতিরা 'ত্রাস' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন–গভীর বনজংগলের আশ্রয় নিয়ে তারা দিল্লীতে লুটতারাজ শুরু করে দিয়েছিলো। মেওয়াতি–ভীতি তখন এমনই ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, সন্ধ্যার মুখেই রাজধানীর সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। সন্ধ্যার পরে নগর প্রাচীরের বাইরে যাওয়ার সাহস হতো না কারো। তা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে কোন না কোন কৌশলে মেওয়াতিরা শহরে ঢুকে পড়ে লুটতারাজের সুযোগ খুঁজতো। ফলে শহরবাসীরা ভয়ংকর নিরাপত্তাহীনতা বোধ করতো। এদের শায়েস্তা করার জন্য গিয়াসুদ্দীন বলবন এক বড় অভিযান প্রেরণ করেন। তাতে বিপুল সংখ্যক মেওয়াতি হতাহত হয়। তাছাড়া শহরে আফগান সৈন্যদের চৌকিও স্থাপন করা হয়েছিলো এবং সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় দিল্লীর উপকণ্ঠীয় বন পরিষ্কার করে গোটা এলাকা কৃষিভূমিতে পরিণত করা হয়েছিলো। [১] এরপরে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় মেওয়াতিদের কোন আলোচনা নেই।

শতাব্দী ব্যাপী অজ্ঞাতবাসের পর দেখা গেলো; যুদ্ধবাজ ও দুঃসাহসী মেওয়াতিরা মাঝে মধ্যেই আবার কেন্দ্রীয় সরকারকে উত্তক্ত করা শুরু করেছে। ফলে সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ প্রসংগে বাহাদুর নাহির ও তার কতিপয় উত্তরসুরীর নাম ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বের সাথে এসেছে; যারা অসীম সাহসিকতা ও অসাধারণ যোগ্যতাবলে মেওয়াতে নিজেদের সরকার ও শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সেনা অভিযানের ফলে একটি ক্ষুদ্র এলাকার জায়গীর রূপেই তা টিকে ছিলো।

১।তারীখেফিরেসতা।

ফিরোযশাহের আমলে ইসলাম গ্রহণকারী লক্ষণপাল নামে অপর এক বিখ্যাত খানজাদা গোটা মেওয়াত ও সংলগ্ন অন্যান্য এলাকা নিজের অধিকারে এনেছিলেন।

মেও জনগোষ্ঠী কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলো? কোন ঘটনা ও পরিস্থিতি এর পিছনে কাজ করেছে? তদ্রূপ সমগ্র জনগোষ্ঠী একযোগে 'ইসলাম গ্রহণ' করেছিলো, না কি ধীরগতিতে কয়েক শতকের সময় পরিধিতে তা সম্পন্ন হয়েছিলো? এ সকল প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত উত্তর খুঁজে বের করা এখন আর সম্ভব নয়। কেননা এ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক ইতিহাস, বিশেষতঃ তাদের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস মহাকালের অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে আছে। পরস্পর বিরোধী ও অস্পষ্ট কতিপয় 'লোক-বিবরণ' ছাড়া কোন ঐতিহাসিক সূত্রই আজ আমাদের হাতে নেই।

মেওয়াতিদের ধর্ম ও চরিত্র

মুসলমানদের সুদীর্ঘকালের অব্যাহত অমনোযোগ ও উদাসীনতা এবং মুর্খতা ও ধর্মবিমুখতার কারণে 'মেও' জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অবক্ষয় এতটা নীচে নেমে গিয়েছিলো যে, অতঃপর জাতীয় ধর্মান্তর ছাড়া আর কোন স্তর অবশিষ্ট ছিলো না। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের তুলনায় একজন অমুসলিমের অনুভূতি অবশ্যই কম হওয়ার কথা। কিন্তু মেওয়াতি জনগোষ্ঠীর ইসলামহীনতা অমুসলিম ঐতিহাসিকের স্থূল অনুভূতিকেও নাড়া দিয়েছে। নীচের উদ্ধৃতিগুলো থেকে মেওয়াতিদের ধর্মীয় অবক্ষয় ও চারিত্রিক বিপর্যয়ের কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইল্লোর স্টেটের ভূমি প্রশাসন অফিসার রূপে কর্মরত Major p.w. powlettlate ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত 'ইল্লোর গেজেটিয়ার' এ লিখেছেন-

"বর্তমানে প্রায় সমগ্র মেওয়াতি জনগোষ্ঠী মুসলমান হলেও তা শুধু নামে মাত্র। হিন্দু জমিদারদের উপাস্য দেবতাই মেওয়াতিদের পূজ্য দেবতা। মুহররম, ঈদ ও শবে বরাতের চেয়ে হোলি খেলার গুরুত্ব মেওয়াতিদের কাছে কোন অংশেই কম নয়। জন্মঅষ্টমী, দশহরা, দেওয়ালি ইত্যাদি বেশ কিছু হিন্দুপর্ব

মেওয়াতিরাও পালন করে থাকে। বিয়েশাদীর 'শুভদিন' নির্ধারণের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা হয়। 'রাম' ছাড়া সব হিন্দুনাম তারা গ্রহণ করে। নামের শেষে 'খান' এর মত ছড়াছড়ি না হলেও শিং-এরও বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

হিন্দু শ্রেণীবিশেষের মত মেওয়াতিরাও কাজকর্ম বন্ধ রেখে অমাবশ্যা ও কৃষ্ণপক্ষ পালন করে থাকে এবং নতুন কূপ খননের আগে হনুমানের নামে চবুতরা তৈরী করে নেয়। তবে লুটতরাজের প্রয়োজন হলে তখন আর মন্দিরভক্তি বিশেষ পাত্তা পায় না। বরং কেউ মন্দিরের পবিত্রতা বোঝাতে গেলে তারা সোজা বলে দেয়, তোমরা তো হলে 'দেও' [১] আমরা হলাম 'মেও।' পৈত্রিক ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে মেওয়াতিরা খুবই অজ্ঞ। দু' একজন কলেমা জানলেও নিয়মিত নামাযীর সংখ্যা আরো কম। নামাযের সময় ও মাসআলা মাসায়েল তো তারা একেবারেই জানে না। এ হলো ইল্লোরের অবস্থা। ইংরেজশাসিত 'গোড়গানো' জেলায় মক্তব মাদরাসার কারণে ধর্মীয় আচার-বিধান পালনের অবস্থা তুলনামুলক ভালো। ইল্লোরেও মসজিদ অধ্যুসিত অঞ্চলের অবস্থা তুলনামূলক উন্নত। কিছু মানুষ কলেমাও জানে আবার কিছু মানুষ নামাযও পড়ে। মাদরাসার প্রতিও কিঞ্চিত আগ্রহ দেখা যায়। ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছে, বিয়েশাদীর প্রাথমিক আচারপর্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিত অংশ নিলেও মূলপর্ব আঞ্জাম পায় কাজি সাহেবেরই হাতে। পুরুষরা ধুতি পরে। পাজামার চল নেই। অথচ সোনার অলংকার ব্যবহার করে থাকে। বস্তুতঃ পোশাক পরিচ্ছেদে তারা হিন্দু-অনুগামী।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন,

আচারে অভ্যাসে মেওয়াতিরা আধা হিন্দু। তাদের গ্রাম বস্তিগুলোতে মসজিদ খুব কমই দেখা যায়। 'তজারা' তহশিল অঞ্চলে মেওয়াতিদের বায়ান্নটি গ্রামে মসজিদ সংখ্যা মাত্র আটটি। তাছাড়া প্রতিবেশী হিন্দুদের মতো মেওয়াতিদেরও মন্দির ছাড়া কিছু 'উপসনাক্ষেত্র' রয়েছে, সেখানে 'বলিদান'ও হয়ে থাকে।"

১।দেব।

শবে বরাতে সৈয়দ সালার মাসউদগাজীর 'ঝাণ্ডা'ও প্রত্যেক মেওয়াতি গ্রামে পুঁজিত হয়। ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'গোড়গানো' জেলা গেজেটে বলা হয়েছে–

এখনও পর্যন্ত মেওয়াতিরা শিথিল ও উদাসীন ধরনের মুসলমান রূপেই পরিচিত হয়ে আসছে। প্রতিবেশী জাতির অধিকাংশ আচারপর্বেই তারা যোগ দিয়ে থাকে। বিশেষতঃ কিছুটা আনন্দদায়ক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলোতে। তাদের নীতি কতকটা যেন এই–উৎসব ও পর্ব পালনে আমরা উভয় ধর্মে আছি কিন্তু বিধান পালনে কোন ধর্মেই নেই। সম্প্রতি মেওয়াতে কতিপয় ধর্ম–শিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছে। ফলে কিছু কিছু নামায রোযা শুরু হয়েছে। গ্রামগুলোতে মসজিদও তৈরী হচ্ছে। মেয়েরা হিন্দুদের 'ঘাঘরা' ছেড়ে পাজামা ধরেছে। এগুলো ধর্মীয় জাগরণের আলামত।

ভরতপুর গেজেটে বলা হয়েছে, 'মেওয়াতিদের আচারবিধি হচ্ছে হিন্দু–মুসলিম আচারবিধির মিশ্ররূপ। খাতনা, বিয়েশাদী ও দাফনকাফন সবই ইসলামসম্মত। সৈয়দ সালার মাসউদ গাজীর মাযারও জেয়ারত করা হয় এবং মাসউদ গাজীর ঝাণ্ডার নীচে কৃত কসমকে অতিঅবশ্য পালনীয় মনে করা হয়। ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে গমন করলেও তারা হজ্জে যায় না কখনও। হিন্দুদের আচারপর্বের মধ্যে হোলি ও দেয়ালি উৎসব পালিত হয়। স্বগোত্রে কখনও বিয়েশাদী হয় না। পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়েরা উত্তরাধিকার পায় না। বাচ্চাদের তারা হিন্দু মুসলিম মিশ্রনাম রেখে থাকে।

মেওয়াতিরা জাতিগত ভাবেই অশিক্ষিত ও মুর্খ। চারণ কবি ও গায়কদের কদর আছে মেওয়াতিদের কাছে। বড় অংকের বিনিময়ে তাদের আনা হয়। পল্লী সমাজ ও কৃষি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু চতুষ্পদী গান রয়েছে, যা মেওয়াতিরা বেশ মজা করে গেয়ে থাকে। ভাষা কিছুটা রুক্ষ ও কর্কশ। উভয় লিংগের প্রতি অভিন্ন সম্বোধন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উত্তেজক ও মাদকদ্রব্য গ্রহণেরও অভ্যাস আছে। এরা খুবই দুর্বল বিশ্বাসী ও কুসংস্কারপ্রিয়। কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ গ্রহণের প্রবণতা অত্যধিক। পোশাক পরিচ্ছেদে বেশ হিন্দুঘেষা। এক সময় নবজাতক হত্যার নিষ্ঠুরতাও ছিলো

তাদের মাঝে। এখন অবশ্য বিলকুল নেই। লুণ্ঠন রাহাজানি ছিলো তাদের এক কালের পেশা। এখন যদিও তাদের চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি হয়েছে। তবু গবাদি পশু হাঁকিয়ে এবং গরু মহিষের রশি খুলে নিয়ে যাওয়ার বেশ দুর্নাম এখনও আছে তাদের।

এতসব ধর্মীয় অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয় সত্ত্বেও এ জনগোষ্ঠীর স্বভাব চরিত্রে অভিজাত বংশধারার কিছু উন্নত গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যে সব ত্রুটি ও নৈতিক দুর্বলতা তাদের মাঝে দেখা যায় সেগুলো মুর্খতা ও শিক্ষাহীনতা, সভ্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতার কারণে শরীফ ও বাহাদুর কওমের মাঝে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়ে থাকে; যেমন হয়েছিলো জাহেলী যুগে খোদ আরবদের বেলায়। বস্তুতঃ দুষিত পরিবেশের কারণে তাদের গুণ, প্রতিভা ও স্বভাবযোগ্যতা ভিন্নমুখী হয়ে পড়েছিলো। জাতীয় বীরত্ব ও নির্ভীকতা লুটতারাজ ও খুন খারাবীর খাতে প্রবাহিত হয়েছিলো। স্বভাবসাহসিকতা ও দুর্ধর্ষতা উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেয়ে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের পথ বেছে নিয়েছিলো। গায়রত ও জাত্যাভিমানের বৈধ ব্যবহার না হওয়ায় মনগড়া আত্মমর্যাদা ও আভিজাত্য রক্ষার নামে তা ব্যয় হচ্ছিলো। উচ্চমনোবল ও উচ্চাভিলাষ যথাযোগ্য সমাদর না পেয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত বিষয়ে আপন শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটাচ্ছিলো। মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রতা ব্যবহারের সমুচিত সুযোগের অভাবে আইন লংঘন ও অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তারা অভাবনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়ে চলেছিলো। মোটকথা, সহজাত গুণ ও স্বভাবযোগ্যতার গতিমুখ ছিলো ভুল এবং ব্যবহারক্ষেত্র ছিলো তুচ্ছ। কিন্তু জাতিগতভাবে স্বভাবযোগ্যতা ও সৃজনশীলতা থেকে বঞ্চিত ছিলো না তারা।

সরলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, শক্তিমত্তা ও কর্মদক্ষতা, দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা ছিলো এ জাতির বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে তারা নগর সভ্যতার ছায়ায় প্রতিপালিত মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বেশ আলাদা ছিলো। স্বভাবের অতুলনীয় দৃঢ়তা, অনমনীয়তা ও তীব্র স্বজাত্যবোধের ফলেই কার্যতঃ ইসলামহীনতা সত্ত্বেও চরমতম দুর্যোগের সময়ও ধর্মত্যাগের সয়লাব এ অঞ্চলে কখনই আঘাত হানতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো যেখানে ধর্মত্যাগের ব্যাপক ফিতনায়

আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলো সেখানে মেওয়াত ছিলো সম্পূর্ণ নিরাপদ। ধর্মত্যাগের তেমন কোন ঘটনাই সংঘটিত হয়নি এই সুবিস্তীর্ণ এলাকায়।

এ জাতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিস্মৃতপ্রায় অবস্থায় থাকার কারণে অজ্ঞতা ও অখ্যাতির নিরাপদ বেষ্টনীতে তারা সুরক্ষিত ছিলো। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন আরেকটি জনগোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা এত বিরাট জনসংখ্যা এবং রাজধানীর এত নিকটে অবস্থান সত্ত্বেও এতটা অখ্যাতি ও বিস্মৃতির শিকার হয়েছে। অবশ্য এর সুফল হয়েছে এই যে, তাদের চিন্তাশক্তি ও কর্মোদ্যমের অপচয় হয়েছে খুব কম। বরং সংরক্ষিত অবস্থায় রয়ে গেছে প্রায় সবটুকু। তাদের হৃদয়পট উত্তমের রেখাপাত থেকে যেমন বঞ্চিত থেকেছে তেমনি মন্দের ছায়াপাত থেকেও মুক্ত থেকেছে। অথচ হৃদয় পটের ছায়া-রেখা একবার বসে গেলে খুব কমই তা মুছে যায়। মোটকথা; মেওয়াত ছিলো এক অনাবাদ জমি যেখানে কোন ফসলের বীজ ফেলাই হয়নি। ভ্রান্ত আকীদা ও কুসংস্কার এবং অজ্ঞতাপ্রসূত রসম রেওয়াজে কিছু আগাছা শুধু কয়েক শতাব্দীর পতিত ভূমিতে গজিয়ে উঠেছিলো। বস্তুতঃ চৌদ্দশ হিজরীর ভারতবর্ষ বহু ক্ষেত্রে মেওয়াতিরা ছিলো আরব জাহেলিয়াতের কাছাকাছি নমুনা।

মেওয়াতিদের সাথে সম্পর্কের সূচনা

আগেই বলা হয়েছে যে, মেওয়াতের সাথে আসল সম্পর্ক মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল ছাহেবের জীবদ্দশাতেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আর এটা নিছক ঘটনাক্রম বা কাকতালীয় ব্যাপার ছিলো না বরং গায়বী ব্যবস্থা হিসাবেই মাওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল ছাহেবকে আল্লাহ পাক মেওয়াত অঞ্চলের প্রবেশ পথে বস্তি নিযামুদ্দীনে এনে বসিয়েছিলেন এবং মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ)-এর শুভাগমনের পূর্বেই সরলপ্রাণ মেওয়াতিদের অন্তরে এই খান্দানের প্রতি ভক্তি ভালবাসার বীজ বপন করে দেয়া হয়েছিলো। এমনকি পরবর্তীতে তাতে নিয়মিত জলসিঞ্চনের ব্যাপারেও যত্নের কোন ত্রুটি করা হয়নি। দিল্লী অধিপতিদের জগজ্জয়ী শক্তিও যাদের কাবু করতে পারেনি সেই বন্যস্বভাব মেওয়াতিদেরকে দুই প্রজন্মের ভক্তি ভালবাসার আত্মিক বন্ধন এমনভাবে আবদ্ধ

করেছিলো যে, প্রার্থিত হওয়ার পরিবর্তে প্রার্থী হয়েই তারা এসে হাজির হয়েছিলো।

মেওয়াতে মাওলানা ইসমাঈল ও মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের ভক্ত মুরীদান যখন জানতে পেলেন যে, নিযামুদ্দীনের শূন্য মসনদ নতুন করে আবাদ হয়েছে এবং মাওলানা ইসমাঈল ছাহেবের পুত্র ও মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের ভাই তাদের সুযোগ্য উত্তরসূরী রূপে তাশরীফ এনেছেন তখন তারা পুনরায় নিযামুদ্দীনে হাজির হতে শুরু করলো এবং হযরত মাওলানার খিদমতে প্রাচীন সম্পর্কের কথা স্মরণ করে মেওয়াতে তাশরীফ নেয়ার আকুল আবেদন জানিয়ে বললো, আপনার খান্দানের প্রতি কৃতার্থ মানুষগুলোকে সুযোগ দিন; যেন তারা আপন বুজুর্গানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে পারে এবং ভক্তি ভালবাসার পুরনো সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

মূল চিকিৎসা হলো দ্বীনি তালীম

হযরত মাওলানার দৃষ্টিতে মেওয়াতের ইছলাহ ও সংশোধনের একমাত্র উপায় ছিলো ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসার, শরীয়তের প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষাদান এবং দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও অপরিচয়-ভীতি দূরীকরণ।

ইতিপূর্বে তাঁর আব্বা ও বড় ভাইও ইছলাহ ও সংশোধনের একই তরীকা ও পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। মেওয়াতি ছেলেদেরকে তাঁরা মাদরাসায় নিজেদের কাছে রেখে শিক্ষা-দীক্ষাদানপূর্বক ইছলাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে মেওয়াতে পাঠিয়ে দিতেন। বস্তুতঃ এ অঞ্চলে দ্বীনের যে ক্ষীণ আলোক রেখা এবং ধার্মিকতার যে হালকা পরশ অনুভূত হচ্ছিলো তা ঐ বুজুর্গদ্বয়ের মাদরাসায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভকারী লোকদের ইখলাছপূর্ণ মেহনতেরই ফসল ছিলো।

এ ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা মারহুম আরো এক কদম অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করলেন। অর্থাৎ দ্বীনী প্রভাব সম্প্রসারণ এবং ব্যাপক পর্যায়ের সংশোধন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে খোদ মেওয়াত অঞ্চলেই দ্বীনী মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

মেওয়াত সফরের শর্ত

ভক্ত মুরীদানের হালকায় শায়খ বা তাঁর গদিনশীনের 'শুভাগমন'—এর কি অর্থ হযরত মাওলানা তা ভাল করেই জানতেন এবং কোন্ কোন্ পন্থায় শায়খের প্রতি তারা আপন ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং সেটাকেই যথেষ্ট মনে করে তাও তাঁর অজানা ছিলো না। কিন্তু তিনি এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না যে, সেখানে গিয়ে শুধু ভক্ত মুরীদানের আন্তরিক 'সেবা' গ্রহণ করবেন এবং 'দোয়া খায়র' করে 'শূন্যহাতে' ফেরত চলে আসবেন। সেখানে তিনি শুধু এ শর্তেই যেতে রাজি ছিলেন যে, তাঁর সফর এলাকার দ্বীনী পরিবর্তনের এবং ইসলামের সাথে নিবিড় সম্পর্ক সাধনের স্থায়ী পথ তৈরী করবে। এ মহান লক্ষ্য অর্জনের উপায় ও পন্থা হিসাবে তাঁর চিন্তায় তখন একটা বিষয়ই ছিলো। অর্থাৎ মেওয়াতের বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনী মক্তব মাদরাসা কায়েম করা এবং অন্ততঃ নতুন প্রজন্মকে দ্বীন ও শরীয়তের সাথে পরিচিত করে তোলা।

তিনি নিজে বর্ণনা করেন, প্রথমবার যখন কতিপয় মুহিব্বীন [১] খুব আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে আমাকে মেওয়াত সফরের অনুরোধ জানালো তখন আমি বললাম, 'এলাকায় তোমরা মক্তব কায়েম করবে' এ শর্তেই শুধু আমি যেতেপারি।

মক্তব কায়েম করা মেওয়াতিদের জন্য তখন এমন 'অসাধ্য' কাজ ছিলো যে, এর চেয়ে কঠিন কোন শর্ত তারা কল্পনাই করতে পারতো না। সবচে' বড় সমস্যা ছিলো 'রোজগারি' থেকে সরিয়ে বাচ্চাদেরকে পড়ায় এনে বসানো। তাই শর্ত শোনা মাত্র দাওয়াতকারীরা একবারেই দমে গেলো। তাদের আগ্রহে দারুণ ভাটা পড়লো এবং চেহারায় পূর্ণ নৈরাশ্য ফুটে উঠলো। ওরাও শর্ত স্বীকার করলো না; মাওলানাও দাওয়াত কবুল করলেন না। দু' তিনবার এমনই হলো। একবার এক 'সমঝদার' মেওয়াতি এই ভেবে মাওলানার শর্ত মেনে নিলো যে, আগে মাওলানাকে মেওয়াতে নেয়া তো হোক, তারপর দেখা যাবে।

১। মুহব্বত পোষণকারীগণ

মক্তবের গোড়াপত্তন

হযরত মাওলানা মেওয়াতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং যথারীতি শর্ত পূরণের দাবী জানালেন। তাঁর জোরদার তাগাদা ও পীড়াপীড়ি এবং কিছু লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে একটি মকতব কায়েম হলো। এভাবে খোদ মেওয়াত অঞ্চলে মক্তবের সিলসিলা শুরু হয়ে গেলো।

মেওয়াতিদেরকে মাওলানা বলতেন, তোমরা মকতবে ছেলে দাও। শিক্ষকদের অযিফা (বেতন [১]) আমি জোগাড় করবো। প্রধানতঃ কৃষিজীবী মেওয়াতিরা এটা কিছুতেই মানতে রাজি ছিলো না যে, তাদের বাচ্চারা খেতখামার ও গরু মহিষের যত্ন ছেড়ে কিতাবের যত্নে লেগে যাবে। দ্বীনের খাতিরে সামান্য কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করবে এমন দ্বীনী তলব বা কদর তো তাদের মধ্যে ছিলো না। তাই খুব হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে এবং মনোরঞ্জন ও খোশামুদির মাধ্যমে তাদেরকে মকতবের ব্যাপারে রাজী করাতে হলো এবং অনেক বলে কয়ে অনুরোধ উপরোধ করে মেওয়াতি বাচ্চাদেরকে পড়ায় বসানো হলো।

এই প্রথম সফরে মোট দশটি মক্তব কায়েম হলো। কোন কোন দিন কয়েকটি করেও মক্তব বিসমিল্লাহ হয়েছে। এরপর বিপুল সংখ্যায় মক্তব কায়েম হতে লাগলো এবং অল্প দিনেই তা কয়েকশত ছাড়িয়ে গেলো। এই মক্তবগুলোতে কোরআন ও অন্যান্য দ্বীনী বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো।

মকতবের ব্যয় নির্বাহ

দ্বীনী খিদমতকে মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) 'জাতীয়' কাজ হিসাবে শুরু করেননি। বরং নিজস্ব কাজ মনে করে শুরু করেছিলেন। ফলে কাজের যিম্মাদারী ও ব্যয়ভার 'জাতির' কাঁধে না চাপিয়ে নিজের কাঁধেই গ্রহণ

১। দ্বীনী কাজে আবদ্ধ থাকার কারণে জীবিকার বিকল্প হিসাবে যে অর্থ গ্রহণ করা হয় সেটাকে বেতন বলা অন্যায়, কেননা এটা পারিশ্রমিক বা বিনিময় নয় এবং দ্বীনী কাজও চাকুরী নয় বরং খিদমত। তাই ইমাম, মুআযিযন ও মুআল্লেমদের ক্ষেত্রে শব্দটি পরিহার করা দ্বীনদার মুসলমানদের কর্তব্য। — অনুবাদক

করেছিলেন। তাই নিজের আর দশটা কাজের মতো দ্বীনী কাজে জানমাল সর্বস্ব খরচ করতে তার কোন দ্বিধা ছিলো না। দ্বীনী কাজের হাকীকত তাঁর কাছে এই ছিলো যে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজের মতো এ কাজেও মানুষ নিজের মূল্যবান সময় ও প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে। এটা নিজস্ব কাজ, আর সেটা জাতীয় কাজ—এই বিভাজন তিনি সমর্থন করতেন না। এক ভক্তের পক্ষ হতে কিছু টাকা একবার এই বলে পেশ করা হলো যে, এটা একবারে নিজের কাজে ব্যয় করবেন। তিনি বললেন, ভাই! আল্লাহর কাজ যদি নিজের কাজ না হয় তাহলে আমরাই বা আমাদের হলাম কিভাবে! এরপর তিনি ভেজা চোখে, ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, আফসোস! আমরা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কদর করলাম না।

মোটকথা এটাই ছিলো মাওলানার জীবনের কর্মনীতি। মেওয়াতের দ্বীনীকাজে সর্বপ্রথম তিনি নিজের অর্থ সম্পর্দ (যা পৈত্রিক সম্পত্তির আমদানী কিংবা হাদিয়া আকারে আসতো) ব্যয় করেছেন। তারপর অন্যান্যদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মেওয়াতে ঈমানী ও দ্বীনী মেহনতের ব্যাপক আন্দোলন

মক্তবভিত্তিক আংশিক সংশোধন প্রয়াসে নৈরাশ্য

উচ্চ মনোবল ও বুলন্দ হিম্মত হলো মাওলানার এমন অনন্য জীবন—বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে দ্বীনী খিদমতের উচ্চাসনে সমাসীন করেছে। এ জীবন—বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইছলাহ ও সংশোধন প্রয়াসের কোন প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর অস্থির চিত্ত ও ব্যাকুল স্বভাব শান্ত ও তৃপ্ত হতে পারেনি। বরং মেহনতের পর মেহনত করে চলেছেন। যতক্ষণ না তিনি মঞ্জিলে মকসূদ খুঁজে পেয়েছেন ততক্ষণ কোথাও স্থির হয়ে বসেননি এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেননি।

মক্তব শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইছলাহ ও সংশোধনের যে ন্যূনতম প্রয়াস চলছিলো সে ব্যাপারে হযরত মাওলানা ধীরে ধীরে নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি অনুভব করলেন যে, দেশের ধর্মহীন পরিবেশ এবং মুর্খতা ও গোমরাহীর সর্বগ্রাসী অন্ধকার মক্তবগুলোকেও প্রভাবিত করছে। একে তো ছাত্রদের পূর্ণ ইছলাহ ও দ্বীনী তারবিয়াত সম্ভব হয়ে উঠে না। তদুপরি সামান্য পরিমাণ দ্বীনী শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে যারা মক্তব থেকে বের হয় তারাও মুর্খতা ও ধর্মহীনতার অথৈ সমুদ্রে এমনভাবে ডুবে যায় যে, তাদের অস্তিত্বও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

এদিকে সমাজ ও মানুষের অবস্থা এই যে, তাদের মাঝে দ্বীনের তলব বা চাহিদা নেই যাতে বাচ্চাদের মকতবে পাঠাতে তারা আগ্রহী হতে পারে।[১] তদ্রূপ

১। কিছুদিন পর মাওলানা তাঁর এক পত্রে এ সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা মোটামুটি এভাবে তুলে ধরা যায়। "যে পর্যায়ের দ্বীনী জযবা দ্বারা মক্তব মাদরাসা চলতে পারে তা এখনো বহুদূরে। এখনো একটা দীর্ঘ সময় শুধু তাবলীগী

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

ইলমেরও কোন কদর নেই যাতে তাদের অন্তরে আলিমে দ্বীনের ইযযত এবং তাদের কথার গুরুত্ব থাকবে। এমতাবস্থায় মক্‌তবশিক্ষা সমাজ জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব রাখতে পারে না।

তৃতীয়তঃ এ সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যাদের উপর এখনো শরীয়তের পাবন্দী নেই। পক্ষান্তরে প্রাপ্তবয়স্কতার কারণে যারা প্রত্যক্ষভাবে শরীয়তের আজ্ঞাধীন অথচ দ্বীনী ইলমশূন্যতা ও আমলহীনতার কারণে আল্লাহর আযাব গযবের পাত্র হয়ে চলেছে তাদের জন্য এখানে কোন ব্যবস্থা নেই।

তাছাড়া মকতব মাদরাসাগুলোর সংখ্যা যতই হোক গোটা জাতির দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের প্রয়োজন এর মাধ্যমে পূরণ হতে পারে না। কেননা নিজস্ব জীবন ও জীবীকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মকতব মাদরাসার নিয়মিত ছাত্র হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

এ সময়েই এক সফরে মকতব পড়া এক মেওয়াতি যুবককে উচ্চ প্রশংসাসহ মাওলানার খিদমতে পেশ করা হলো। মাওলানা বলতেন যে, যুবকটি ছিলো দাঁড়ি চাঁছা। চেহারা ছুরতেও কোন রকম ইসলামী ছাপ্‌ ছিলো না। এ দুঃখজনক অবস্থা দেখে মাওলানার আত্মমর্যাদাবোধ ও সংবেদনশীল হৃদয় আঘাত পেলো এবং বর্তমান কর্মধারার প্রতি মাওলানার নৈরাশ্য আরো বেড়ে গেলো। তিনি ভাবলেন, মক্‌তব আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করা ঝিনুক দ্বারা নদী সিঞ্চনেরই সমার্থক।

বিভিন্ন সফরকালে মক্‌তব কায়েমের পাশাপাশি মাওলানা বহুদিনের পুরোনো ঝগড়া বিবাদ মিটমাট করে দিতেন; যা মেওয়াতের সমাজজীবনে

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

কাজে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে অবিচলভাবে উন্নতি অর্জনে সচেষ্ট থাকুন। যখন একটা সাধারণ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং সমাজ জীবনে ইসলামপ্রীতি কিছুটা উন্নতি লাভ করতে থাকবে তখন আল্লাহ চাহে তো সামান্য মেহনতেই অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

জোরদারভাবে বিদ্যমান ছিলো। বিবাদমান দুই পক্ষের মাঝে তিনি সমঝোতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করতেন। এভাবে তিনি তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, পরিস্থিতিজ্ঞান ও আত্মিক শক্তিবলে যুগযুগের বিবাদমান প্রতিপক্ষগুলোর মাঝেও সমঝোতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভূত সফলতা অর্জন করেছিলেন। মেওয়াতের লোকেরা বলতো; দেখতে তো অস্থিচর্মসার এক মানুষ। কিন্তু যে কাজেই হাত দেন মুহূর্তে সমাধা করে ছাড়েন। জানি না কি রহস্য! চরম একরোখা মানুষও তাঁর কথায় মোমের মতো গলে যায়।

ঐ একই সময়ে আরো কতিপয় ওলামায়ে কেরাম মেওয়াতে ইছলাহী ওয়াজ[১] শুরু করেছিলেন এবং সর্বভারতীয় 'ওলামায়ে হক'-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ, বেদআত ও কুসংস্কার নির্মূল এবং আহকামে দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেইসূত্রে মেওয়াতে তাঁরা বিশেষ কিছু রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধেও আন্দোলনে নেমেছিলেন।

কিন্তু মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) অনুভব করছিলেন যে, দ্বীনের অবস্থা এখন এক অরক্ষিত মেষপালের মত। রাখাল একদিক সামাল দিলে অন্যদিকে কিছু মেষ খোয়া যায়। অন্য দিক সামাল দিলে তৃতীয় একদিক অরক্ষিত হয়ে পড়ে। একটি খারাবি সংশোধনের পর দশটি খারাবী মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। কেননা জীবনের চাকা সরল রেখা থেকে সরে গিয়েছিলো। সে সরল রেখা হলো দ্বীনী জযবা ও ঈমানী তলব যা কয়েক শতাব্দী আগেই মানুষের হৃদয় থেকে বিদায় হয়েছে।

বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, ব্যক্তিবিশেষের সংশোধন ও দ্বীনী তরক্কী দ্বারা উম্মতের রোগ নিরাময় হতে পারে না। জনৈক মেওয়াতি হযরত মাওলানার এ অনুভূতিকে তার সাদামাটা ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "সাধারণ মানুষের জীবনে দ্বীন না আসলে কিছুই হতে পারে না।

এর পরেও বেশ কিছুকাল মেওয়াতে তাঁর আসা যাওয়া অব্যাহত ছিলো এবং সেখানে তাঁর মাধ্যমে দ্বীনী ও রূহানী ফয়য জারী ছিলো। মানুষও দলে

১। চরিত্র ও আকীদা সংশোধনমূলক ওয়াজ।

দলে তাঁর সিলসিলাভুক্ত হয়ে চলেছিলো। অবশেষে চৌচল্লিশ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে মাওলানা ও তাঁর ভক্ত অনুরাগীদের সাগ্রহ অনুরোধে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) ওলামায়ে কেরামের এক কাফেলাসহ মেওয়াতে তাশরীফ আনয়ন করলেন। কথিত আছে যে, ফিরোযপুর নামক এলাকায় তাঁর অবস্থান স্থলে দর্শনসৌভাগ্য লাভের প্রত্যাশী এক জনসমুদ্রের সমাগম হয়েছিলো এবং বিপুল সংখ্যক লোক হযরত মাওলানার হাতে বাই'আত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হজ্জ এবং কাজের ধারা পরিবর্তন

চৌচল্লিশ হিজরীর শাওয়াল মাসে মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) হযরত মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেবের সংগে হজ্জ সফরে রওয়ানা হলেন। পথে হায়দারাবাদে এক সপ্তাহের যাত্রা বিরতি হয়েছিলো। কেননা হায়দারাবাদী ভক্তবৃন্দ মাওলানা সাহারানপুরীকে কিছুদিন তাদের মেহমান হওয়ার জোর আবেদনজানিয়েছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারার অবস্থান শেষে সফরসংগীদের যখন যাত্রা প্রস্তুতি চলছে তখন মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)–এর মাঝে এক অভূতপূর্ব ভাবব্যাকুলতা দেখা দিলো। কোন ভাবেই তিনি মদীনা মুনাওয়ারার বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারছিলেন না। কিছুদিন অপেক্ষার পর সফরসংগীরা মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)–কে বিষয়টি জানালেন। তিনি মাওলানার অবস্থা দেখে তাদেরকে বললেন, তোমরা পীড়াপীড়ি করো না। এখন তিনি এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবে আচ্ছন্ন। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। কিংবা নিজেরা চলে যাও; ইনি পরে আসবেন। সফরসংগীরা তখন থেকেই গেলেন।

মাওলানা বলতেন, মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে আমি এ কাজে আদিষ্ট হলাম। আমাকে বলা হলো; আমি তোমার দ্বারা কাজ নেবো। কিছুদিন আমার দিন রাত এ অস্থিরতায় কাটলো যে, আমার মতো দুর্বল অক্ষম কি কাজ করতে পারে? মারেফাতপ্রাপ্ত জনৈক বুজুর্গ ঘটনা শুনে অভয় দিয়ে বললেন, চিন্তার কি আছে! কাজ করার কথা তো বলা হয়নি; কাজ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যিনি কাজ নেয়ার তিনি কাজ নিয়ে নিবেন।

এ অভয় বাণীতে মন বেশ আশ্বস্ত হলো এবং তিনি মদীনা মুনাওয়ারা হতে রওয়ানা হলেন এবং হারামাইন শরীফে মোট পাঁচ মাসের অবস্থান শেষে পয়তাল্লিশ হিজরীর ১৩ রবিউসসানী তারিখে কান্ধলায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাবলীগী গাশতের শুরু

হজ্জ থেকে ফিরে এসে মাওলানা নিজেও তাবলীগী গাশত শুরু করলেন, অন্যদেরকেও জনসাধারণের মাঝে বের হয়ে দ্বীনের প্রধানতম আরকান ও মৌলিকতম বিষয় তথা কালিমা নামাযের তাবলীগ করার দাওয়াত দিলেন। মানুষের কাছে এ দাওয়াতি ডাক ছিলো একেবারেই অপরিচিত। দ্বীনের তাবলীগের জন্য সাধারণ মানুষের মুখ খোলা পাহাড়–পর্বত মনে হচ্ছিলো। কিছু মানুষ তারপরও বড় লজ্জা সংকোচ ও দ্বিধা জড়তার সাথে এ খিদমত আঞ্জাম দিলো।

নূহ অঞ্চলে একবার ইজতিমা হলো। সেখানে তিনি তাবলীগী জামা'আত বানিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বের হওয়ার দাওয়াত দিলেন। উপস্থিত লোকেরা এক মাসের সময় প্রার্থনা করলো। একমাস পরে জামা'আত তৈরী হয়ে গেলো। প্রথম আট দিন কোন্ কোন্ গ্রামে কাজ হবে তা নির্ধারণপূর্বক সিদ্ধান্ত হলো যে, জামা'আত গ্রামে গ্রামে কাজ শেষ করে আগামী জুমা (গৌড়গানো জেলার) সোহনাতে পড়বে। সেখানেই পরবর্তী সপ্তাহের কার্যসূচী নির্ধারণ করা হবে।

কথামতে প্রথম জুমা সোহনাতে পড়া হলো। মাওলানাও সেখানে তাশরীফ নিলেন। আগামী সপ্তাহের কর্মসূচী ঠিক করে জামা'আত আবার বের হলো এবং দ্বিতীয় জুমা তাওড়োতে এবং তৃতীয় জুমা ফিরোজপুর তহশীলের নাগীনাতে পড়া হলো। মাওলানা প্রতি জুমায় শরীক হলেন এবং পরবর্তী কর্মসূচী তৈরী করে দিলেন।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত মেওয়াতে এই পদ্ধতিতেই কাজ হতে থাকলো এবং বিভিন্ন দ্বীনী মারকায ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের বিশিষ্ট লোকদেরকে মেওয়াতের তাবলীগী ইজতিমায় দাওয়াত দিয়ে আনা হতে লাগলো। কয়েক বছর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকলো।

তৃতীয় হজ্জ

একান্ন হিজরীতে হযরত মাওলানা তৃতীয়বারের মত হজ্জে গেলেন। নিযামুদ্দীনে রমজানের চাঁদ দেখে দিল্লী ষ্টেশনে তারাবীহ পড়া হলো। এরপর তিনি করাচীর উদ্দেশ্যে ট্রেনে আরোহণ করলেন। এবার মাওলানা ইহতিশামুল হাসান তাঁর সফরসংগী ছিলেন। শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের নামে লেখা এক চিঠিতে তিনি হযরত মাওলানার কর্মব্যস্ততা ও সময়সূচী সম্পর্কে লিখেছেন–

তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে হারাম শরীফে। তাবলীগী জলসা ও তাবলীগী আলোচনা বরাবর চলতে থাকে এবং সবখানে হযরতজী এ সম্পর্কে কিছু না কিছু অবশ্যই বলে থাকেন।

মক্কা শরীফ হতে রওয়ানা হয়ে ৫২ হিজরীর ৬ই মুহররম মুতাবিক ৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তিনি মদীনা শরীফে হাজির হলেন এবং যিয়ারত সৌভাগ্য লাভ করলেন। মদীনা শরীফে দীর্ঘ অবস্থান শেষে দোসরা জুমাদাল–উলা তারিখে হিন্দুস্তানে ফিরে আসা হলো।

এই মুবারক হজ্জ সফরে তিনি নিজের কাজ ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অধিকতর আস্থা ও আশ্বস্তি এবং বোধ ও উপলব্ধি অর্জন করে এসেছিলেন। তাই কাজের গতি ও পরিধি বহু বাড়িয়ে দিলেন।

মেওয়াত সফর

হজ্জ সফর থেকে ফিরে এসে হযরত মাওলানা এক বড় জামা'আত সহ মেওয়াতে দু'বার সফর করলেন। এ সফরে কমপক্ষে একশজন লোক তাঁর সার্বক্ষণিক সংগী হিসাবে থাকতো। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে অনেক বড় মজমা হয়ে যেতো। প্রথম সফর ছিলো মাসব্যাপী, আর দ্বিতীয় সফর ছিলো কিছু কম এক মাস। উভয় সফরকালেই তৈরী জামা'আতগুলোকে তিনি বিভিন্ন গ্রামে ভাগ করে এই বলে পাঠিয়ে দিতেন যে, মানুষের মাঝে ভালোভাবে গাশতের মেহনত করে ফিরে এসো।

দ্বীনী মারকাযগুলোর উদ্দেশ্যে জামা'আত প্রেরণ

মাওলানা তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরিচিত পরিবেশ ও অভ্যস্ত কাজকর্মের বেষ্টনে থেকে এই গরীব মেওয়াতি কৃষকদের পক্ষে দ্বীন শেখার সময় বের করা বেশ কষ্টকর। তাছাড়া এই সংক্ষিপ্ত সময়েও পূর্ণ একাগ্রতা ও আত্মনিবিষ্টতা তাদের ভাগ্যে জুটে না। ফলে দ্বীন ও ঈমানের যে প্রভাব মানুষের জীবনে আমূল সংশোধন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে তা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যদিকে তাদের কাছে এ দাবী করাও যুক্তিযুক্ত নয় যে, এই বুড়ো বয়সে দলে দলে তারা মকতব মাদরাসার ছাত্র হয়ে দ্বীন শিখতে শুরু করবে। এমনকি এ প্রত্যাশা করাও ভুল হবে যে, শুধু ওয়ায নছীহত ও আদেশ–উপদেশ দ্বারাই তাদের যিন্দেগীতে ইন্‌কিলাব এসে যাবে এবং বিদ্যমান জাহেলী সমাজ থেকে বের হয়ে তারা ইসলামী সমাজের পথে অভিযাত্রা শুরু করবে। তাদের আচার অভ্যাস, স্বভাব মেযাজ ও আবেগ ইচ্ছা সব বদলে যাবে।

কিন্তু মাওলানা ভাবতেন, জীবন ও সমাজের এ পরিবর্তন হতেই হবে। প্রশ্ন শুধু এই যে, তার উপায় ও পদ্ধতি কি হতে পারে? তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, জাহেলী জীবন ও সমাজের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ মানুষের দ্বীন হাছিলের একমাত্র উপায় হলো তাদেরকে জামা'আত আকারে ইলমী ও দ্বীনী মারকাযগুলোতে গিয়ে কিছু সময় কাটানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সেখানে গিয়ে তারা এলাকার মুর্খ সাধারণ লোকদের মাঝে কালিমা নামাযের তাবলীগ করবে। এভাবে তাদের নিজেদের শেখা জিনিস দৃঢ়মূল হবে। এছাড়া সেখানকার ওলামা–মাশায়েখদের মজলিসে হাজির হয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁদের কথা শুনবে। তাদের আমল আখলাক, আচার আচরণ ও জীবন যাপন পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। শিশু যেভাবে মায়ের মুখ থেকে ভাষা শিক্ষা করে এবং মানুষ যেভাবে পরিবেশ থেকে কৃষ্টি ও সভ্যতা এবং আদব কায়দা ও শিষ্টাচার গ্রহণ করে তেমনি সম্পূর্ণ স্বভাবসম্মত পথে তারাও দ্বীন শিক্ষা করবে। ইলম হাছিলে করবে এবং ইসলামী যিন্দেগী গড়ে তোলবে।

তাছাড়া (আল্লাহর রাস্তায়) বের হওয়ার এ সময়কালে–যার চেয়ে অধিক

একাগ্রতা ও আত্মনিবিষ্টতার সুযোগ পাওয়া দৃশ্যতঃ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়–কোরআন শেখার, মাসায়েল ও ফাযায়েল জানার এবং ছাহাবা কেরামের হালাত ও ঘটনাবলী শোনার বড় অবকাশ তারা লাভ করবে। এভাবে এই ভ্রাম্যমান ও চলতা ফেরতা মাদরাসা থেকে অনেক কিছু শিখে, অনেক কিছু অর্জন করে নতুন আবেগ ও জযবা এবং নতুন আখলাক ও চরিত্রের এক নতুন মানুষ হয়ে তারা ঘরে ফিরে আসবে।

কিন্তু বলতে খুব সহজ ও সাদামাটা হলেও বাস্তবতঃ এটা ছিলো অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ এক কাজ। দু'একটি ব্যতিক্রম থাকলে সেটা বাদ দিয়ে নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, তরীকত ও আধ্যাত্মিক সাধনার কোন শায়খ তাঁর অনুগামী ও ভক্ত মুরীদদের কাঁধে এমন গুরুভার মুজাহাদা খুব কমই হয়ত চাপিয়ে থাকবেন। জীবন ও জীবীকার কর্মকোলাহল থেকে, পরিবার পরিজনের সহজাত আকর্ষণ থেকে এবং পরিচিত পরিবেশ ও বাড়ীঘরের আরাম আয়েশ থেকে মানুষকে বের করে আনা খুব সহজ কাজ নয়। তাও এমন এক জনগোষ্ঠীতে যাদের সাথে বহু মেহনত মোজাহাদার পর দ্বীনের সামান্য পরিচয় গড়ে উঠেছে মাত্র।

আরেকটি সমস্যাও ছিলো। অর্থাৎ এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা ছিলো না যে, এই দ্বীন পিপাসু লোকগুলো যেখানে যাবে সেখানে কি তারা সহানুভূতিমূলক আচরণ পাবে? তাদের অজ্ঞতা ও সরলতাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নাগরিক রুচিবোধের মাপকাঠিতে তাদের অশিষ্টতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে; না কি বিরক্তি প্রকাশ ও কটাক্ষ উপহাস দ্বারা তাদের মন ভাংগা হবে?

মাওলানা ভাবতেন, ইউ, পি'র পশ্চিমাঞ্চল তথা মুযাফ্ফরনগর ও সাহারানপুর হলো দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের লালনক্ষেত্র এবং হক্কানী ওলামা মাশায়েখদের প্রাণকেন্দ্র। সুতরাং সংস্পর্শ ও মেলামেশা এবং দেখা ও শোনার মাধ্যমে দ্বীন হাছিল করার জন্য এর চেয়ে উপযোগী ও অনুকূল এলাকা আর হতে পারে না।

মাওলানার মতে দেশব্যাপী অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা, দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা

ও মমত্বহীনতা এবং জযবা ও আবেগ অনুভূতির অধঃপতনই হলো সকল ফেতনার গোড়া এবং সর্ব অনিষ্টের মূল। আর এ মহাব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা হলো আত্মসংশোধন ও দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য মেওয়াতিদের ঘর ছেড়ে বের হওয়া এবং দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়া এবং দ্বীনের খাতিরে মেহনত মোজাহাদা ও কোরবানীর শক্তি ও স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বিশেষতঃ ইউ, পি'র বিভিন্ন শহরে সময় লাগানো। এভাবেই তাদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসতে পারে।

জনৈক মেওয়াতিকে হযরত মাওলানা লিখেছেন, 'শোন আমার দোস্ত! অজ্ঞতা ও মুর্খতা, গাফলত ও উদাসীনতা এবং সত্যের পথে চেষ্টায় ত্রুটি অলসতাই হলো সকল ফেতনার চাবি। স্বভাব ও মনোভাবের এই অকল্যাণমূলক ও আবিলতাপূর্ণ অবস্থার উপর যদি তোমরা বহাল থাকো তাহলে আল্লাহ জানেন, কত কিসিমের ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে তোমরা দেখবে। অথচ তখন কিছুই করার থাকবে না। অংকুরিত ফেতনা নির্মূল এবং অনাগত ফেতনার সম্ভাবনা বিলুপ্ত করতে হলে তোমাদের এলাকায় গৃহীত 'স্কিম' [১] অনুশীলন করার জন্য ইউ, পি সফরের উপর জোর দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন চিকিৎসা নেই। [২]

মাওলানার এ প্রত্যাশাও ছিলো যে, এভাবে তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলন অত্র এলাকার হক্কানী ওলামা মাশায়েখদের তত্ত্বাবধান ও ছত্রচ্ছায়া লাভ করবে। তদুপরি তাঁরা মেওয়াতের দূর অঞ্চলে পড়ে থাকা বেচারা মুসলমানদের অধঃপতন ও দুরবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। তখন হয়ত বা তাঁদের অন্তরে ব্যথা জাগবে এবং তাঁদের স্নেহদৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হবে। মাওলানার মতে এমন একটি গণ দ্বীনী আন্দোলনের সুরক্ষার জন্য ওলামা মাশায়েখের সংশ্লিষ্টতা ও পৃষ্ঠপোষকতা খুবই জরুরী ছিলো। কেননা ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানহীন এ আন্দোলনকে তিনি খতরনাক ও বিপজ্জনক মনে করতেন।

সম্ভবতঃ এ সকল কল্যাণকর দিক বিবেচনা করেই প্রথম জামা'আতের

১। শব্দটি হযরত মাওলানার নিজস্ব ব্যবহার–অনুবাদক
২। মিয়াঁজী মুহম্মদ ঈসা ছাহেবের নামে পত্র।

সফরের জন্য হযরত মাওলানা তাঁর জন্মভূমি কান্ধলাকে নির্বাচন করেছিলেন। কেননা শত হলেও এটা তাঁর প্রিয় জন্মভূমি। এখানে আছে রক্তের বন্ধন ও আত্মীয়তার সহানুভূতি। তাছাড়া দ্বীনী ও ইলমী কেন্দ্র রূপেও কান্ধলা স্বীকৃত স্থান। সুতরাং সফরের মূল উদ্দেশ্যও এখানে হাছিল হবে।

কান্ধলার উদ্দেশ্যে প্রথম জামা'আত

এক রামযানে মাওলানা তাঁর ভক্ত অনুসারীদের বললেন, কান্ধলায় সফরের উদ্দেশ্যে জামা'আত তৈয়ার কর। কথাটা যারাই শুনলো হতবাক হলো। কেননা ওলামা মাশায়েখের কেন্দ্র এবং আপন শায়খ ও মুরশিদের দেশ কান্ধলায় তাবলীগের কাজে মুর্খ– জাহিল মেওয়াতি কৃষকদের 'জামা'আত' প্রেরণ বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত ও কঠিন পদক্ষেপ মনে হচ্ছিলো। আর যেহেতু এই ভুল ধারণা বিদ্যমান ছিলো যে, তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো অন্যদের সংশোধন করা সেহেতু বিষয়টি আরো প্রশ্নবোধক হয়ে দেখা দিচ্ছিলো। মাওলানার চিন্তাধারার সর্বদিকের উপর যেহেতু মানুষের দৃষ্টি ছিলো না। (এখনো যুগপৎ এ কাজের সর্বদিক উচ্চস্তরের অন্তর্দর্শীদেরও সামনে থাকে না) সেহেতু লোকজন আদেশ পালনে তেমন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সাড়া দিল না। হাজী আব্দুর রহমান ছাহেবের মতো নিবেদিত প্রাণ ও মুখলিছ মানুষও বলে ফেললেন, আমি তো যেতে পারবো না। কেননা কান্ধলা আমার উস্তাদ মাওলানা মুহম্মদ ছাহেবের এলাকা।

কিন্তু হযরত মাওলানা কোন চিন্তাশীল কথা হালকাভাবে ও মনরক্ষার সুরে বলতেন না, যা 'বাত কি বাত' বলে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনে তিনি আপন ব্যক্তিত্বের পূর্ণভার ও ধার প্রয়োগ করতেন এবং সবটুকু প্রভাবশক্তি কাজে লাগাতেন। যে কাজ তিনি জরুরী মনে করতেন সে কাজের আয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ আশ্বস্ত না হয়ে পানাহার ও ঘুম–আরাম কল্পনা করাও তাঁর জন্য কষ্টকর ছিলো। এ ছিলো তাঁর সারা জীবনের নীতি ও অভ্যাস। এ কারণে তাঁর কোন কথা এড়িয়ে যাওয়া তাঁর সম্পর্কের লোকদের পক্ষে সহজ ছিলো না।

সুতরাং হাফেয মকবুল হাসান ছাহেবের জিম্মাদারিতে দশজনের এক

জামা'আত কান্ধলায় সফরের উদ্দেশ্যে তৈয়ার হয়ে গেলো এবং ঈদের নামাযের পর পর দিল্লী থেকে রওয়ানা হলো। এই জামা'আতে শুধু নির্বাচিত লোকেরাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রায় সকলেই রমযানে ইতিকাফ করেছিলেন। জামা'আতের প্রতি যিকিরের ইহতিমাম করার বিশেষ তাকীদ ছিলো। কান্ধলার লোকেরা পূর্ণ ইকরাম ও আন্তরিকতার সাথে জামা'আতকে গ্রহণ করলো এবং উম্মী বি–এর ঘরে তাদের থাকার ইন্তিজাম করা হলো। খাতির যত্নেরও কোন ত্রুটি হলো না।

রায়পুরের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় জামা'আত

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত রায়পুরের উদ্দেশ্যে জামা'আত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং শাওয়াল মাসেই দশ এগার জনের জামা'আত সাথে নিয়ে গেলেন।

দ্বীনী ও রূহানী কেন্দ্র হিসাবে রায়পুরও অনুকূল স্থান ছিলো। তাছাড়া (শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)–এর স্থলাভিষিক্ত খলিফা) মাওলানা আব্দুল কাদির ছাহেবের সাথে চিন্তাগত ঐক্য ও অন্তরংগতার কারণে সেখানেও কোন অপরিচয় ও দূরুত্ববোধ ছিলো না।

(জামা'আতভুক্ত) নম্বরদার মেহরাবখান নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। মাওলানা তাকে বললেন, "আজ নয়; কাল চলে এসো।" রাত্রে তিনি তার সুস্থতার জন্য দু'আ করলেন। আর তিনিও সুস্থ হয়ে যথাসময়ে রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এদিকে ক্বারী দাউদ ছাহেবের বাচ্চা মারা গিয়েছিলো। কিন্তু তিনি দাফনের পর ঘরে না ফিরে সোজা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

মেওয়াতের পূর্ণাংগ সফর

মাওলানা বৃহত্তর গৌড়গানো জেলাসহ মেওয়াতের সকল তাহশীলের মানচিত্র প্রস্তুত করালেন এবং তাতে দিক ও যোগাযোগ পথ চিহ্নিত করলেন। সকল মুবাল্লিগকে তিনি বিশেষভাবে নিম্নোক্ত হিদায়াত দিলেন।

নিজেদের কার্যক্রম ও কারগুজারি লিপিবদ্ধ করা। গ্রামের আবাদী ও জনসংখ্যা, গ্রাম থেকে গ্রামের দূরত্ব, আশপাশের বড় বড় গ্রাম ও গ্রামের নম্বরদার ইত্যাদি যাবতীয় বিবরণ নথিভুক্ত করা এবং কোন গ্রামে সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাসিন্দা কারা তা নির্দেশ করা।

ফিরোযপুর তাহশীলের চাতুড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত এক ইজতিমা থেকে ষোলটি জামা'আত তৈরী হলো। প্রতি জামা'আতের জন্য একজন আমীর এবং প্রতি চার জামা'আতের জন্য একজন প্রধান আমীর নিযুক্ত করা হলো। এমনভাবে আয়োজন ও ব্যবস্থা করা হলো যাতে সমগ্র মেওয়াতে এ জামা'আতগুলোর একবার সফর হয়ে যায়। সে হিসাবে চারটি জামা'আতকে পার্বত্য এলাকায়, চারটি জামা'আতকে পাহাড় ও সড়কের মধ্যবর্তী জনপদে, চারটি জামা'আতকে হোডল থেকে দিল্লীগামী সড়ক এবং ইল্লোর থেকে দিল্লীগামী সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে এবং চারটি জামা'আতকে হোডল থেকে দিল্লীগামী সড়ক ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে কাজ করার জন্য তকসীম করা হলো। খোঁজ খবর নেয়া ও বয়ান করার জন্য প্রত্যেক স্থানেই নিযামুদ্দীন থেকে একজন লোক পাঠানো হতো। এভাবে কাজ শেষে সবক'টি জামা'আত ফরিদাবাদে একত্র হলো এবং মাওলানার উপস্থিতিতে সেখানে জলসা হলো। ফরিদাবাদ থেকে ষোলটি জামা'আত বিভিন্ন পথে চারভাগে বিভক্ত হয়ে দিল্লী জামে মসজিদে একত্র হলো। সেখানেও জলসা হলো এবং বেশ কিছু জামা'আত পানিপথ, সোনিপথ ও অন্যান্য এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

এ সময় মেওয়াতে তাবলীগী গাশত এবং দ্বীন শেখার জন্য সফর ও হিজরত করার ফাযায়েল ও উৎসাহমূলক আলোচনা বদস্তুর অব্যাহত থাকলো। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে মাওলানা এখন একই দাবী ও একই দাওয়াত পেশ করে চলেছিলেন। এ প্রসংগে বিভিন্ন মেওয়াতি এলাকায় বহু সফর ও জলসা অনুষ্ঠিত হলো। সবখানেই তিনি নতুন নতুন শিরোনামে ফাযায়েল বর্ণনার মাধ্যমে একই বক্তব্য তুলে ধরতেন এবং কাওমের কাছে একই দাবী ও আবদার পেশ করতেন। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে তিনি বলতেন, "বিশ্বাস করো; একাজেই রয়েছে তোমাদের দ্বীন দুনিয়ার কামিয়াবী।" এই নিরন্তর প্রচেষ্টা ও মেহনতের ফলে এক সময় ত্যাগ ও কোরবানীর এ কঠিন

কাজের প্রতিও মানুষের ভীতি দূর হয়ে গেলো এবং কাজ তুলনামুলক সহজ মনে হতে লাগলো।

মেওয়াতে ও বাইরে সফরের জন্য বহু জামা'আত তৈরী হতে লাগলো। এ বিষয়ে সব সময় জোর দেয়া হচ্ছিলো যে, অন্যান্য কাজের মতো এ কাজও যেন সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এ জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে জলসা ও ইজতেমারও ব্যবস্থা করা হতো। প্রতিটি জলসা থেকে কিছু নতুন জামা'আত তৈরী হয়ে আশপাশের এলাকায় কিংবা ইউ, পি অঞ্চলে গাশতের জন্য বের হতো। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'সময়' পেশ করতো। অর্থ চাঁদার ব্যবস্থা তো দুনিয়াতে আগে থেকেই ছিলো। কিন্তু দ্বীনের জন্য 'সময়' চঁাদা করার রেওয়াজ মেওয়াতেই প্রথমবার শুরু হলো।

এ কাজে আত্মনিয়োগকারীদের মাঝে হযরত মাওলানা কোরবানির জযবা ও ত্যাগের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন। আল্লাহকে রাজী করার জন্য মানুষ খেতিবাড়ী ও কায়কারবারের ক্ষতি হাসিমুখে বরদাশ্‌ত করতে শিখুক, এই ছিলো একান্ত কামনা। বহুদীর্ঘ যুগ পরে মেওয়াতে আবার এ সুন্নত জিন্দা হলো যে, দ্বীনের জন্য দুনিয়ার ক্ষতি ও বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে মানুষ হিম্মতের সাথে আগে বাড়লো। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, আল্লাহর ফজলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতি ও ঝুঁকির পরিস্থিতি আসেনি। বরং জামা'আত-ফেরতা মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেয়েছে যে, তার জন্য গায়বী মদদ এসেছিলো এবং তার অনুপস্থিতিতে খেতিবাড়ি ও কায়কারবারের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে।

মেওয়াতে দ্বীনের ব্যাপক প্রসার

এই বিপুল সংখ্যক আত্মত্যাগী ও স্বেচ্ছাসেবী মুবাল্লিগের বদৌলতে–যারা নিজেদের সামান নিজেদের কাঁধে বহন করে এবং নিজেদের খরচ নিজেরা জোগাড় করে গ্রাম থেকে গ্রামে এবং মেওয়াতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দ্বীনের দরদ ব্যথা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলো তাদের বদৌলতে অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই বিস্তৃত জনপথে দ্বীন ও দ্বীনদারির এমন ব্যাপক প্রসার ঘটলো এবং কয়েক শতাব্দী ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন এ ভূখণ্ডে হিদায়াতের এমন সর্বপ্লাবী আলো ছড়িয়ে পড়লো যে, তার নযীর পৃথিবীর দূর বহুদূর, পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া

যায় না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ইসলামী সালতানাত যদি যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করে এবং মোটা মোটা বেতনের মুবাল্লিগ নিয়োগ করে কিংবা মক্তব মাদরাসার জাল বিস্তার করে সালতানাতের কোন একটি এলাকায় এমন সুচারুরূপে দ্বীনের প্রসার ঘটানোর এবং মানুষকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞাত ও অনুগত করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতো তবে কিছুতেই তা করতে সক্ষম হতো না। কেননা জীবনের বৈপ্লবিক মোড় পরিবর্তনের বিষয়টি জাগতিক উপায় উপকরণ ও প্রাচুর্যের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। বস্তুতঃ ইসলামের প্রারম্ভকালে অনুসৃত পথ ও পন্থাই হলো দ্বীনী কাজের সঠিক পথ ও পন্থা। ইসলামের জানবায মুজাহিদগণ জিহাদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও রসদপত্র নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতেন এবং আল্লাহর রিযামন্দি ও শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষায় জিহাদ করতেন। তদ্রূপ দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ওয়ায ও ইরশাদের দায়িত্ব যারা পালন করতেন তারা আল্লাহর হুকুম এবং নিজেদের কর্তব্য মনে করে পূর্ণ সততা, বিশ্বস্ততা ও আত্মনিবেদনের সাথেই তা করতেন। মেওয়াতের এই দ্বীনী মেহনত মোজাহাদার মাঝে সেই কল্যাণযুগেরই যেন হালকা আভাস দেখা যাচ্ছিলো। কাঁধে সামান, বগলে কিতাব, চাদরে পেঁচানো শুকনো রুটি, মুখে যিকির ও তাসবীহের মৃদু গুঞ্জন, চোখে রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি, কপালে সিজদার নুরানী চিহ্ন এবং শরীরের সর্বাংগে মেহনত মোজাহাদার ছাপ–এ অবস্থায় কোন তাবলীগী কাফেলার পথ চলা যদি কেউ দেখতে পেতো তবে তার কল্পনার দৃষ্টিপথে বীরে মউনার সেই শহীদ ছাহাবা কেরামের একটা আবছা ছবি যেন ভেসে উঠতো যারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের নির্দেশে দ্বীন প্রচার ও কোরআন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কাফেলা বেঁধে যাত্রা করেছিলেন আর পথে শাহাদাতের আবে হায়াতে চুমুক দিয়েছিলেন।

সমাজ পরিবেশের পরিবর্তন

ধীরে ধীরে মেওয়াতি সমাজে পরিবর্তনের দোলা লাগলো এবং মৌসুম বদলের আভাস সর্বত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। জমি এমন উর্বর ও উপযোগী হয়ে উঠলো যে, দ্বীনের চারাগাছ পরিপুষ্ট হওয়া এবং সবুজ সজীব ও ফলবতী হওয়ার আশা দেখা দিলো। দ্বীনের প্রতিটি শাখার জন্য এখন আলাদা মেহনত

মোজাহাদার প্রয়োজন থাকলো না। কাজ অনেক বাকী ছিলো যদিও (এবং সংশোধনযোগ্য কিছু রসম রেওয়াজ তখনও বহাল ছিলো যদিও) কিন্তু যে সকল এলাকায় 'কাজ' বেশী পরিমাণে হয়েছিলো সেখানে মানুষকে শুধু এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিলো যে, এটা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত কিংবা এটা আল্লাহর হুকুম।

মাওলানার চিন্তায় কাজের সঠিক তরতীব ও ক্রমধারা এটাই ছিলো যে, প্রথমে মানুষের মাঝে ঈমানের হাকীকত, দ্বীনের শওক ও তলব, আখেরাতের কদর কীমত এবং আখেরাতের জন্য দুনিয়ায় জানমালের ক্ষতি সওয়ার যোগ্যতা যেন পয়দা হয়ে যায়। তাহলে পরবর্তীতে সমগ্র দ্বীনের উপর আমল করার যোগ্যতা আপনা থেকেই পয়দা হয়ে যাবে।

তাই দেখা গেলো, এক দাওয়াতি মেহনতের বরকতে মেওয়াতে দ্বীনদারীর ঐ সকল নিদর্শন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো যার এক একটির জন্য ইতিপূর্বে বহু বছরের মেহনত সত্ত্বেও হয়ত উল্লেখযোগ্য কোন সফলতা আসতো না। বরং উল্টো জিদ ও হঠকারিতা সত্য গ্রহণের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতো। তাবলীগী মেহনতের বরকতেই দেশে এখন দ্বীনী শওক ও ধর্মানুরাগ জাগ্রত হয়েছে এবং সমাজ জীবনের সর্বত্র তার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে এলাকায় বহু দূর পর্যন্ত মসজিদ দেখা যেতো না সেখানে এখন গ্রামে গ্রামে মসজিদ তৈরী হয়ে গেছে এবং দেখতে দেখতে দেশের সর্বত্র হাজারো মসজিদ, হাজারো মিনার সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে। শত শত মকতব এবং বেশ কিছু মাদরাসা কায়েম হয়ে গেছে।[১] হাফেজের সংখ্যা কয়েকশ ছাড়িয়ে গেছে।

১। নূহ অঞ্চলস্থ معين الإسلام মাদরাসা হচ্ছে মেওয়াতের প্রধান দ্বীনী মাদরাসা ১৩৪১হিজরীতে হযরত মাওলানা নিজ হাতে এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এ মাদরাসার নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজে খান বাহাদুর শায়খ আযীযুদ্দীন ছাহেব দেহলবী মরহুম স্বতঃস্ফূর্ত ও অকাতর অর্থ ব্যয় করেছেন। ১৯৪০ এর ২৪শে ডিসেম্বর তিনি ইনতিকাল করেছেন। (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।)

২। এ ক্ষেত্রে মেওয়াতি ওলামায়ে কেরামের উস্তাদ ও মুরুব্বী মাওলানা আবদুস

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলিমও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছেন।[২] মানুষের অন্তরে হিন্দুওয়ানী লেবাস পোশাকের প্রতি সাধারণ ঘৃণা এবং মুসলমানী লেবাস পোশাক ও ইসলামী আচার অভ্যাসের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছে। কিছু বলা কওয়া ছাড়া মানুষ স্বেচ্ছায় হাতের চুড়ি ও কানের বালা ফেলে দাড়ি রাখা শুরু করেছে। বিবাহ শাদীতে শিরক বিদ'আত ও শরীয়ত বিরোধী রসম রেওয়াজ খতম হয়ে গেছে। সুদের লেনদেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। মদ প্রায় উঠে গেছে। খুন খারাবীর ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। অপরাধ প্রবণতা, নৈতিকতা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের হার পূর্বের তুলনায় বেশ কমে গেছে। ধর্মহীনতা, অন্যায়, অনাচার, বিদআতি রসম রেওয়াজ ও আচার অভ্যাস অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে নিজে নিজেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মেওয়াতের এক জ্ঞানবৃদ্ধ এ বাস্তবতাকে যে অতীব প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষা দিয়েছেন তাতে নতুন সংযোজনের কোন অবকাশ নেই। ক্বারী দাউদ ছাহেব উক্ত বৃদ্ধ মেওয়াতিকে তার মনোভাব জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে হচ্ছেটা কি? বৃদ্ধ মেওয়াতি বললেন, বিশেষ কিছু তো জানি না, তবে আগে যেসব বিষয় শত চেষ্টাতে কিছুই হতো না সেগুলো এখন আপনা আপনি হয়ে যাচ্ছে এবং যেসব মন্দ বন্ধ করার জন্য আগে ভীষণ লড়ালড়ি হয়ে যেতো অথচ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও কিছুতেই তা রোধ হতো না সেগুলো এখন নির্বিবাদে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাওলানার মতে মেওয়াতি জীবনের এ সংশোধন ও পরিবর্তনের সবচে' বড় কারণ হলো ঘর ছেড়ে তাদের আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, বিশেষতঃ ইউ, পি'র দ্বীনী ও ইলমী কেন্দ্রগুলোতে হাজির হওয়া। জনৈক মেওয়াতিকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন,

বিভিন্ন জামা'আতের ইউ, পি সফরের এমনই সুফল যে, সংখ্যায় দু'শও হবে না; এত সামান্য কজন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে। তদুপরি

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

সুবহান ছাহেবের অবদান সর্বাধিক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত করুলবাগ দিল্লীস্থ মাদরাসা থেকে বিপুল সংখ্যক মেওয়াতি ছাত্র আলিম হয়ে বের হয়েছেন।

সময়ের পরিমাণও এত নগণ্য যে, ঘরোয়া সময়ের তুলনায় তার কোন অস্তিত্বই নেই। অথচ এত অল্প মানুষের এত অল্প সময় বের হওয়ার সুফল হয়েছে এই যে, মানুষের মুখে মুখে এখন 'মহান বিপ্লব' শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে এবং তোমাদের দেশের নিরেট মুর্খ লোকদের না-পাক জযবা এখন দ্বীন প্রচারের মোবারক জযবায় রূপান্তরিত হয়েছে।[১]

কিন্তু মাওলানার চিন্তায় এ আশংকা দৃঢ়মূল ছিলো যে, মেওয়াতি জনগোষ্ঠী যদি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে জীবনের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়রূপে গ্রহণ না করে এবং দ্বীনের মেহনত মোজাহাদায় শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাহলে তাদের অধঃপতন হবে আগের চেয়ে ভয়ংকর। কেননা ধর্মীয় জাগরণের কারণে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি এখন মেওয়াতের প্রতি নিবদ্ধ। হাজারো মানুষের হাজারো দৃষ্টির সাথে রয়েছে হাজারো ফিতনা। অজ্ঞতা ও অজ্ঞাতির রক্ষা প্রাচীর যেহেতু ভেংগে গেছে, সেহেতু এখন অনেক বেশী সতর্ক ও হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন। এক পত্রে তিনি বলেন-

তাবলীগের কাজে চার চার মাস দেশে দেশে (মানুষের দুয়ারে দুয়ারে) যাওয়াকে জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানানোর চেষ্টায় পূর্ণ উদ্যমে যতদিন আপনারা ঝাঁপিয়ে না পড়বেন ততদিন জাতি আসল দ্বীনদারীর স্বাদ পাবে না এবং প্রকৃত ঈমানের মিষ্টতা তাদের অনুভব হবে না। এখনও পর্যন্ত (কাজ ও তার সফলতার) যে পরিমাণ তা খুবই সাময়িক। যদি তোমরা চেষ্টা ছেড়ে দাও তাহলে জাতির পতন পূর্বের তুলনায় অধিকতর ভয়ংকর হবে। এতদিন অজ্ঞতা (র ঢাল) তোমাদেরকে রক্ষা করছিলো। অজ্ঞতা ও মুর্খতার ব্যাপকতার কারণে অন্যরা এ জাতির অস্তিত্বকে এতদিন হিসাবেই ধরেনি এবং গুরুত্বের যোগ্য মনে করেনি। কিন্তু এখন যদি দ্বীন ও ঈমানের দুর্গ গড়ে তোলে নিজেদের (জাতীয় সত্তার) হেফাজতের ব্যবস্থা না করো তাহলে তোমরা অন্যান্য জাতির আগ্রাসনের সহজ শিকারে পরিণত হবে।[২]

১। মিয়াঁজী মুহম্মদ ঈসা- এর নামে লেখা পত্র

২। মিয়াঁজি মোহম্মদ ঈসা (ফিরোজপুর নমক)

দিল্লীর মুবাল্লিগ দল

দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে বেশ কিছুদিন থেকে বেতনভুক্ত পাঁচজন মুবাল্লিগ নিযুক্ত ছিলো। প্রায় আড়াই বছর ধরে এরা মোটামুটি তাবলীগের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেই কাজ করে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাতে মাওলানার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোটেই অর্জিত হচ্ছিলো না। এই ধীর, অলস ও প্রাণহীন কর্মকাণ্ডের প্রতি তিনি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মেওয়াতের স্বেচ্ছাসেবী ও নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগদের মেহনতে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে যে, মহাজাগরণ ও প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিলো, পেশাদার মুবাল্লিগদের দ্বারা কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছিলো না।

তাই পেশাদারি তাবলীগের প্রতি মাওলানা সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছিলেন।

শেষ হজ্জ, হারামাইনে দাওয়াতের গোড়াপত্তন

মাওলানার আজীবন স্বপ্ন ছিলো; ভারতবর্ষে কাজ কিছুটা ভিত্তি ও স্থিতি লাভ করার পর কতিপয় বিশিষ্ট সাথীসহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা মদীনায় গিয়ে তিনি দাওয়াতি কাজ শুরু করবেন। কেননা এ তো মক্কা মদীনারই সওগাত যা গ্রহণ করে সুদূর ভারতের মুসলিম মিল্লাত ধন্য হয়েছেন। সুতরাং হারমাইনের অধিবাসীরা بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا [১] বলে এ দাওয়াতকে স্বাগত জানাবেন এটাই তো স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। এভাবে আরবদের দাওয়াতি জাগরণের মাধ্যমে এ মহান সম্পদ ইসলামী বিশ্বের ঘরে ঘরে বন্টিত হতে পারে।

ছাপ্পান্ন হিজরীর দিকে তাঁর অন্তরে এ অনুভূতি ও স্পৃহা প্রবল হয়ে দেখা দিলো। তাই জিলকদ মাসের আঠারো তারিখে তিনি পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। [২]

১। আমাদের সম্পদ আমাদেরকে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে।

২। তাঁর সফর সংগীদের মধ্যে ছিলেন, মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেব, ছাহেবজাদা মৌলবী মুহম্মদ ইউসুফ ছাহেব, মৌলবী ইনআমুল হাসান ছাহেব, মৌলবী

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

পানির জাহাজে বিস্তর তাবলীগী বয়ান, আহকামুল হজ্জ বিষয়ক আলোচনা হলো। জিদ্দা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে 'বাহরা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি হলো। তখন স্থানীয় বিশিষ্টদের এক মজলিসে মাওলানা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ সম্পর্কে বয়ান রাখলেন এবং শ্রোতা মণ্ডলীও তা স্বাগত জানালো। হজ্জের সময় যেহেতু আসন্ন ছিলো এবং থাকাটাকার ব্যবস্থা করাও জরুরী ছিলো সেহেতু মক্কা শরীফে দাওয়াত ও তাবলীগ প্রসংগে কারো সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগ হলো না। তবে মিনায় অবস্থান কালে বিভিন্ন দেশী হাজী ছাহেবানের সাথে আলাপ আলোচনা হলো। মাওলানা এক সমাবেশে বয়ান করলেন এবং এর ভালো প্রভাব পড়লো।

হজ্জের পর কতিপয় হিন্দুস্তানী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ হলো। তারা হিজাযের বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির বিচারে দাওয়াত ও তাবলীগের পরিকল্পনার কঠোর বিরোধিতা করলেন। পরে মাওলানা শফিউদ্দীন ছাহেবের সাথে বিষয়টি আলোচনা হলো। তিনি জোরদার সমর্থন জানিয়ে বললেন, আমি তো গায়বী সাহায্যের দৃঢ় আশা রাখি। এক শুক্রবার মুহম্মদ সাঈদ মক্কীর ঘরে দাওয়াত ছিলো। খাওয়া দাওয়ার পর মাওলানা কিছুক্ষণ বয়ান করলেন। বয়ানের কোন কোন বক্তব্যের উপর মেজবান মুহম্মদ সাঈদ মক্কী ভীষণ ক্ষুদ্ধ হলেন।

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

নূর মোহম্মদ ছাহেব, হাজী আব্দুর রহমান ছাহেব, মৌলবী ইদরীছ ছাহেব, মৌলবী জামীল ছাহেব। অন্যান্য সংগীদের মধ্যে ছিলেন, মুতাওয়াল্লী তোফায়েল আহমদ, মৌলবী যাহীরুল হাসান ছাহেব ও মাষ্টার মাহমুদুল হাসান ছাহেব।

নিযামুদ্দীন ও মেওয়াতের তাবলীগী কাজ এবং মকতব সমূহের দায়িত্ব মৌলবী সৈয়দ রিযা হাসান ছাহেবের উপর এবং দিল্লীর কাজের দায়িত্ব হাফেয মৌলবী মকবুল হাসান ছাহেবের সোপর্দ ছিলো। কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিলো শায়খুল হাদীছ মাওলানা মোহম্মদ যাকারিয়া ছাহেবের হাতে। যাবতীয় বেতনাদি পরিশোধ করা, বিভিন্ন জলসায় অংশ নেয়া, নিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং পরামর্শ সাপেক্ষ বিষয় হাজী রশীদ আহমদ ছাহেবের বিবেচনা অনুযায়ী সম্পন্ন হতো।

খুব কষ্টে তাকে শান্ত করা হলো। পরে তিনি বেশ কিছু সুচিন্তিত পরামর্শ দিলেন।

বাহরাঈনের এক হাজী কাফেলার সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময় হলো। তারা দেশে গিয়ে কাজ শুরু করার অটল প্রতিজ্ঞা করলো। কাফেলায় দু'জন আলিমও ছিলেন। সকলের অভিব্যক্তি থেকে মনে হচ্ছিলো; তারা মাওলানার বক্তব্যের যথার্থ মূল্যায়ন করছেন এবং এ কাজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছেন। হিজাযের কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দুস্তানী ব্যবসায়ীর সাথেও আলোচনা হলো। মাওলানার বয়ান শুনে প্রথমে তারা চমকিত হলেও পরে চমৎকৃত হলেন এবং দ্বিতীয় দফা আলাপ-আলোচনার পর কাজের জন্য মোটামুটি প্রস্তুত হলেন। তবে সকলেই প্রথমে বাদশাহর অনুমতি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। এজন্য দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরবীতে লিখে বাদশাহর সামনে পেশ করার সিদ্ধান্ত হলো। মাওলানা ইহতিশামুল হাসান আলাদাভাবে শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ বিন হাসান ও শায়খ বিন বালীহাদ এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন।[১]

দু' সপ্তাহ পর ১৪ই মার্চ হযরত মাওলানা বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হাজী আব্দুল্লাহ দেহলবী, আব্দুর রহমান মাযহার (প্রধান মুআল্লিম) ও মৌলবী ইহতিশামুল হাসান ছাহেবকে সংগে করে রাজ দরবারে হাজির হলেন। বাদশাহ মসনদ থেকে নেমে এবং পূর্ণ মর্যাদায় সম্মানিত হিন্দুস্তানী মেহমানদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং একান্ত নিকটে আসন দান করলেন। মেহমানগণ দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রার্থনা করে বক্তব্য পেশ করলেন। প্রতি উত্তরে সুলতান তাওহীদ, কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের আনুগত্য সম্পর্কে প্রায় চল্লিশ মিনিটব্যাপী বিশদ বক্তব্য রাখলেন। এরপর পুনরায় মসনদ থেকে নেমে মেহমানদের সসম্মানে বিদায় জানালেন। পরবর্তী দিন সুলতান রাজধানী রিয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।[২]

১। মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেবের লেখা পত্র, তাং ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৩৮ ইং

২। মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেবের লেখা পত্র, তাং ৩০শে মার্চ ৩৮ ইং

মৌলবী ইহতিশামুল হাসান ছাহেব তাবলীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত নোট শায়খুল ইসলাম ও প্রধান বিচারপতি আব্দুল্লাহ বিন হাসানের বরাবরে পেশ করলেন। হযরত মাওলানা ও মৌলবী ইহতিশাম ছাহেব ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। শায়খুল ইসলাম যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাদের প্রতিটি বক্তব্য জোরালোভাবে সমর্থন করলেন এবং মৌখিকভাবে পূর্ণ সাহায্য-সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে সরকারী অনুমতির বিষয়টি ডেপুটি জেনারেল প্রিন্স ফয়সলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ বলে জানালেন।[১]

মক্কা শরীফ অবস্থানকালে সকাল-সন্ধ্যা দুই সময় তাবলীগের উদ্দেশ্যে জামা'আত রওয়ানা হতো এবং সাধ্যমত ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাবলীগী কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হতো। কয়েকটি জলসাও হলো এবং মৌলবী ইদরীস ও মৌলবী নূর মোহম্মদ ছাহেব সেখানে উর্দুতে বয়ান করলেন। ফলে শ্রোতারা কাজের সাথে পরিচিত ও অন্তরংগ হতে লাগলো।[২]

হজ্জের সফরসংগীদের প্রতি মাওলানার জোর তাকীদ ছিলো, তাওয়াফ, ওমরা ও অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে তাবলীগী কাজকেই যেন তারা অধিক গুরুত্ব দেন। কেননা এ সময় বিশেষতঃ এই পবিত্র স্থানে এর চে' উত্তম কোন আমল ও ইবাদত হতে পারে না।[৩]

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ওলামায়ে কেরামের এক সমাবেশে হযরত মাওলানা প্রশ্ন রাখলেন, মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতনের কারণ কি? সকলে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিলেন। মাওলানা নিজেও মতামত পেশ করলেন এবং কাজের দাওয়াত দিলেন। শ্রোতাগণ তাঁর বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে একাত্মতা প্রকাশ করলেন।

১। মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেবের লেখা পত্র, তাং ২৭/ ফেব্রুয়ারী ৩৮ ইং

২। মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেবের লেখা পত্র, তাং ৩০/ মার্চ ৩৮ ইং

৩। শায়খুল হাদীছ ছাহেবের নামে লেখা মাওলানা ইনামুল হাসান ছাহেবের পত্র।

জনৈক মারেফাত জ্ঞানীর সমর্থন

ছাহেবযাদা মৌলবী মুহম্মদ ইউসুফ ছাহেব বলেন, একবার আমরা বাবুল উমরা সংলগ্ন আমাদের অবস্থান গৃহে জড়ো হয়ে মনোযোগ সহকারে হযরতের বয়ান শুনছিলাম। এমন সময় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন। নিজেদের কাজে তোমরা আত্মনিমগ্ন থেকো। এর বিনিময় ও পুরস্কার এত বিরাট যে, তা প্রকাশ করলে তোমরা বরদাশ্ত করতে পারবে না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। একথা বলেই তিনি স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমাদের আর জানা হলো না, কে এই বুজুর্গ? কি তাঁর পরিচয়? কিন্তু হযরত মাওলানা বদস্তুর তাঁর কথা অব্যাহত রাখলেন। এদিকে ফিরেও তাকালেন না।

৫৭ হিজুরীর পঁচিশে সফর মাওলানা মোটরযোগে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে ২৭ শের সকালে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। সেখানেও তাবলীগী প্রচেষ্টা শুরু হলো। মৌলবী সৈয়দ মাহমুদ ও মৌলবী ইহতিশামুল হাসান–এ দুজনকে সংগে করে হযরত মাওলানা মদীনার প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদের উদ্দেশ্য পেশ করলেন। সম্মানিত প্রশাসক মৌখিক পর্যায়ে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করে জানালেন, অনুমতি প্রদানের কোন ক্ষমতা তার নেই, তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মক্কায় পাঠিয়ে দিবেন এবং প্রাপ্ত নির্দেশ পালন করবেন। [১]

তবে বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দু'বার কোবায়ও যাওয়া হলো। সেখানে এক মজমায় হযরত মাওলানা বয়ানও রাখলেন এবং কিছু লোক কাজের জন্য তৈয়ারও হলো। [২]

একই উদ্দেশ্যে অহুদেও দু'বার যাওয়া হলো। এক মজমায় মৌলবী নূর মুহম্মদ ও মৌলবী ইউসুফ ছাহেব আরবীতে বয়ান করলেন এবং শ্রোতাগণ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করলেন। [৩]

১। শায়খুল হাদীছের নামে লেখা মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেবের পত্র, তাং ১২ই রবিউল আউয়াল ৫৭ হিজরী, মুতাবিক ১১ মে ৩৮ ইং

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

আরব বেদুঈনদের সাথেও কথাবার্তা হতো। বাচ্চাদের কলেমা শোনা হতো। বিভিন্ন সরাইখানা ও মুসাফিরখানায়ও জনসংযোগ চালানো হতো। [১] কাজের ব্যাপারে কখনো আশাবাদ জাগ্রত হতো। কখনো আবার নিরাশাও দেখা দিতো। তবে এ সফরে এ উপলব্ধি পূর্ণমাত্রায় হয়ে গেলো যে, হিন্দুস্তানের তুলনায় আরবদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রয়োজন অনেক বেশী। [২]

হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন

হিজাযে অবস্থানকালে হযরত মাওলানা দিল্লী ও মেওয়াতের তাবলীগী কাজ ও কাজের গতি সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। বরং পত্রযোগে কাজের গতি ও ধারাবাহিকতার বিশদ বিবরণ তিনি পেতেন। আবার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ দান করতেন।

মদীনা শরীফে পনের দিন অবস্থানের পর প্রাজ্ঞজনদের পরামর্শে তিনি ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে এসে মক্কা শরীফের জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তিনি লিখেছেন–

জনাব, আপনার মর্যাদা চিরস্থায়ী হোক। সালামের জবাব গ্রহণ করুন। আমার ফিরে আসার কারণ এই যে, মদীনা শরীফে পনের দিন অবস্থানের পর

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

২। শায়খুল হাদীছের নামে লেখা মাওলানা ইহতিশামুল হাসান ছাহেবের পত্র।

৩। শায়খুল হাদীছের নামে লেখা মৌলানা ইউসুফ ছাহেবের পত্র, তাং ১২ই রবিউল আউয়াল ৫৭ হিজরী।

এই পৃষ্ঠার টীকা

১। শায়খুল হাদীছের নামে লেখা মৌলানা ইউসুফ ছাহেবের পত্র, তাং ১২ই রবিউল আউয়াল ৫৭ হিজরী।

২। ঐ

সকালে চায়ের মজলিসে আমি জোরদারভাবে ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কাজ শুরু করার উপায় ও পন্থা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তখন আমাদের সকল পরামর্শদাতা এ জন্য কমপক্ষে দু'বছর এখানে অবস্থান করা জরুরী বলে রায় দিলেন এবং আমার মতে তা যথার্থও ছিলো। কিন্তু এতো দীর্ঘ অবস্থানের কারণে হিন্দুস্তানের কাজ পণ্ড হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা ছিলো। তাই এখানের কাজকর্মকে এমন রূপরেখার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যাতে সেখানে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে কাজে নামতে পারি। এ উদ্দেশ্যে সাময়িক অবস্থানের নিয়তেই ফিরে এসেছি। আপনাদের অন্তরে দ্বীনে মোহম্মদীর অস্তিত্ব রক্ষার সঠিক দরদ যদি থেকে থাকে এবং নিজেদের কর্মব্যস্ততার মুকাবেলায় দ্বীনে মোহম্মদীকে যদি বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক মনে হয়ে থাকে; সেই সাথে আমার কর্মপন্থা যদি সঠিক মনে হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমার মূলনীতিগুলো সরাসরি নিজেরা বুঝুন এবং জামা'আতের সাথীদেরকেও সরাসরি বোঝার জন্য উৎসাহিত করুন এবং এ কাজে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মাধ্যমে নিজেকে মজবুত করুন। বিশেষ আর কি।

সালামান্তে

বান্দা মুহম্মদ ইলয়াস

নিযামুদ্দীন, দিল্লী

পঞ্চম অধ্যায়

মেওয়াতে কাজের সংহতি এবং এর বহিঃপ্রসার

ভারতে ফিরে এসে তিনি মেওয়াতের দাওয়াতি ও তাবলীগী কর্মতৎপরতা অনেক বাড়িয়ে দিলেন। ধারাবাহিক সফর, ইজতিমা ও গাশত হলো। পুনরায় জামা'আতের আনাগোনা শুরু হলো এবং বিভিন্ন মেওয়াতি জামা'আত ইউ, পির বিভিন্ন শহর ও কসবায় চলতে ফিরতে শুরু করলো। শহরে মুসলমানদের দিকেও দাওয়াতি মেহনতের অভিমুখ করা হলো এবং মেওয়াতের মতো দিল্লীতেও শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভের আশায় তাবলীগী কাজে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করা হলো। এভাবে এখানেও জানমাল খরচের ভিত্তিতে কাজের সিলসিলা শুরু হলো। মহল্লায় মহল্লায় জামা'আত তৈরী হলো এবং সাপ্তাহিক গাশত শুরু হলো।

মাওলানার মনের অনুভূতি ও দাওয়াতের প্রেরণাশক্তি

শহর-পরিবেশে ঈমান ও দ্বীনদারীর অবস্থা দেখে মাওলানার প্রখর সংবেদনশীল মনে কতগুলো অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠেছিলো, যার ফলে হৃদয়ের গভীরে তাঁর কী যেন একটা ব্যথা ও যন্ত্রণা লেগেই থাকতো।

প্রথমতঃ শহরে ধার্মিকতা ও ধর্মানুরাগ তো অবশ্যই ছিলো কিন্তু ক্রমেই তা সংকুচিত হয়ে আসছিলো। প্রথম পর্যায়ে তা সাধারণ সমাজ জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে একটা মোটামুটি সংখ্যায় এসে সীমাবদ্ধ হলো। এ বৃত্ত পরবর্তীতে আরো সংকীর্ণ হয়ে আম লোকের স্তর থেকে খাছ লোকদের হালকায় আবদ্ধ হলো। এভাবে দেখতে দেখতে তা বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টতরদের মাঝে সংকুচিত হয়ে পড়লো আর এখন তো বেচারা দ্বীনদারী বেঁচে আছে কতিপয় ব্যক্তির মাঝে মাত্র। দিন দিন তাদেরও সংখ্যা হ্রাস পেয়েই চলেছে।

এটা অবশ্য ঠিক যে, কোথাও কোথাও ধার্মিকতার প্রাচুর্য এবং ধার্মিকদের বিরাট সমাবেশও হতো, যা দেখে মানুষের মন খুশিতে বাগবাগ হয়ে যায় যে, আলহামদুলিল্লাহ! এ যুগেও দ্বীনদারী ও ধার্মিকতার এমন উচ্চ আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, দ্বীনের প্রসার ও বিস্তার লোপ পেয়ে চলেছিলো এবং সমাজ অধঃপতনের পথে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিলো। ফলে পুরো মাত্রায় এ আশংকা বিদ্যমান ছিলো যে, হাতেগোনা দ্বীনদার ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের বিদায় গ্রহণের পর হয়ত বা দ্বীনদারী ও ধার্মিকতাই দুনিয়া থেকে উঠে যাবে। কিংবা সংকুচিত হতে হতে মুসলমানদের জীবন–পাতায় একটা বিন্দুর মত শুধু টিকে থাকবে। দ্বীনদারী ও ধার্মিকতার এ মর্মান্তিক অধঃপতন হযরত মাওলানার চোখের সামনেই ঘটে চলেছিলো। যে সকল খান্দান বা এলাকা হিদায়াত ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণকেন্দ্র ছিলো, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইলম ও আমলের আলোকবর্তিকা সমুজ্জ্বল ছিলো এবং দীপ থেকে দীপ প্রজ্বলিত হয়ে আসছিলো; ধীরে ধীরে সেগুলো আলোহীন হয়ে চলেছিলো। যিনি যেতেন তিনি চিরকালের জন্যই শূন্যস্থান রেখে যেতেন। আর জমাটবাঁধা এক অন্ধকার গ্রাস করে নিতো সে স্থান। মুযাফ্ফরনগর, সাহারানপুর ও দিল্লীর সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী এলাকাগুলোর অধঃপতন সম্পর্কে মাওলানা ব্যক্তিগতভাবেই অবগত ছিলেন। এজন্য তার দহন যন্ত্রণাও ছিলো সীমাহীন। এক শোকপত্রে তিনি লিখেছিলেন–

"আফসোসের বিষয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহর নাম যিকিরের স্বাদ গ্রহণকারী ব্যক্তিত্বের অর্বিভাব তো আর হচ্ছে না অথচ সংস্পর্শ গুণে যারা কিছু হয়েছিলেন কোন উত্তরসুরী না রেখেই একে একে তারা বিদায় নিয়ে চলেছেন। ক্রমাবনতিশীল অবস্থার অবসান ও ক্ষতিপূরণকল্পে মাওলানা চাচ্ছিলেন, সাধারণ মুসলিম সমাজে দ্বীন ও দ্বীনদারির পুনঃব্যাপক প্রসার হোক। তারপর সেখান থেকে আবার উঁচু তবকার খাছ দ্বীনদার মানুষ গড়ে উঠুক। এ ধারাই বিগত যুগে বহমান ছিলো। এখনো সে ধারা পুনঃবহমান হলেই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

ইলমে দ্বীনের অবস্থা তো দ্বীনদারীর চেয়েও করুণ ছিলো। বহু পূর্ব থেকেই তা হাতেগোনা অতিবিশিষ্ট কয়েকটি পরিবারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো।

সাধারণ মুসলমান দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার শিকার হয়ে চলেছিলো। এ ক্ষেত্রেও মাওলানার চিন্তাধারা ছিলো সাধারণ মুসলিম সমাজে ইলমে দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, যাতে মুসলিম জীবনের অপরিহার্য দ্বীনী ইলম থেকে কোন মুসলমান বঞ্চিত না থাকে এবং সেখান থেকে যেন বিশিষ্ট আলিম, শাস্ত্রবিশারদ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ শহরের ব্যস্ত জীবনের মুসলমানরা দ্বীনকে খুবই মুশকিল মনে করে নিয়েছে। তাদের ধারণায় দ্বীন মানেই হলো চূড়ান্ত সংসার ত্যাগ। আর সংসার ত্যাগ যেহেতু কঠিন সেহেতু দ্বীনের উপর চলা এবং দ্বীনদারী পালন করাও সুকঠিন। এমতাবস্থায় দ্বীনদারী সম্পর্কে হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে তারা পুর্ণভাবে দুনিয়াদারিতে আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে মর্মন্তুদ ব্যাপার এই যে, জেনেশোনেই এরা সম্পূর্ণ অনৈসলামী ও দুনিয়ামুখী জীবন ও আচরণেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত আছে। তাদের জীবনসূত্র আল্লাহ থেকে কর্তিত হয়ে নফসের সাথে জড়িয়ে গেছে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন যে দুনিয়ার যিন্দেগীকে হাদীছ শরীফে অভিশপ্ত বলা হয়েছে তাদের যিন্দেগীর হাকীকতও হয়ে পড়েছে আগাগোড়া সেই রূপ।

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّ مَلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَ مَا وَالَاهُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ

(আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন) দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অভিশপ্ত। তবে (ব্যাপক ও সম্প্রসারিত অর্থে) আল্লাহর যিকির ও তৎসংশ্লিষ্ট সবকিছু এবং আলিম ও তালিবে ইলম (অভিশপ্ত নয় কেননা এগুলোর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে।)

অবস্থার অবনতি এতদূর গড়িয়েছে যে, দ্বীনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণও যদি করা হয় তখন কোন কোন মুসলমান নিঃসংকোচে বলে দেন যে, আমাদের কথা ছাড়ুন, আমরা তো দুনিয়াদার মানুষ। দু'একজন তো বিনয় ও স্পষ্টভাষিতার চূড়ান্ত করে বলে বসেন, আমরা তো হলাম পেটের বান্দা ও দুনিয়ার কুত্তা।

কিন্তু মাওলানার মতে দ্বীনের হাকীকত হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সংসার জীবনের যাবতীয় সম্পর্ক ও কর্মব্যস্ততাকে শরীয়তের অনুগত এবং

দ্বীনের গণ্ডিতে সম্পন্ন করার নামই হলো দ্বীন। আর এটা এমনই সহজ পালনীয় বিষয় যা সংসার জীবনের যাবতীয় কর্মকোলাহলের মাঝেও প্রত্যেক মুসলমান পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারে। তবে সেজন্য সামান্য চিন্তা মনোযোগ এবং কিঞ্চিৎ দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজন। দ্বীনের এ হাকীকত ও স্বরূপ তাবলীগের মাধ্যমে তুলে ধরাকে মাওলানা সময়ের অপরিহার্য দাবী বলে মনে করতেন। কেননা দ্বীনের হাকীকত ও স্বরূপ না জানার কারণেই আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ইসলামী যিন্দেগীর সুখ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। এমনকি দুনিয়ার গোলামী ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার উপরই আত্মতুষ্ট হয়ে আছে। এক চিঠিতে মাওলানা লিখেছেন–

দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে মানুষের ধারণা অত্যন্ত ভুল। জীবন জীবিকার উপায় উপকরণ গ্রহণের নাম মোটেই দুনিয়া নয়। কেননা দুনিয়া তো অভিশপ্ত আর অভিশপ্ত বস্তু গ্রহণের আদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর আদেশ মনে করে আদিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত হওয়া অর্থাৎ আদেশ বাস্তবায়ন এবং আদেশের মর্যাদা সংরক্ষণকল্পে হারাম হালালের বিধিনিষেধ পালন করাই হলো দ্বীন। পক্ষান্তরে আদেশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শুধু আত্মপ্রয়োজন দ্বারা তড়িত হওয়া এবং 'আদেশ' ছাড়া অন্য কিছুকে সংসারের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করারই নাম হলো দুনিয়া।[১]

হযরত মাওলানা দ্বীনকে তুলনা করতেন মুখের লালার সাথে। সামান্য লালার মিশ্রণ ছাড়া কোন কিছুতে স্বাদ আসে না এবং পরিপাক ঘটে না। তাই পরিমিত পরিমাণ লালা সবার মুখেই রাখা আছে। তদ্রূপ প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীন প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই বিদ্যমান আছে। এখন শুধু কর্তব্য হলো সংসার যাত্রার সাথে তার মিশ্রণ ঘটানো, যাতে তার পুরা দুনিয়া পুরা দ্বীন হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ ইলমে দ্বীন সম্পর্কে দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, মাদরাসার চার দেয়াল, পাঠ্যসূচীর বেড়াজাল এবং শিক্ষকের অধীনে দীর্ঘ মেহনতে নাজেহাল-হওয়া ছাড়া তা হাছিল হতে পারে না। আর যেহেতু

১। মিয়াঁজি মুহম্মদ ঈসা–এর নামে লেখা পত্র।

মাদরাসার আট দশ বছরের নিয়মিত ছাত্র জীবন সবার পক্ষে সম্ভব নয়; সেহেতু সাধারণ মানুষ সিদ্ধান্ত করে বসেছে যে, ইলমে দ্বীন তাদের নসিবে নেই। সুতরাং অজ্ঞতার গণ্ডিতেই কাটবে তাদের জীবন। এটা অবশ্য ঠিক যে, শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞতা পর্যায়ের উচ্চতর দ্বীনী ইলম মাদরাসার ছাত্র জীবনেই হাছিল হয়। কিন্তু এ পর্যায়ের ইলম তো সব মুসলমানের জন্য জরুরী নয়, সম্ভবও নয়। পক্ষান্তরে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম প্রত্যেক মুসলমানই যাবতীয় কারবারি ঝামেলা ও দরবারি ব্যস্ততা এবং সামাজিক সম্পর্ক ও সাংসারিক দায় দায়িত্বের মাঝেও হাছিল করতে পারে। (আছহাবে ছুফফার ক্ষুদ্র দলটির ব্যতিক্রম বাদে) ছাহাবা কেরাম সকলেই স্ত্রী–পুত্র–পরিজনের পরিমণ্ডলে বাস করতেন। তাঁদেরও বিভিন্ন সম্পর্ক ও দায় দায়িত্ব ছিলো। ব্যস্ততা ও কর্মকোলাহল ছিলো। ব্যবসা ছিলো, কৃষিকাজ ছিলো, বিভিন্ন পেশা ছিলো। ছিলো সংসার জীবনের হাজারো ঝক্কি ঝামেলা। মদীনায় অবশ্য ইলমে দ্বীন চর্চার আলাদা কোন মাদরাসা ছিলো না। যদিও বা থাকতো তবে সে মাদরাসার নিয়মিত ছাত্র হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। জীবনের আট দশটি বছর শুধু মাদরাসার তালিবে ইলমি করে কাটানোর কোন উপায় তাঁদের ছিলো না। কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম সবই তাঁরা জানতেন। জরুরী মাসায়েল ও ফাযায়েল সম্পর্কে কেউ বেখবর ছিলেন না। এ ইলম কোত্থেকে এসেছিলো তাঁদের কাছে? এসেছিলো শুধু মজলিসে নববীতে হাজির হওয়া, অধিক জ্ঞানীদের কাছে বসা, দ্বীনওয়ালাদের ছোহবত ও সংস্পর্শে থেকে তাঁদের চলাফেরা ও আচার আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সফরে, জিহাদে সাথে থেকে সময় মত ও ঘটনা মত শরীয়তের হুকুম জেনে নেয়া। এক কথায় দ্বীনী পরিবেশে থাকার দ্বারাই প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম তাঁরা পেয়ে যেতেন। এতে অবশ্য সন্দেহ নেই যে, ছাহাবা যুগের দ্বীন চর্চার সেই মান ও পরিমাণ আজ সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু এটাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ছাহাবাযুগের কিছু না কিছু নমুনা আজও শুধু সেই পথেই হাছিল হতে পারে।

হযরত মাওলানার মতে সেই নূরানী পরিবেশের ন্যূনতম রূপ ফিরিয়ে আনার উপায় হলো, জীবনের শোরগোলে ব্যতিব্যস্ত মুসলমানদেরকে এবং শহুরে জীবনের ঘেরাটোপে বন্দী সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম

হাছিলের জন্য আল্লাহর দেয়া কিছু সময় ফারিগ করার দাওয়াত দেয়া এবং সম্পদের মতো সময়েরও যাকাত আদায়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সংসার ও সমাজ পরিবেশের সেই ঘেরাটোপ থেকে তাদেরকে বেরিয়ে আসার দাওয়াত দেয়া, যেখানে থাকা অবস্থায় জীবনে তাদের অনুভবযোগ্য কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। এটাই তাদের সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। এমনকি (প্রয়োজনের অনুভূতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও) দ্বীনের প্রাথমিক ও জরুরী মাসায়েলের ইলমও তারা হাছিল করতে পারেনি। বরং বিশ পঁচিশ বছর আগে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মুর্খতার যে স্তরে ছিলো আজো ঠিক সেখানেই সে স্থির হয়ে আছে। যার নামায ভুল ছিলো, পঁচিশ বছর ধরে তা ভুলই চলে এসেছে। দু'আ কুনূত ও জানাযার নামায যার অজানা ছিলো এত শত ওয়াজ শোনা এবং বাজারে বিক্রি হওয়া এত শত বই পড়া এবং এত দীর্ঘ সময় আলিম ওলামার প্রতিবেশে থাকা সত্ত্বেও এখনো তা জানা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, বিদ্যমান পরিবেশে জীবনের পরিবর্তন ও উন্নতির যৌক্তিক সম্ভাবনা যদিও বা আছে কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সুতরাং একমাত্র উপায় হলো সাময়িকভাবে মানুষকে (ঘরের ও সমাজের) ধর্মহীন ও নির্জীব পরিবেশ থেকে বের করে কোন জীবন্ত ও জাগ্রত ধর্মীয় পরিবেশে এনে রাখা যাতে কিছু দিনের জন্য তারা পুরোনো ও অভ্যস্ত পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সংসার জীবনের যাবতীয় ঝুটঝামেলা ও ব্যস্ততা থেকে অবসর হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশ ও কর্ম ব্যস্ততার আগ্রাসনে ঝিমিয়ে পড়া তাদের দ্বীনী জযবা ও মনোবল পুনরায় জীবন জোয়ারে জোরওয়ার হতে পারে। ঘুমিয়ে থাকা ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মানুরাগ আবার আড়মোড়া ভেংগে জেগে উঠতে পারে এবং দ্বীন শিক্ষার প্রবল ইচ্ছা আবার তাদেরকে মাতিয়ে তুলতে পারে।

চতুর্থতঃ হযরত মাওলানার মতে মুসলিম জীবনের মূল গঠনপ্রকৃতি এই ছিলো যে, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের খিদমত ও নোছরতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করবে কিংবা এ দায়িত্বে নিয়োজিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। তবে দ্বীনের কাজে নিজেও প্রত্যক্ষভাবে শরীক হওয়ার জযবা ও প্রতিজ্ঞা পোষণ করবে। বিশেষ কোন যৌক্তিক কারণে তাতে সাময়িক বিরতি হতে পারে মাত্র।

বস্তুতঃ শহরের ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্রিক প্রশান্ত ও নিরুপদ্রব জীবন–যাকে মাওলানা হিজরতী ও জিহাদী যিন্দেগীর মুকাবেলায় আয়েসীজীবন বলে আখ্যায়িত করতেন, তা ইসলামের সরল পথ হতে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট জীবন। সুদীর্ঘকাল থেকে শহুরে জীবন শুধু অর্থোপার্জন ও ভোগ বিনোদনের জীবন রূপে চলে আসছে। এই পশুধর্মী জীবন পদ্ধতি দেখে দেখে হযরত মাওলানা নিরন্তর যন্ত্রণাদগ্ধ হতেন এবং আকুলভাবে চাইতেন, শহর–বাসিন্দারাও 'হিজরত ও নোছরত'–এর জীবন গ্রহণ করুক এবং শহর–সমাজেও এর ব্যাপক প্রচলন ঘটুক।

হযরত মাওলানা এ বিভাজনে বিশ্বাস করতেন না যে, কিছু মানুষ দ্বীনের খিদমত করে যাবে আর অন্যরা নিশ্চিন্ত মনে কারবার–দরবার ও আয়–রোজগার নিয়ে মেতে থাকবে এবং মাঝে মধ্যে শুধু দ্বীনী কাজে অর্থ সাহায্য করেই কর্তব্য সমাপ্ত করবে। মোটকথা, আলেম ওলামা ও দ্বীনদারদের কাজ হলো দ্বীনের খিদমত ও হেফাজত আর বিষয়ী লোকদের কাজ হলো দুনিয়ার আয় উন্নতি সাধন এবং দ্বীনী কাজে সাধ্যমত আর্থিক অংশগ্রহণ; 'কর্মবন্টন' মূলনীতির ভুল ব্যাখ্যা প্রসূত এ ধরনের চিন্তাধারাকে হযরত মাওলানা নিছক আত্মঘাতী মনে করতেন। তিনি বলতেন, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে যেমন 'কর্মবন্টন' অচল অর্থাৎ একদল খাবে আর অন্যদল ঘুমোবে, এটা যেমন মেনে নেয়া সম্ভব নয় বরং প্রতিটি মৌলিক প্রয়োজনে প্রত্যেকেই যেমন ব্যক্তিগত হিসসার দাবীদার; তদ্রূপ শরীয়তের বিধান পালন, জরুরী মাসায়েলের ইলম অর্জন, মোটামুটিভাবে দ্বীনের নোছরত এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার সামান্য কিছু মেহনত ইত্যাদি বিষয়গুলো জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি সকল মুসলমানের জন্যই একান্ত জরুরী।

দিল্লীতে মেওয়াতিদের অবস্থান

এ সমস্ত কারণে হযরত মাওলানা শহরবাসী মুসলমানদের জন্য তাঁর দাওয়াতি মেহনত অতিজরুরী ও অবশ্যকরণীয় মনে করতেন এবং অত্যন্ত জোরদারভাবে তাদের সামনে দাওয়াত পেশ করতে চাইতেন। কিন্তু উপায় ও কর্মপন্থা হিসাবে শুধু মুখের বক্তৃতা ও কলমের লেখাকে যথেষ্ট মনে করতেন

না বরং বাস্তব নমুনা ও প্রায়োগিক উদ্বোধন ছাড়া এটাকে ক্ষতিকর মনে করতেন। এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

বাস্তব নমুনা ছাড়া শুধু মিম্বরের বয়ান–বক্তৃতা সাধারণ মানুষকে আমলে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। বয়ানের পরে আমলে উদ্বুদ্ধকারী রূপরেখা ও কর্মসূচী না থাকলে বেআদবীপূর্ণ ও বেয়াড়া মন্তব্য করার অভ্যাস তৈরী হয়ে যাবে।

তাই তিন শহরভিত্তিক কাজের সূচনা হিসাবে দিল্লীসহ বড় বড় কেন্দ্রগুলোতে মেওয়াতি জামা'আত পাঠানো শুরু করলেন। দিল্লীতে জামা'আত দীর্ঘ সময় অবস্থান করা শুরু করলো। গোড়ার দিকে দিল্লীতে বিভিন্ন জামা'আতকে বড় তিক্ত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। রাতে মসজিদে থাকার অনুমতি দেয়া হতো না। কোন মসজিদে থাকার জায়গা হলেও 'প্রয়োজন' সারার ব্যাপারে খুবই কষ্ট হতো। স্থানীয় লোকেরা বিভিন্ন অভিযোগ ও গালমন্দ করতো। মেওয়াতিরা শহরের পরিবেশে এবং শহরবাসীদের শীতল আচরণে হতাশ হয়ে জামা'আতের যিম্মাদারদের কাছে নালিশ জানাতো। অধৈর্য প্রকাশ করতো। বেচারা যিম্মাদারগণ একদিকে মহল্লাবাসীকে খোশামোদ করে করে হয়রান হতো। অন্যদিকে আপন মেওয়াতি ভাইদেরকেও বুঝিয়ে সমঝিয়ে শান্ত করতো। এভাবে দোধারী জ্বালা যন্ত্রণায় তাদেরকে কাঠ–চেরা হতে হতো। কিন্তু এ ছিলো এক ব্যতিক্রমধর্মী জিহাদ ও অগ্নিপরীক্ষা, যা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাদের হিম্মত ও মনোবল গুঁড়িয়ে দিতে উদ্যত হতো। অবশ্য ধীরে ধীরে যাবতীয় কষ্ট ও প্রতিকূলতা দূর হয়ে গেলো। [১] মানুষের দৃষ্টি ও আচরণ বদলে গেলো এবং মেওয়াতিরা তাদের জোশ–জযবা, উদ্যম–স্পৃহা এবং ইখলাছ ও কোরবানীর কারণে ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠলো।

১। হযরত মাওলানা কয়েকবার উল্লেখ করেছেন যে, একদিন মিয়াঁজী দাউদ যিনি সাধারণতঃ মেওয়াতি ও শহরবাসীদের মাঝে যোগসূত্র রূপে কাজ করতেন। দোতরফা অভিযোগ, অনুযোগ ও শাকওয়া শেকায়েত শুনে শুনে নাজেহাল হলেন এবং আল্লাহর দরবারে প্রাণখুলে কাঁদলেন। হযরত মাওলানা বলতেন, তার এই রোনাযারির ফলে রাস্তা খুলে গেলো এবং কাজের মধ্যে খুব বরকত হলো।

ওলামায়ে কেরামের প্রতি মনোযোগ

স্বগত চিন্তায় মাওলানা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সতর্ক মনোযোগ ও পূর্ণ তত্ত্বাবধান ছাড়া এ অভিনব দাওয়াতি মেহনত ও নাযুক কর্ম প্রচেষ্টার নিরাপদ ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে খুব সূক্ষ্ম ও নাযুক বহু বিষয় বিবেচনায় রাখা জরুরী, যা হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, ওলামা মাশায়েখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দাওয়াতের প্রতি মনোযোগী হবেন এবং এর উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনে আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা কাজে লাগাবেন। এভাবে একদিন ইসলামের শুষ্ক বৃক্ষে সজীবতার ছোঁয়া লাগবে এবং প্রতিটি শাখা প্রশাখা সবুজ পাতায় ভরে উঠবে। ফলে ফুলে সুশোভিত হবে।

এ ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের কাছে তিনি বয়ান বক্তৃতার মৌখিক সহযোগিতাই শুধু চাচ্ছিলেন না। বরং এ যুগের ওলামায়ে কেরামের কাছে তাঁর আবদার ও চাহিদা ছিলো এই যে, তাঁরা তাদের প্রথম যুগীয় পূর্বসুরীদের অনুসরণে দ্বীন প্রসারের আমলী মেহনত মোজাহাদায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে হকের পয়গাম পৌঁছাবেন।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহম্মদ যাকারিয়া ছাহেবকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন–

কিছুদিন থেকে আমার নিজস্ব ধারণা এই যে, ইলম সাধনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ দ্বীন প্রসারের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ নিজেরা আওয়ামের দুয়ারে গিয়ে আওয়াজ না দিবেন এবং আওয়ামের মত এঁরাও গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে এ কাজের জন্য চলতা ফেরতা না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ পূর্ণতার শিখরে উপণীত হতে পারে না। কেননা আওয়ামের উপর একজন আলিমের কার্যকলাপের যে প্রভাব, তার ছিটেফোঁটাও অনলবর্ষী বক্তৃতা দ্বারা হতে পারে না। আমাদের মহান পুর্বসুরীদের জীবনেও এ দাওয়াতী বৈশিষ্ট্য বেশ সমুজ্জ্বল, যা আপনাদের ন্যায় ইলম সেবীদের অজানা নয়।

শিক্ষার সাথে জড়িত কিছু সংখ্যক মাননীয় ব্যক্তি, তাবলীগী মেহনতের

কারণে মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের ইলমী তরক্কী বাধাগ্রস্ত হবে বলে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু (প্রকৃত পক্ষে দ্বিধার কোন কারণই ছিলো না। কেননা) তিনি যেভাবে, যে রূপরেখায় মাদরাসার ওলামা ও ছাত্র সমাজ থেকে এ কাজ নিতে চাচ্ছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে তাদের ইলম চর্চায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভেরই এক স্বতন্ত্র ও কার্যকর ব্যবস্থা ছিলো। এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

ইলমী তরক্কীর পরিমাণ হিসাবেই এবং ইলমী তরক্কীর পথ ধরেই দ্বীনের তরক্কী হতে পারে। আমার এ আন্দোলন দ্বারা ইলম চর্চার গায়ে সামান্য আঁচড়ও যদি লাগে তাহলে আমার জন্য তা হবে ভয়ংকর ক্ষতি। তাবলীগী কাজ দ্বারা ইলমী তরক্কীর অভিলাষীদেরকে সামান্যতম বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং (আমি তো মনে করি যে,) এ ক্ষেত্রে আরো বেশী অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান অবস্থাও মোটেই যথেষ্ট নয়।

মাওলানার পরিকল্পনা ছিলো এই যে, (দাওয়াত ও তাবলীগকে উপলক্ষ করে) ছাত্ররা আপন শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানেই ইলমের হক আদায় করা এবং ইলম দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের উপকার করার মশক ও অনুশীলন করবে; যাতে তাদের অর্জিত ইলম মানুষের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস প্রমাণিত হয়। এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

কত না ভালো হতো যদি ছাত্র জীবনেই ওস্তাদের নেগরানিতে আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হতো! বস্তুতঃ ইলম তখনই শুধু আমাদের জন্য উপকারী হবে। কিন্তু আফসোস! ইলম আজ নিষ্ফল প্রমাণিত হচ্ছে এবং উল্টো অন্ধকার ও মুর্খতা ছড়াচ্ছে। ইন্না লিল্লাহ!

মোটকথা, হযরত মাওলানা তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের পয়গাম সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইলমী ও দ্বীনী হালকায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জামা'আতের রোখ দ্বীনী ও ইলমী মারকায অভিমুখী করে দিলেন।

দ্বীনী মারকাযে কাজের উছূল

মেওয়াতিদেরকে তিনি দেওবন্দ, সাহারানপুর, রায়পুর ও থানাবোন এলাকায় পাঠাতে শুরু করলেন। তাদের প্রতি মাওলানার হিদায়াত ও নির্দেশনা ছিলো এই যে, বুজুর্গানের মজলিসে তাবলীগ প্রসংগ উথাপন করবে না। পঞ্চাশ–ষাটজন মানুষ আশপাশের বস্তিগুলোতে গাশত করবে এবং অষ্টম দিনে কসবায় একত্রিত হবে। সেখান থেকে পুনরায় বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। বুজুর্গান ও মুরুব্বিয়ানের পক্ষ হতে জিজ্ঞাসা হলে কিছু আরয করবে। নিজে থেকে কিছু বলতে যাবে না।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহম্মদ যাকারিয়া ছাহেবকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

আমার একটি পুরোনো আকাঙক্ষা এই যে, তাবলীগী জামা'আতগুলো বিশেষ 'উছূলের' মাধ্যমে তরীকতের মাশায়েখগণের খিদমতে হাজিরা দিবে এবং খানকাহর যাবতীয় আদব বজায় রেখে সেখান থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েয হাছিল করবে। সেই সাথে নিয়ম শৃংখলাসহ নির্দিষ্ট সময়ে আশপাশের বস্তিতে তাবলীগী কাজও চালিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে 'ঐ আগত' লোকদের সাথে পরামর্শক্রমে কোন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে রাখুন। অধম বান্দা খুবই সম্ভব যে, চলতি সপ্তায় কতিপয় বিশিষ্ট লোক নিয়ে হাজির হবো। দেওবন্দ ও থানাবোনেরও ইচ্ছে আছে।

অন্তর্দর্শীগণের আশ্বস্তি

এই ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে অন্তর্দর্শী বহু বুজুর্গান কাজের ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হলেন এবং তাদের অন্তরের ঘনায়মান দ্বিধা সংশয় দূর হয়ে গেলো।

থানাবোনেও এ রকম সুফল দেখা দিলো। বিভিন্ন জামা'আত থানাবোনের আশপাশে কাজ শুরু করলো। সেখান থেকে আগত লোকেরা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)–এর খিদমতে জামা'আতের কারগুযারি, কাজের উছূল ও কর্মনীতি এবং জামা'আতের অবস্থান ও মেহনতের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে যে বরকত ও সুফল দেখা যাচ্ছিলো তা তুলে ধরতে লাগলেন। প্রথম দিকে মাওলানা থানবী (রহঃ) এ কারণে খুবই সন্দীহান ছিলেন যে, মাদরাসায় আট দশ বছরব্যাপী পূর্ণ দ্বীনী শিক্ষালাভকারী আলিমদের দাওয়াতী মেহনত যেখানে পুরোপুরি সফল হচ্ছে না; বরং শত শত নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সেক্ষেত্রে জাহেল মেওয়াতিরা দ্বীনী তালিম ও তারবিয়াত ছাড়া এত নাযুক ও স্পর্শকাতর দায়িত্ব কিভাবে আঞ্জাম দিবে? মাওলানা তাঁর দূরদর্শী ও

সতর্ক স্বভাবের কারণে খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, এর মাধ্যমে নতুন কোন ফেতনা আবার না মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কিন্তু মেওয়াতিদের ময়দানী কাজের বাস্তব ফলাফল, পরিপার্শ্ব থেকে প্রাপ্ত সন্তোষজনক খবরাখবর এবং পরবর্তীতে জামা'আতের গমনাগমনের বরকত ও সুফল স্বচক্ষে অবলোকন ইত্যাদি কারণে কাজের প্রতি তাঁর পূর্ণ ইতমিনান হলো। তাই কোন এক উপলক্ষে মাওলানা মুহম্মদ ইলিয়াছ ছাহেব যখন তাঁকে তাবলীগের কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলেন তখন মাওলানা থানবী (রহঃ) বললেন, যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা যুক্তি প্রমাণের উদ্দেশ্য তো কোন কিছুর যথার্থতা সাব্যস্ত করা। আমার তো বাস্তব কাজ দেখে ইতমিনান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন অন্য কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আপনি তো মাশাআল্লাহ হতাশার মাঝে আশার সঞ্চার করেছেন।

মাওলানা থানবী (রহঃ) এর অন্তরে আরেকটি খটকা ছিলো যে, ইলম ছাড়া তাবলীগের দায়িত্ব এরা কিভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে? কিন্তু মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব যখন বললেন, যে মুবাল্লিগরা নির্ধারিত কথাই শুধু বলা কওয়া করে। এর বাইরে অন্য কিছু বলে না। অন্য কোন বিষয়ে নিজেদেরকে জড়ায় না; তখন তিনি অধিকতর আশ্বস্ত হলেন।

মাওলানার আবেগ ও প্রত্যয় এবং ওলামায়ে কেরামের স্বল্প মনোযোগিতা

নিজের কাজ ও চিন্তার উপর হযরত মাওলানার বিশ্বাস ও প্রত্যয় অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিলো এবং আবেগ উদ্দীপনার কূল উপচে পড়ছিলো। কিন্তু কাজের প্রতি দেশের 'আহলে ইলম' – এর যথাযোগ্য মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারছেন না বলে তাঁর অন্তরে সর্বদা একটা উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা বিরাজ করতো। এ বিশ্বাস ও প্রত্যয় তাঁর উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিলো যে, সময়ের সকল ফেতনার প্রতিকার এবং যুগের সকল চাহিদার জবাব এই দ্বীনী মেহনতের মাঝেই নিহিত। উম্মতের মাঝে যখনই নতুন কোন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো তাঁর হৃদয়ের এ আবেগোচ্ছ্বাস মুখে ও কলমে তখন জোরদার ভাষা লাভ করতো। এ ধরনেরই কোন এক প্রসংগে এক দ্বীনী মাদরাসার যিম্মাদারকে মাওলানা লিখেছেন–

কোন্ শক্তিবলে আমি আপনাদের বোঝাবো? এবং কোন্ ভাষায় আমি কথা বলবো? কিংবা কোন্ মন্ত্রবলে আমি আমার মনমস্তিষ্কে অন্য কিছু বদ্ধমূল করবো কিংবা নিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধকে অনিশ্চিত এবং অনিশ্চিতকে নিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধ কিভাবে বানাবো? এ সকল ফেতনার সর্বপ্লাবী ঢল রোধ করার জন্য কোন সেকেন্দরীবাঁধ [১] যদি থেকে থাকে তবে তা হলো আমার এই দাওয়াতী আন্দোলন। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, আমার এ আন্দোলনে পূর্ণ উদ্যম ও কর্মশক্তি, পূর্ণ আবেগ ও প্রাণ চাঞ্চল্য এবং পূর্ণ হিম্মত ও মনোবলের সাথে, অত্যন্ত জোরদারভাবে আত্মনিয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। গায়বী ইশারায় এ দাওয়াতী আন্দোলনের পথ ও পন্থা উদ্ভাসিত হয়ে যাওয়াই হলো বর্তমান ব্যাধির অব্যর্থ চিকিৎসা। কুদরতের চিরন্তন নিয়ম এই যে, ব্যাধির উপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি মানুষের হাতে তিনি তুলে দিয়ে থাকেন। তবে আল্লাহর দেয়া চিকিৎসা ও নিয়ামতকে কদর ও সমাদরের সাথে গ্রহণ না করার ফল তেমন ভালো হয়ে থাকে না।

এ বিশ্বাস ও প্রত্যয়, এ দরদ ও ব্যথা এবং এ আশংকা ও উৎকণ্ঠাকেই অন্য এক পত্রে তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন–

দোজাহানের অপদার্থ, হাকীর, ফকীর বান্দা মুহম্মদ ইলিয়াসের পক্ষ হতে (আল্লাহ তাকে মাগফেরাত করুন)।

আল্লাহর প্রশংসা, যার ক্ষমতা ও মহিমাগুণে সৎকর্ম সম্পন্ন হয়। হে আল্লাহ! তোমারই সকৃতজ্ঞ প্রশংসা এবং তোমারই প্রতি অনুগ্রহজাত কৃতার্থতা।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

এ মুহূর্তে যে অশেষ যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থায় আপনাকে পত্র লিখছি তা কোন্ ভাষায় আমি আপনার কাছে প্রকাশ করবো?

আমার প্রিয় বন্ধু! কথা এই যে, এ দাওয়াতী মেহনত নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পর আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি এবং দান ও অনুগ্রহের অভাবনীয় প্রাচুর্য যতই

১। ইয়াজুজ মাজুজকে রোধ করার জন্য হযরত যুলক্বরনাইন (সেকেন্দর) যে বাঁধ দিয়েছিলেন। রূপক অর্থে সুদৃঢ় প্রাচীর।

আমার নযরে আসছে, অন্তরে ততই ভয় জাগছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত এত বড় মেহমানের যথাযোগ্য আদর ও সমাদর না হওয়ার কারণে তা আমাদের ক্ষতি, বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

তবে এ যন্ত্রণা কাতরতা ছিলো মাওলানার একান্ত নিজস্ব। এটা ছিলো তার এক অন্তর্দাহ। ভিতরে ভিতরে তিনি দগ্ধ হতেন। কিন্তু মুখের ভাষায় কোন 'অনুযোগ' যথাসম্ভব প্রকাশ হতে দিতেন না। কাউকে দোষারোপ করা ছিলো তাঁর নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। বরং কোন অ–আলিম যদি ওলামায়ে কেরামের নির্লিপ্ততার অভিযোগ করতো তখন তিনি তাদের এই বলে থামিয়ে দিতেন যে, এ কাজের জন্য তোমরা যখন নিজেদের কর্মব্যস্ততা ও পছন্দের জিনিস ছাড়তে পার না অথচ তোমরাই সেগুলোকে দুনিয়াদারি বলে স্বীকার করো তখন তাঁরা তাদের ঐ সমস্ত পছন্দ ও ব্যস্ততা কিভাবে ত্যাগ করতে পারেন যেগুলোকে তারা দ্বীনী ব্যস্ততা মনে করেন এবং যথার্থই মনে করেন। তোমরা যদি দোকান ছেড়ে না আসতে পারো তবে তাঁদের কাছে মাদরাসার মসনদ ছেড়ে আসা কিভাবে আশা করো এবং এ ব্যাপারে তোমাদের মনে অভিযোগ কেন আসে?

অমনোযোগ ও নির্লিপ্ততার কারণ

এ দাওয়াতের প্রতি ওলামায়ে কেরামের পূর্ণ মনোযোগ প্রদান সম্ভব না হওয়ার কয়েকটি কারণ ছিলো।

প্রথমতঃ তখন যুগটা ছিলো সাধারণ আন্দোলনের যুগ। মানুষের মনমগজ তখন তাতেই আচ্ছন্ন ছিলো। শোরগোল ও ডামাডোলসর্বস্ব আন্দোলনের সেই যুগে মাওলানার নিরব ও গঠনমূলক আন্দোলনের প্রতি মনোযোগী হওয়া মুশকিল ছিলো। তাছাড়া আন্দোলনের সাধারণ ধারণা এবং এ সম্পর্কিত অব্যাহত তিক্ত অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে বিশেষ সুধারণা পোষণে সহায়ক ছিলোনা।

দ্বিতীয়তঃ এ কাজ সম্পর্কে মানুষের জানাশোনাও ছিলো খুব অপ্রতুল। একান্ত আপনজন ছাড়া সাধারণ আলিমদের, বিশেষতঃ দূরবর্তীদের এ সম্পর্কে কিছুই জানা ছিলো না। কাজের পরিচিতি ও ফলাফল প্রচারের কোন ব্যবস্থাও ছিলো না।

তৃতীয়তঃ দাওয়াতের সাধারণ পরিচিতিমূলক তাবলীগ শব্দটিও আন্দোলনের গভীরতা ও মূলতত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে বেশ বড় প্রতিবন্ধক ছিলো। সাদামাটা একটি তাবলীগী মেহনত মনে করে মানুষ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতো না। কিংবা ফরযে কেফায়া মনে করে নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত ভাবতো।

চতুর্থতঃ আলিম সমাজে দাওয়াত তুলে ধরার জন্য মাওলানাই শুধু ছিলেন কথা বলার মানুষ। কিন্তু তার নিজের অবস্থা ছিলো এই যে, চিন্তার জোয়ার ও বক্তব্যের উচ্ছ্বাস কিছুটা বাকজড়তায় বাধাগ্রস্ত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথা আগোছালো করে দিতো। ফলে বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যেতো। এমনকি কখনো কখনো তা নবাগতদের চিন্তাবিক্ষেপ ও অপরিচয়বোধের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। ফলে আন্দোলনের অন্তর্নিহিত মর্ম তারা বুঝে উঠতে পারতেন না। তাছাড়া কিছু বক্তব্য এতো উচ্চাংগের হতো যা সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে এবং পরিচিত কিতাবপত্রে পাওয়া যেতো না। তদুপরি সেগুলো তিনি পরিভাষা বর্জিত একান্ত সাদামাটা ভাষায় প্রকাশ করতেন। যার কারণে প্রথম মজলিসে বহু ওলামায়ে কেরামেরই মুনাসাবাত ও হৃদয়ঙ্গমতা অর্জিত হতো না। আবার বেশী সময় দেয়াও তাঁদের পক্ষে মুশকিল ছিলো।

পঞ্চমতঃ মানুষ সাদাসিধা মেওয়াতিদের দেখে মাওলানা সম্পর্কে কোন উঁচু ধারণা গ্রহণ করতে পারতো না। তারা মনে করতো, মাওলানা হলেন সাদাসিধা মেওয়াতিদের সাদাসিধা বুজুর্গ; যিনি মেওয়াতের অন্ধকার সমাজে দ্বীনের আলো জ্বেলেছেন এবং মেওয়াতিদের মুর্দা দিলে এক নতুন জযবা সৃষ্টি করেছেন।

তবে দাওয়াতের প্রতি এই অমনোযোগ ও শীতল মনোভাব এক হিসাবে কিন্তু ভালই হয়েছিলো। কেননা এর ফলে একটি 'শিশু' আন্দোলন অপরিচয় ও অখ্যাতির নিরাপদ বেষ্টনীতে থেকে তার স্বাভাবিক পুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলো। বস্তুতঃ সময়ের পূর্বে সাধারণ দৃষ্টি এদিকে যেন নিবদ্ধ না হয় সেজন্য সম্ভবতঃ আল্লাহ বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

হৃদয় জ্বালার বহিঃপ্রকাশ

কিন্তু তাঁর স্বভাবের উচ্ছল ঝর্ণাধারা এখন দু' কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হওয়ার

হওয়ার জন্য অস্থির ছিলো। স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির দিক থেকে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার লাভের 'যথা সময়' এসে গিয়েছিলো। বহুদিন থেকে অদৃশ্যলোকের এ নিঃশব্দ বাণীও কবির ভাষায় যেন প্রকাশ পাচ্ছিলো।

ভারতীয় পানশালার একদা জমজমাট জলসা শতবর্ষ থেকে বিরান। এখন তো সময় হয়েছে হে সাকী! বয়ে যাক না তোমার সুরার নতুন ফোয়ারা।

এদিকে মাওলানার অন্তরে দাওয়াতের প্রবল তাড়না ছিলো ক্রমবর্ধমান। যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে চলছিলো ভাব ও তত্ত্বজ্ঞানের নিরন্তর উদ্ভব। দাওয়াতি কর্মসূচীর নতুন নতুন দিকদর্শন সামনে আসছিলো; যার উৎসমূল কোরআন সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে ছাহাবায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো। অন্যদিকে এ সকল উচ্চ ভাব ও তত্ত্বজ্ঞান ধারণ করার জন্য মাওলানারই হাতে গড়া দু' চারজন নবীন আলিম ছিলেন। আর ছিলো শুধু সাধারণ মেওয়াতি দল, যারা তাঁর (শরীয়ত ও তরীকতের সূক্ষ্ম পরিভাষাপুর্ণ) একাডেমিক ভাষার সাথে পরিচিত ছিলো না। পরিবেশ যদি তখন জীবন্ত ও সবাক হতো তাহলে হয়ত কবির ভাষায় বলে উঠতো–

এ অভাগা মজলুম হলো মরুভূমির নিঃসংগ ফুল। কিংবা ভরা মাহফিলের গলেগলে পড়া মোম–প্রদীপ। রাতের নিঃসংগ প্রহরে একা একা জ্বলার কী জ্বালা! হায়, আমার একটি পতংগও 'নিবেদিত' নয়। আমার কথা, আমার ব্যথা বুঝবে এমন দরদী বন্ধুর প্রতিক্ষা আর কতকাল! আমার মর্মব্যথীর সন্ধানে পথে পথে ঘুরবো আর কতকাল। এ পৃথিবীতে হে আল্লাহ! আমার নাদীম [১] কোথায়! হৃদয়ের সিনাই পাহাড়ে আমার কালীম [২] কোথায়!

মেওয়াতিরা যদিও মাওলানার গভীর ও সুক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান–এর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরিচিত ছিলো না; কিন্তু তাঁর দাওয়াতি আমলের সাথে তাদের সুগভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিলো। দ্বীনী উদ্যম ও কর্মশক্তিতে শহরবাসীদের

১। নাদীম অর্থ পান জলসার সংগী। রূপক অর্থে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

২। কালীম অর্থ কথোপকথনকারী। হযরত মুসা (আঃ) সিনাই পর্বতের তূর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন বলে তাকে কালীমুল্লাহ বলা হয়।

তুলনায় তারা অনেক অগ্রসর ছিলো। বস্তুতঃ তারা ছিলো হযরত মাওলানার পনের বিশ বছরের লাগাতার সাধনা ও মেহনত মোজাহাদার নির্যাস এবং আন্দোলনের মূল পুঁজি। এ বাস্তবতা সম্পর্কে মাওলানা পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি তা স্বীকার করেছেন। কতিপয় মেওয়াতি ভক্ত অনুরাগীকে এক পত্রে তিনি তার মনের কথা এভাবে লিখেছেন–

তোমাদের এই মেওয়াতি জনগোষ্ঠীর পিছনে আমি আমার সব শক্তি ও কর্মোদ্যম নিঃশেষ করে ফেলেছি। এখন তোমাদেরকে কোরবান করা ছাড়া আর কোন পুঁজি আমার হাতে নেই। সুতরাং আমার কাজে সহায়তা করো। অন্য এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

দুনিয়ার কায়কারবারে ব্যস্ত থাকার লোক অনেক আছে। কিন্তু দ্বীনের তরক্কীর জন্য ঘরবাড়ী ছাড়ার সৌভাগ্য এ যুগে আল্লাহ মেওয়াতিদের নছীব করেছেন।

সাহারানপুরে তাবলীগী কাজের ধারাবাহিকতা

সাহারানপুরের দ্বীনী ও ইলমী কেন্দ্রগুলোকে হযরত মাওলানা উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং সেখানকার আলিম ওলামা, দ্বীনদার শ্রেণী ও সাধারণ মুসলমানদেরকে তিনি তাঁর দাওয়াতি কাজে বেশীর চেয়ে বেশী সক্রিয় দেখতে চাচ্ছিলেন। তাই মৌখিক দাওয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে তিনি বরাবর উদ্বুদ্ধ করে যেতেন। তাছাড়া মাযাহেরুল উলুম মাদরাসার ওলামা মাশায়েখগণ ব্যক্তিগতভাবে মাওলানার অতিপরিচিত ও অন্তরংগ ছিলেন। মেওয়াতের তাবলীগী জলসাগুলোতে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব ও মাদরাসার নাযিম (ব্যবস্থাপক)মাওলানা হাফেয আব্দুল লতীফ ছাহেবসহ অন্যান্য আসাতিযা কেরাম নিয়মিত শরীক হতেন এবং মাওলানার অনুরোধে সব সময় নিযামুদ্দীনেও হাজির হতেন। কিন্তু এখন কাজের পরিমাণ ও প্রকৃতি বাড়ানোর লক্ষ্যে মাওলানা তাবলীগী জামা'আতের রোখ বিশেষভাবে সাহারানপুরের দিকে করে দিলেন।

সাহারানপুর ও মুযাফফারনগর অঞ্চলে তাবলীগী সফর

মাযাহেরুল উলুম মাদরাসার শিক্ষকগণকে সাথে করে সাহারানপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকা ভাট, মির্যাপুর, সেলিমপুর ইত্যাদি গ্রাম ও বস্তিগুলোতে মাওলানা বেশ কিছু তাবলীগী সফর ও জলসা করলেন।

৫৬ হিজরীর ১৩ থেকে ২০শে জুমাদাছ–ছানী পর্যন্ত কান্ধলার আশেপাশের গ্রামগুলোতে সফর করে বিভিন্ন জামা'আত তৈরী করলেন। শায়খুল হাদীছ ছাহেবও এ সময় তাঁর সফরসংগী ছিলেন। এ সফরে মাওলানার চিন্তা চেতনায় স্বদেশের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রবল রূপ ধারণ করেছিলো। আর তিনি মনে করতেন; দাওয়াত ও তাবলীগের তোহফা পেশ করা ছাড়া স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর হক আদায় করার উত্তম আর কোন পন্থা হতে পারে না।

৫৯ হিজরীতে সিদ্ধান্ত হলো যে, সাহারানপুরে মেওয়াতি জামা'আতের নিয়মিত উপস্থিতি আবশ্যক। সুতরাং এক জামা'আতের বিদায় হওয়া মাত্র দ্বিতীয় জামা'আতের আগমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এক বছর পর্যন্ত মাদরাসা ভবনেই জামা'আত অবস্থান করতো। ৬০ হিজরীর মুহররম মাসে এ উদ্দেশ্যে আলাদা ঘর ভাড়া নেয়া হলো। কিন্তু কয়েক মাস পরেই অনিবার্য কারণবশতঃ ঘর ছেড়ে দিতে হলো। যাই হোক ৬২ হিজরী পর্যন্ত লাগাতার চারবছর এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলো। এ সমস্ত এলাকা যেহেতু ইলমী ও দ্বীনী ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর ছিলো তাই দেহাতের অশিক্ষিত মেওয়াতিদেরকে এখানে মাঝে মধ্যেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতো। মানুষ এই বলে তাজ্জব প্রকাশ করতো যে, বে–এলেম মেওয়াতিরা নিজেরাই তো তাবলীগ ও তারবিয়াতের মুখাপেক্ষী, তাদেরকে আবার কিভাবে এ কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু হযরত মাওলানার মতে অন্যের ইছলাহ ও সংশোধন আসলে তাদের বিষয়ই নয়। এক পত্রে তিনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন–

এই মেওয়াতিদেরকে মুছলিহ ও সংশোধনকারী মনে করা উচিত নয়। দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বের হওয়া–এই একটি বিষয় তো তাদের কাছ থেকে শিখুন আর সব বিষয় তাদেরকে শিক্ষা দিন। অথচ নিজেদের চিন্তায় তাদেরকে মুছলিহ (ও সংশোধনকারী) ধরে নিয়ে পরে সেই ভিত্তিতে সমালোচনা করা হচ্ছে।

বাইরের জনসমাগম

৫৮/৫৯ হিজরীর দিকে পত্র–পত্রিকায় কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুবাদে মেওয়াত ও দিল্লীর বাইরে দাওয়াত ও তাবলীগের এতটা চর্চা শুরু হলো যে, যারা এ ধরনের কিংবা অস্পষ্ট কোন ধরনের দ্বীনী কাজের সন্ধানী ছিলেন তারা হযরত মাওলানার যিয়ারত এবং মেওয়াতের সুরতে হাল স্বচক্ষে অবলোকনের উদ্দেশ্যে দূর দূরান্ত থেকে সফর করে হাজির হলেন। এ সৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার কতিপয় মুদাররিসও ছিলেন। তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা আরো কিছু লোককে আকৃষ্ট করলো। কোন কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তি এটাকে এক 'আবিষ্কার' আখ্যায়িত করে বললেন, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এত দীর্ঘকাল এমন অজ্ঞাতভাবে এ কাজ হতে পারলো কিভাবে!

হযরত মাওলানা তাঁর স্বভাববিনয় অনুযায়ী নবাগতদেরকে কৃতার্থচিত্তে ও সাদরে গ্রহণ করলেন। দ্বীনী শিক্ষাংগণগুলোর মনোযোগও আকৃষ্টি হতে লাগলো এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আসতে শুরু করলো। মাওলানা নবাগত মেহমানদের এমনই ইকরাম করলেন যে, তারাও অবিভূত হয়ে পড়লো এবং কাজের সংস্পর্শে আসার জন্য তা সহায়ক হলো।

দিল্লীর কাজের ব্যবস্থাপনা

দিল্লীর কাজকে সুশৃংখল ও উন্নত রূপ দানের জন্য জনাব হাফেজ মকবুল হোসায়নকে দিল্লী শহরের সমস্ত জামা'আতের আমীর ও যিম্মাদার নিযুক্ত করা হলো। হাফেজ ছাহেব ও জনাব ফখরুদ্দীন ছাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জামা'আতগুলোর কর্মকাণ্ড অধিকতর সুশৃংখল ও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হলো।

যিম্মাদারদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ এবং কাজের মাঝে গতি ও প্রাণ সঞ্চার করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নিযামুদ্দীনে রাত্রি যাপন, মাসের শেষ বুধবার জামে মসজিদে সমস্ত জামা'আতের সমাবেশ ও কারগুযারি শ্রবণ এবং পরামর্শের মাধ্যমে আগামী কর্মসূচী নির্ধারণ–এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। হযরত মাওলানা নিজেও তাতে শরীক থাকার খুব ইহতিমাম করতেন এবং ওলামা কেরামকেও শরীক করার চেষ্টা করতেন। বৃহস্পতিবার নিযামুদ্দীনে রাত

যাপনের জন্য সকলকে আম দাওয়াত দিতেন। সেখানে কয়েকবার যারা রাত যাপন করতো এ কাজের সাথে তাদের সাধারণতঃ এক আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যেতো। রাতের খাবার অধিকাংশ সময় একত্রেই খাওয়া হতো। এশার নামাযের আগে ও পরে মাওলানা তাঁর নিজস্ব বিষয়ে আলোচনা করে যেতেন। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাদান দীর্ঘক্ষণ অব্যাহত থাকতো। কখনো আবেগোদ্দীপ্ত ভাষায় বয়ান করতেন। কখনো এমন তন্ময় ও আত্মনিমগ্ন হতেন যে, সময়ের অনুভূতি লোপ পেয়ে যেতো। ফলে এশার নামায বেশ বিলম্বিত হয়ে যেতো। নভেম্বরের কোন এক রাতে এশার নামাযে একবার ঘড়ির কাঁটায় বারটা বেজে গেলো। বাদ ফজর সাধারণতঃ মাওলানা নিজেই বয়ান রাখতেন। কখনো উপস্থিত কোন আস্থাভাজন আলেমকে মুখপাত্র রূপে বক্তব্য রাখার আদেশ দিতেন। 'রাত্রে ছিলেন না' এমন কিছু লোকও ফজরের নামাযে এসে যেতেন। সাধারণতঃ নয়া দিল্লীর কিছু বিশিষ্ট মানুষ, আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং জামেয়া মিল্লিয়ার কোন কোন শিক্ষক, বিশেষতঃ ডঃ জাকির হোসায়ন খান এ সময় শরীক হতেন। রাত্রের মজমায় উপস্থিতির সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ফলে একদিকে দাওয়াতকর্মীদের মাঝে নব উদ্যম ও প্রাণ সজীবতা আসছিলো। অন্যদিকে কাজের সাথে নবাগতদের নিবিড় পরিচয় ও সখ্যতা গড়ে উঠছিলো।

দিল্লীর ব্যবসায়ী মহলে জাগরণ

দিল্লীর ব্যবসায়ীগণ হযরত মাওলানার সাথে অতিগভীর সম্পর্ক রক্ষা করতেন। প্রবীন ও বয়স্কদের আসা যাওয়া ও ভক্তি ভালবাসা তো ছিলো মাওলানার মরহুম আব্বা ও ভাই ছাহেবের আমল থেকেই। তাদের বর্তমান প্রজন্মও উত্তরাধিকার সূত্রে এ 'সম্পর্ক' লাভ করেছিলো। তাছাড়া নতুন সম্পর্কও গড়ে উঠেছিলো বহু যুবক ব্যবসায়ীর। বস্তুতঃ মাওলানার ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং মাওলানার সেবা ও আনুগত্যের সৌভাগ্য লাভের ক্ষেত্রে গরীব মেওয়াতিদের পরেই ছিলো দিল্লীর ধনী ব্যবসায়ী মহলের স্থান।

বিভিন্ন সময়ের হাজিরি ছাড়াও বৃহস্পতিবারে মাওলানার খিদমতে রাত্রি যাপন ছিলো তাদের নিয়মিত আমল। মেওয়াতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জলসায় বাস বোঝাই করে (কাঁচা কিংবা রান্না করা) খাবার দাবার সংগে নিয়ে তারা হাজির

হতেন এবং মেওয়াতি জামা'আতের সাথে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় গাশতে যেতেন।

মাওলানাও গভীর স্নেহ ও ভালবাসার টানে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তবে নিজস্ব মিশন ও বক্তব্য কখনো বিস্মৃত হতেন না। নবীনদের প্রতি সন্তানতুল্য স্নেহ প্রকাশ করতেন। তাদের খুশিতে খুশি এবং দুঃখে দুঃখী হতেন। তবে তারবিয়াত ও সংশোধন চেষ্টায় কোন শিথিলতা ছিলো না। বরং সব সময় তাদেরকে দুনিয়ার ব্যবসা থেকে আখেরাতের ব্যবসায় লাগানোর ফিকির রাখতেন। পক্ষান্তরে প্রবীনদের (বিশেষতঃ মরহুম আব্বা ও বড় ভাইয়ের সম্পর্কিতদের) সাথে অতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। কিন্তু তাবলীগী দায়িত্বে অবহেলা বা ত্রুটি হলে সম্পর্কের দাবীতে তিরস্কার করতেন। আর তারাও ভক্তিশ্রদ্ধার টানে অম্লান বদনে তা মেনে নিতেন। এ কারণে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় হতো না।

দাওয়াতি কাজের সম্পর্ক এবং দ্বীনদার ও ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শ; সর্বোপরি হযরত মাওলানার খেদমতে যাতায়াত ও মুহব্বতপূর্ণ তা'আল্লুকের বরকতে দিল্লীর ব্যবসায়ী মহলে অশেষ দ্বীনী তরক্কী হতে লাগলো এবং তাদের জীবন ও সমাজ, পরিবার ও সংসার এবং লেনদেন ও আচার ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন শুরু হলো। শরীয়তের গৌণ ও বিশদ বিষয়ের অবতারণা হযরত মাওলানা খুব কমই করতেন। কিন্তু সাধারণ দ্বীনী জাগরণ ও ধর্মীয় চেতনা লাভের কারণে দ্বীন ও দ্বীনী বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা এবং শরীয়তের আহকাম ও বিধানের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে জাগ্রত হয়েছিলো এবং দ্বীনী পরিবেশ ও দ্বীনদার মহলের সাথে একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হয়েছিলো। এক কথায় إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (তোমরা মুত্তাকী হলে আল্লাহ তোমাদেরকে স্বকীয়তা দান করবেন) আয়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে নিজেদের ব্যবসায়ী মহলেও চেহারায় চরিত্রে তারা এমন বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন যে, মাওলানার সম্পর্কিত এবং দাওয়াতের নিবেদিত কর্মীরূপে সহজেই চিহ্নিত হতেন। এমন কি দোকানে দাড়ীওয়ালা নামাযী কর্মচারী রাখা যাদের পছন্দ ছিলো না তারা নিজেরাই দাড়ী রাখা শুরু করলেন এবং কারবারী ব্যস্ততার মুহূর্তেও দোকান ছেড়ে নামাযের জামা'আতে এবং তাবলীগী গাশতে শরীক

হতে লাগলেন। গাড়ী ছাড়া চলা এবং নিজের হাতে বাজার বহন করাও যাদের জন্য অকল্পনীয় ছিলো, এখন মাটিতে বিছানা পেতে শোয়া, সাথীদের হাত পা দাবানো, নিজ হাতে রান্না করা, গরীবের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দাওয়াত দেয়া ইত্যাদি কোন কাজেই তাদের আর লজ্জা সংকোচ থাকলো না। মোটকথা, পরিবেশ ও চিন্তার পরিবর্তনের ফলে কত না মানুষের গোটা জীবন ধারাতেই আমূল পরিবর্তন এসে গেলো!

বিত্তশালীদের অংশগ্রহণ ও মাওলানার নীতি

দিল্লী ও অন্যান্য এলাকার বিত্তশালী ও দানশীল লোকেরা কাজের সুখ্যাতি শুনে এবং ব্যয়বহুলতা অনুমান করে হযরত মাওলানার খিদমতে বারবার মোটা মোটা অংকের আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব উসূল ও নীতি ছিলো এই যে, অর্থ ও বিত্তকে কখনো তিনি সময় ও ব্যক্তির বিকল্প মনে করতেন না। কেননা টাকা পয়সা হলো হাতের ময়লা। সুতরাং তা মানুষের মতো দামী জিনিসের স্থলবর্তী হতে পারে না। তাই আর্থিক সহায়তা দানের প্রয়াসী ও প্রত্যাশী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সব সময় তিনি বলতেন, তোমাদের অর্থের প্রয়োজন নেই আমার। প্রয়োজন তোমাদের সময়ের। মোটকথা; দাওয়াতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের অর্থ সাহায্যই শুধু তিনি গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ আগে জানের কোরবানী তারপর মালের কোরবানী– এই ছিলো তাঁর নীতি। তিনি বলতেন, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার এটাই হলো সঠিক তরতীব এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনুসৃত পন্থা। সে যুগে আল্লাহর দ্বীনের কাজে তাঁরাই মাল খরচ করতেন এবং মালী–কোরবানীর ইতিহাসে তাঁদেরই নাম শীর্ষ তালিকায় দেখা যায়; ইসলামের আমলী খিদমত ও জানী–কোরবানীর ক্ষেত্রেও যারা পয়লা কাতারে ছিলেন।

মোটকথা, দ্বীনী জাগরণের এই মেহনত মুজাহাদায় যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন এবং যাদের ইখলাছ ও আন্তরিকতায় মাওলানার পূর্ণ ইতমিনান ও আস্থা ছিলো তাদের অর্থ সাহায্য নিঃসংকোচে তিনি গ্রহণ করতেন এবং সানন্দে দ্বীনী খিদমতের সৌভাগ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। এ প্রসংগে সদর বাজারের হাজী নাযীম ও মুহম্মদ শফী কোরায়শীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের সাথে মাওলানার কোন রকম দূরত্ববোধ বা লৌকিকতা

ছিলো না। বিভিন্ন দ্বীনী প্রয়োজনে তাদের মাল আসবাব খুশি মনেই তিনি ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া আরো কয়েকজন মুখলিছ সাথীর ক্ষেত্রে মাওলানার অনুরূপ আচরণ ছিলো।

মেওয়াতের বিভিন্ন জলসা

প্রায় প্রতি মাসে একবার মেওয়াতের কোন না কোন স্থানে এবং বছরে একবার 'নূহ' 'অঞ্চলস্থ মাদরাসায় তাবলীগী জলসা হতো। দিল্লীর তাবলীগী জামা'আত, ব্যবসায়ী দল, নিযামুদ্দীনে অবস্থানকারী যিম্মাদারগণ এবং মাযাহেরুল উলুম, দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা ও দিল্লী ফতেহপুর মাদরাসার কতিপয় আলিম ও শিক্ষক তাতে অংশগ্রহণ করতেন। মাওলানা বিশিষ্ট তাবলীগী সাথীদের নিয়ে জলসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। সফরের সারা পথ আন্দোলনের দাওয়াত দিয়ে যেতেন এবং দাওয়াতের আদব ও নিয়মনীতি সম্পর্কে আবেগপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তব্য রাখতেন। বাস বা ট্রেনের যাত্রীরা (যাদের অধিকাংশই হতেন সফরসংগী মুবাল্লিগ) মাওলানার বয়ানে অশেষ উপকৃত হতেন। এ যেন ছিলো এক ভ্রাম্যমান জলসা, যা নিযামুদ্দীন থেকে শুরু হয়ে মেওয়াতে গিয়ে শেষ হতো।

মেওয়াতি কসবার লোকেরা মাওলানার শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দলে দলে বেরিয়ে আসতো এবং মুছাফাহার জন্য পতঙ্গদলের মতো ঘিরে ধরতো। মাওলানা সওয়ারীতে বসা অবস্থায় মুছাফা করতেন। এভাবে সওয়ারী ঘিরে শিশু যুবক বৃদ্ধের বিরাট মাজমা কসবায় প্রবেশ করতো। তখন আরো অসংখ্য মানুষ এসে যোগ দিতো। মাওলানা অপরিসীম ধৈর্যের সাথে প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা মুছাফাহা করতেন। কারো সাথে আলিংগনাবদ্ধ হতেন। কারো মাথায় হাত রাখতেন এবং তাদের হালকায় সাধারণভাবে বসে আলাপ শুরু করে দিতেন। এ সময় মাওলানা গরীব মেওয়াতিদের মাঝেই অবস্থান করতেন। রাত্রে সাধারণতঃ মসজিদের কোন কামরায় কিংবা চত্বরে আরাম করতেন। সারাদিন এবং রাত্রের সিংহভাগ মেওয়াতিদের সাথে আলাপ আলোচনায়ই কেটে যেতো। মেওয়াতে পদার্পণ করামাত্র মাওলানার উদ্যম উদ্দীপনা ও হৃদয়ের সজীবতা বহুগুণ বেড়ে যেতো।. কথাবার্তায় ইলম ও মারিফাতের মোষলধারে বৃষ্টি যেন বর্ষিত

হতো। দ্বীনের উছূল ও হাকীকত এবং নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যজ্ঞানের ঝর্ণাধারা যেন উৎসারিত হতো।

সরলপ্রাণ মেওয়াতিরা বুঝুক, না বুঝুক প্রভাবিত ও অবিভূত অবশ্যই হতো। মেওয়াতে অবস্থানকালে নিরবতা অবলম্বন এবং বিশ্রাম গ্রহণ দু'টোই মাওলানার খুব কম হতো। তাবলীগী আলোচনা ও দাওয়াতি মেহনত–এই হতো তার দিন রাতের মশগলা। ফল এই দাঁড়াতো যে, মেওয়াত সফরের পর সীমাহীন ক্লান্তিতে তিনি ভেংগে পড়তেন। প্রায়ই গলা বসে যেতো। এমনও হয়েছে যে, জ্বর নিয়ে তিনি মেওয়াত থেকে ফিরেছেন।

এ সকল তাবলীগী ইজতেমার সময় এমন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হতো এবং এমন নূর ও তাজাল্লীর উদ্ভাস হতো যে, পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্রতা ও স্নিগ্ধতার পরশ অনুভব করতো। যিকিরের সুমধুর গুঞ্জরণে পরিবেশ মুখরিত হতো এবং যাকিরীনের সমাগমে সকল মসজিদ গমগম করতো। মুছল্লীদের এমন ঢল নামতো যে, সড়কে–রাস্তায় কাতার চলে যেতো এবং সামান্য বিলম্বেই মসজিদে জায়গা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়তো। শেষ রাতের দৃশ্য তো চোখ–চেয়ে দেখার মতই হতো। শীতের মৌসুমে কষ্টসহিষ্ণু ও দ্বীন পিপাসু মেওয়াতিরা মসজিদের চত্বরে খোলা আকাশের নীচে কিংবা গাছ তলায় সুতির চাদর ও কম্বল গায়ে দিয়ে পড়ে থাকতো। শীতের বৃষ্টিতে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরা শামিয়ানার নীচে বা গাছের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টা স্থির প্রশান্তির সাথে বসে থেকে তারা ওলামায়ে কেরামের ওয়াজ শুনে যেতো। স্ব–স্ব স্থান থেকে সামান্য নড়া চড়াও করতো না কেউ।

এ সকল ইজতিমায় ওয়াজ–বয়ান ছিলো একান্তই গৌণ বিষয়। আসল উদ্দেশ্য ও মূল চেষ্টা ছিলো নতুন নতুন জামা'আত তৈরী করে আল্লাহর রাস্তায় বের করা। সুতরাং বাইরের এলাকায় এবং ইউ, পিতে গাশতের জন্য তৈরী জামা'আতের সংখ্যা এবং নাম লেখানো মানুষের হিসাব ও সময়ের পরিমাণ–এগুলোই ছিলো ইজতিমার কামিয়াবির মাপকাঠি। হযরত মাওলানা বরাবর এ তাগাদাই দিতে থাকতেন এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকেই গোটা মজমার নেগরানি করতেন। মজমায় লোকদের কাছে এ বিষয়ে কি পরিমাণ তাকাযা করা হচ্ছে, বারবার সে খোঁজ খবর নিতেন। নিযামুদ্দীন ও মেওয়াতের অভিজ্ঞ

মুবাল্লিগগণ আম ইজতিমা ছাড়াও খান্দানের চৌধূরী, মিয়াঁজী, আলিম ওলামা ও প্রভাবশালী লোকদেরকে আলাদা জমা করে তাদের দ্বারা নিজ নিজ খান্দান ও নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে তাশকীল করাতেন। এভাবে তাদের মাধ্যমে নতুন নতুন জামা'আত তৈরী হতো।

কাজের ব্যাপারে যতক্ষণ মাওলানার ইতমিনান ও আশ্বস্তি না হতো ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া ও ঘুম যাওয়া তাঁর জন্য কষ্টকর ছিলো এবং মেহনতের সুফল ঘরে না তুলে মেওয়াত ছেড়ে নিযামুদ্দীন ফিরে যাওয়া মুশকিল ছিলো। কাজের ভবিষ্যত কর্মসূচী ও রূপরেখা তৈরী হওয়ার পর যখন তিনি পূর্ণ আশ্বস্ত হতেন তখনই কেবল ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন। তখন কিন্তু কোন ভক্ত অনুরাগীর দাওয়াত অনুরোধ কিংবা বিশ্রামচিন্তা তাঁর যাত্রা শুরুতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না।

দিল্লী ও নিযামুদ্দীনে মুবাল্লিগগণ সাধারণতঃ ইজতিমার কিছু আগে গিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন এবং বিভিন্ন তাবলীগী গাশতের মাধ্যমে ইজতিমার ওয়ায ও বয়ান থেকে ফায়দা হাছিল করার যোগ্যতা ও চাহিদা গড়ে তুলতেন। আবার ইজতিমা শেষে নুতন তৈরী লোকদের তাজা তাজা অনুভূতিকে কাজে লাগানো এবং তাদেরকে ঠিক মতো জুড়ে দেয়ার জন্য কিছু দিন অবস্থান করতেন।

হযরত মাওলানার অবস্থানকালে বিপুল সংখ্যক মেওয়াতি তাঁর হাতে বাই'আত হতো। কিন্তু বাই'আতকালেও অনিবার্যভাবেই মাওলানা তাঁর দাওয়াত পেশ করতেন এবং এ কাজে আত্মনিয়োগ করার ওয়াদা নিতেন। পরবর্তীতে এ দাওয়াতি শিক্ষাই তিনি তাদেরকে দিতেন। বস্তুতঃ নতুন বাই'আতীরা যেন ছিলো মাওলানার দ্বীনী ও তাবলীগী ফৌজের 'রিক্রুট'। কছবার লোকেরা বিপুল সংখ্যক মেহমানের মনখুলে মেহমানদারী করতো। বাইরের এলাকা এবং বিভিন্ন মেওয়াতি এলাকা থেকে আগত কয়েক হাজার মেহমানের কয়েক ওয়াক্তের খিদমতের ইন্তিজাম করা খুব সহজ মনোবলের ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু এমনই ছিলো তাদের মেজবানির জোশ ও জযবা যে, এরপরও তারা যথাযোগ্য খেদমত হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করতো। মোটকথা, মেওয়াতি কাওম তাদের মহানুভবতা ও অভাবনীয় মেহমান–সেবা দ্বারা প্রাচীন আরব ঐতিহ্যকেই যেন নবজীবন দান করেছিলো।

সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতি এবং বিশেষভাবে আলিম ওলামা ও দ্বীনদারদের প্রতি ইকরাম ও সম্মান প্রদর্শনের এমন অভ্যাস তাদের গড়ে তোলা হয়েছিলো এবং এমন তারবিয়াত তাদের করা হয়েছিলো যে, প্রত্যেক মেওয়াতি প্রত্যেক নবাগতকে পরম কৃতার্থতার সাথে গ্রহণ করতো; ঠিক যেন ভক্ত মুরীদ তার শায়খকে বরণ করছে। কেননা বহিরাগত প্রত্যেককেই তারা তাদের দ্বীনী মুহসিন ও ধর্মীয় উপকারী মনে করতো। যেন ঈমানের দওলত এবং দ্বীনের নেয়ামত তার কাছ থেকেই তারা পেয়েছে। এই গ্রাম্য মেওয়াতিদের দ্বীনী জযবা ও উদ্দীপনা, মুহব্বত ও আন্তরিকতা, বিনয় ও কৃতার্থতা যিকির ও ইবাদতনিমগ্নতা, অশ্রুসিক্ততা ও হৃদয়ার্দ্রতা এবং এলাকার দ্বীনী ও রূহানী ভাবদৃশ্য দেখে অনেকেরই নিজের 'জীবন-অবস্থার' উপর আফসোস হতো, ঘৃণা হতো, এমনকি নিজেকে মুনাফিক বলেও সন্দেহ হতো।

মেওয়াতের জলসা প্রত্যাগত জনৈক ব্যক্তিকে হযরত মাওলানা একবার জিজ্ঞাসা করলেন, বলো ভাই, নিজের অবস্থার উপর কোন আফসোস হলো তোমার? সে বললো, যা কিছু দেখলাম তাতে তো নিজেকে মুসলমান ভাবতেও লজ্জা হয়।

নূহ অঞ্চলের বৃহৎ ইজতিমা

৮, ৯, ১০ জিলকদ ১৩৬০ হিজরী মুতাবেক ২৮, ২৯, ৩০ নভেম্বর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে গৌড়গানো জেলার নূহ অঞ্চলে এক বিরাট তাবলীগী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হলো। বস্তুতঃ মেওয়াতভূমি মানুষের এত বড় সমাবেশ ইতিপূর্বে আর দেখেনি। বাস্তবানুগ ধারণা মতে লোক সংখ্যা ছিলো বিশ পঁচিশ হাজার। এদের একটা বিরাট অংশ নিজের সামান ও নিজের খাবার দাবার কাঁধে করে ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ পথ হেটে হাজির হয়েছিলো। বহিরাগত বিশিষ্ট মেহমানদের সংখ্যাও হাজারের কাছাকাছি ছিলো। তারা মুঈনুল ইসলাম মাদরাসার ভবনে শানদার মেহমানদারিতে ছিলেন।

মজমার সুপ্রশস্ত সামিয়ানার নীচে মাওলানা হোসায়ন আহমদ মাদানী (রহঃ) জুমার নামায পড়িয়েছিলেন। জামে মসজিদসহ প্রায় মসজিদে নামায হওয়া সত্ত্বেও প্রধান জামা'আতের কাতারের কারণে সড়ক চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ

হয়ে গিয়েছিলো। এমন কি ছাদে ও বালাখানার উপরেও শুধু মানুষ আর মানুষ দেখা যাচ্ছিলো।

জুমাবাদ জলসা শুরু হলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জলসা চলতো। না ছিলো কোন সভাপতি, না ছিলো অভ্যর্থনা কমিটি কিংবা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কিন্তু যাবতীয় ব্যবস্থা ও কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম হয়ে আসছিলো। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের যে সুশৃঙখল কর্মতৎপরতা ও দায়িত্ববোধ ছিলো তা পোষাকধারী সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলেও দেখা যায় না। ইজতিমায় দিল্লীর সর্বস্তরের বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল মানুষ বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। খানবাহাদুর হাজী রশিদ আহমদ, হাজী ওয়াজীহুদ্দীন ও জনাব মোহাম্মদ শফী কোরায়শী, নিজ নিজ গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে অন্যান্য মেহমান ও ওলামায়ে কেরামের আসা যাওয়ার বেশ সুবিধা হয়েছিলো।

জলসা ও ইজতিমা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুফতি কেফায়াতুল্লাহ ছাহেব বলেছেন, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি সব রকম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করছি; কিন্তু এমন প্রকৃতির এবং এমন বরকতের ইজতিমা আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি।

বস্তুতঃ এই মানব সমাবেশ সাধারণ কোন জলসা ছিলো না। ছিলো এক জীবন্ত 'খানকাহ'। দিনের সংসারী এখানে হয়ে যেতেন রাতের সংসারত্যাগী। আবার রাতের ইবাদতগুযার দিনের আলোতে হয়ে যেতেন খেদমতগুযার। মানুষের কর্মজীবনে এ বিপরীত দু'টি গুণের একত্র সমাবেশ ঘটানোই ছিলো হযরত মাওলানার মেহনতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইজতিমার নিয়মিত জলসাগুলো ছাড়াও হযরত মাওলানা স্বয়ং উঠতে বসতে এবং প্রতি নামাযের পরে তাঁর 'কথা' বলে যেতেন। তাছাড়া নামায শেষের আত্মসমাহিত অবস্থার আবেগ-উদ্বেলিত দু'আগুলোও হৃদয়ে আলোড়ন তোলা বক্তৃতার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলো না।

বহির্গামী বিভিন্ন জামা'আত

মেওয়াতবাসী, দিল্লীর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও মাদরাসার ছাত্রদের বিভিন্ন জামা'আত প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং ইউ, পি, ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে যাওয়া শুরু

করলো। খোরজা, আলিগড়, আগ্রা, বুলন্দশহর, মিরাট, পানিপথ, সোনীপথ, কর্ণাল ও রোহিলাখণ্ডের সফর হলো। কোন কোন এলাকায় বারবার সফর হলো এবং স্থানীয় জামা'আত কায়েম হলো। সেখান থেকে কিছু কিছু লোক (হাতে কলমে কাজ শেখার উদ্দেশ্যে) নেযামুদ্দীনে আসতে লাগলেন।

করাচীর উদ্দেশ্যে জামা'আত

হাজী আব্দুল জাব্বার ছাহেব ও হাজী আব্দুস সাত্তার ছাহেব উভয়ে সম্প্রতি গভীর তাবলীগ–অনুরাগী ও হযরত মাওলানার মুহিব্বীন হয়েছিলেন। তাদের বিশেষ আগ্রহপূর্ণ দাওয়াতে ৪৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে একটি জামা'আত এবং এপ্রিল মাসের শুরুতে মৌলবী সৈয়দ রেজা হাসান ছাহেবের নেতৃত্বে দ্বিতীয় জামা'আত করাচী গেলো। এভাবে সিন্ধুতে কাজ শুরু হলো এবং করাচীর বিভিন্ন মহল্লায় জামা'আত কায়েম হলো।

উপকূলীয় অঞ্চলে কাজ ছড়িয়ে দেয়ার বড় আগ্রহ ছিলো হযরত মাওলানার। এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, উপকূলীয় বন্দরগুলোর মাধ্যমে দাওয়াত আরব উপকূলে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে সমগ্র আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। বস্তুতঃ উপকূলীয় বন্দরগুলোতে আরব সহ বিভিন্নদেশী মানুষের বিপুল অধিবাসের কারণে স্বভাবতঃই হযরত মাওলানা আশা করছিলেন যে, উপকূলীয় এলাকায় দাওয়াতের প্রসার হলে 'প্রবাসীরা' তা গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ দেশে নিয়ে যাবে।

লৌখনোর সফর

৫৯ হিজরী (চল্লিশ ইংরেজীর শুরু) থেকে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার একদল ছাত্র শিক্ষক হযরত মাওলানার নীতি ও নির্দেশনার আলোকে লৌখনো শহরের আশপাশে এবং বিভিন্ন বস্তিতে কিছু কাজ করছিলেন। ছুটিতে ও বিভিন্ন উপলক্ষে মাওলানার খিদমতেও তারা হাজির হতেন। নাদওয়াতুল উলামা পরিবারের সাথে মাওলানারও গভীর অন্তরংগতা হয়ে গিয়েছিলো। এখানের 'কারগুযারী' তিনি সাগ্রহে শুনতেন এবং নদভীদের প্রতি সস্নেহ আচরণ করতেন।

৬২ হিজরীর রজব মাসে হযরত মাওলানার পক্ষ হতে লৌখনো সফরের দাওয়াত কবুল হলো। সফরের এক সপ্তাহ আগে দিল্লীর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও মেওয়াতীদের ত্রিশ/চল্লিশ সদস্যের একটি অগ্রবর্তী জামা'আত লৌখনো এসে পৌঁছলো। উদ্দেশ্য মাওলানার শুভাগমনের পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা। জামা'আত দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার ভবনে অবস্থান করলো। প্রতিদিনের কার্যসূচী এরকম ছিলো –

বাদ আছর দারুল উলুম থেকে রওয়ানা। মাগরিবের পর কোন এক মহল্লায় গাশত্। এশার পরে দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ব্যাখ্যা এবং দু'একটি বয়ানের পর জামা'আত আকারে প্রত্যাবর্তন। সর্বশেষে রাত এগারটা–বারটায় আহার পর্ব।

বাদ ফজর শুরু হতো (তাবলীগী সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ) তালিমী কর্মসূচী। কিছু সময় তাজবীদ ও মাখরাজের মশক। কিছু সময় জরুরী ফাযায়েল ও মাসায়েল শিক্ষা। কিছু সময় ছাহাবা চরিত ও জেহাদের ঘটনাবলী আলোচনা এবং কিছু সময় দাওয়াতি উছুল বয়ান করার মশক এবং তাবলীগের তরীকা শিক্ষা। অতঃপর আহার ও বিশ্রাম পর্ব। বাদ আছর প্রাত্যহিক আমল শুরু হতো।

১৮ জুলাই হযরত মাওলানা স্বয়ং জনাব হাফেয ফখরুদ্দীন, মাওলানা ইহতিশামুল হাছান, জনাব মোহম্মদ শাফী কোরায়শী ও হাজী নাসীম ছাহেবানের সংগী হয়ে তাশরীফ আনলেন। মোতি মহল পুলের আগে সবুজভূমিতে নফল পড়লেন এবং দীর্ঘ সময় বড় দরদ ব্যথা ও কাকুতি মিনতিসহ দু'আ মুনাজাত করলেন।

দারুল উলুমে সর্বাগ্রে তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে বিভিন্ন হালকায় বিভিন্ন মুআল্লিমের অধীনে জামা'আতগুলোর তালীমী মশগলা জারি ছিলো। নিবিড় সম্পর্কের গভীর টান সত্ত্বেও কেউ কাজ ছেড়ে ইস্তিকবাল ও মুছাফাহার জন্য উঠে গেলো না। হযরত মাওলানা সবার উপর স্নেহের দৃষ্টি বুলিয়ে জামা'আতের আমীর হাফেয মকবুল হাসান ছাহেবের সাথে মুছাফাহা করলেন এবং কুশল বিনিময় ও প্রয়োজনীয় কথা সেরে বিশ্রামস্থলে চলে গেলেন।

মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী ছাহেব একদিন আগেই এসেছিলেন এবং হযরত মাওলানার সাথেই অবস্থান করছিলেন। ইতিপূর্বে থানাভোন ষ্টেশনে এবং সেখান থেকে কান্ধলা পর্যন্ত রেল সফরে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য তিনি হযরত মাওলানার সংগ লাভের এবং আলাপের সুযোগ পেয়েছিলেন। লৌখনো আগমনের পরবর্তী দিন ফটক হাবাশখানস্থ জলসায় সৈয়দ ছাহেব মাওলানার দাওয়াত উপস্থাপন এবং নিজস্ব মতামত নিবেদন করেছিলেন। এ সফরে.সৈয়দ ছাহেব আট নয় দিন মাওলানার সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব, মাওলানা মনযূর নোমানী ছাহেব, মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার কয়েক জন শিক্ষক ও মাওলানা আব্দুল হক মদনী ছাহেব তাশরীফ আনলেন।

লৌখনো অবস্থানকালে তিনদিন চৌধুরী নাঈমুল্লাহ ছাহেবের কুঠিতে এবং দু'দিন শায়খ ইকবাল আলী ছাহেবের বাসস্থান ভূপাল হাউজে আছরের পর বৈঠক হলো এবং দাওয়াতের পরিচিতি, নীতি ও মূলনীতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো।

এছাড়া সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত মেহমানখানায় আগত লোকদের সামনেও একই বিষয় ও বক্তব্য তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে যেতেন। সম্ভবতঃ কোন বৈঠকই দাওয়াতি আলোচনা এবং অতি উচ্চামার্গীয় ইলম ও তত্ত্বজ্ঞানের তাজাল্লী থেকে বঞ্চিত হতো না। বাদ যোহর দারুল উলূমের মসজিদে আম জলসা হতো এবং আছর পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত থাকতো।

লৌখনো অবস্থানকালে মাওলানা আব্দুশ-শাকূর ছাহেবের ওখানে যাওয়া হয়েছিলো। মাওলানা কুতুব মিয়াঁ ছাহেব ফিরিংগী মহল্লী হযরত মাওলানার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনিও ফিরতি সাক্ষাতে ফিরিংগী মহল গিয়েছিলেন। কিছু সময়ের জন্য ইদারায়ে তালীমাতে ইসলাম সংস্থাকেও 'উপস্থিতি সৌভাগ্য' দান করেছিলেন।

শেষদিন হিসাবে শুক্রবার ছিলো বিশেষ কর্মব্যস্ত দিন। সকালে দারুল উলূমের ছাত্রদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা জমিয়াতুল ইছলাহ-এর এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের পর হযরত মাওলানা আমীরুদ্দৌলা ইসলামিয়া

কলেজে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে অপেক্ষমান বিরাট সমাবেশে প্রথমে মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন। এরপর হযরত মাওলানার বয়ান হলো। জলসা শেষে মামা-ভাগ্নের কবরওয়ালী মসজিদে জুমা আদায় করলেন। নামায বাদ মুছল্লীদেরকে দিল্লীর তাবলীগী জামা'আতের সাথে কানপুর যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হলো। কিন্তু কেউ তৈরী হলো না। মাওলানা মসজিদের ভিতরের দালানে অবস্থান করছিলেন। জলসার এমন শীতল ও মনমরা ভাব দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর মতে আজকের কর্মমুখী ও ধর্মবিমুখ যুগে দ্বীন রক্ষা ও দ্বীন শিক্ষার জন্য এ দাওয়াতি মেহনতই হলো একমাত্র পথ। এমতাবস্থায় দ্বীনী দাওয়াতের প্রতি মানুষের এহেন নির্লিপ্ততা তাঁর জন্য ছিলো একান্ত অসহনীয়। তাই তিনি দরজায় পাহারাদার খাড়া করে মসজিদের মাঝখানের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় কথা শুরু করলেন। দু' একজনকে খাড়া করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি ওযর বলো? দুনিয়ার জন্য যদি যখন তখন সফর করতে পারো তাহলে দ্বীনের জন্য কেন পারবে না? তিনি তখন আগাগোড়া ভাব ও আবেগের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং তাঁর মনপ্রাণ ও গোটা অস্তিত্ব তখন দাওয়াতে নিবেদিত ছিলো। হাজী ওলী মুহম্মদ ছাহেব কদিন থেকে অর্শরোগে বেশ কাতর হয়ে পড়েছিলেন। মাওলানা তাকে ধরে বললেন, তুমি যাচ্ছো না কেন? তিনি বললেন, আমি তো এখন মরতে বসেছি। মাওলানা বললেন, মরবেই যখন তো কানপুরে গিয়ে মরো না কেন? এ কথার পর রাজী না হয়ে আর উপায় কি? তবে আল্লাহর কি শান! পুরা সফর তিনি ছহী ছালামতেই ছিলেন। আরো আট দশজন মানুষ তৈয়ার হলেন যারা পরবর্তীতে দাওয়াতের মাঠে বিরাট কর্মীপুরুষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। আর তাদের এ সফর খুবই বরকতপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হয়েছিলে।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব, হাফেয ফখরুদ্দীন ছাহেব ও অন্যান্য কতিপয় সাথীকে নিয়ে রাতের গাড়ীতে তিনি রায়বেরেলীতে গেলেন। বিশ্রামস্থলে পৌঁছতে রাত তিনটা চারটা বেজে গেলো। [১] কিন্তু রাতজাগা

১। রায়বেরেলী শহরের বাইরে 'সয়' নদীর তীরে ছোট্ট একটি বস্তি আছে। (হযরত

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

মুসাফির ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়া সত্ত্বেও নিজের মিশনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রায়বেরেলীর সৈয়দ খান্দানের সদস্যদের সামনে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় দাওয়াত পেশ করলেন। সাদাতগণের সংগে দ্বীনের এবং দ্বীনের সংগে সাদাতগণের নিবিড় সম্পর্ক প্রসংগে খুবই উপযোগী ও সূক্ষ্ম আলোচনাপূর্বক দ্বীনী কাজকে জীবনের প্রধান কাজ রূপে গ্রহণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি বললেন, দ্বীনী কাজে সাদাতগণ অগ্রসর না হলে দ্বীনের প্রত্যাশ্য পরিমাণ উন্নতি হবে না। পক্ষান্তরে সাতাদগণ তাদের স্বভাব দায়িত্বে অবহেলা করে অন্য কিছুতে ব্যস্ত হলে তাদেরও জীবনে প্রত্যাশিত স্বস্তি ও শান্তি নছীব হবে না।

দুপুরের গাড়ীতে লৌখনো ফিরে এসে ষ্টেশন থেকেই তিনি কানপুর রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে দু'দিন থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

সৈয়দ আদম বিন্নোরী (রহঃ)-এর খলিফা) হযরত সৈয়দ ইলমুল্লাহ শাহ নকশবন্দী (রহঃ)-এ বস্তির গোড়াপত্তন করেছেন। তাঁর স্বনামধন্য চতুর্থ অধঃস্তন হলেন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবন সায়াহ্নের দিনগুলো

হযরত মাওলানার স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা বরাবরই ছিলো। তদুপরি অব্যাহত মেহনত মোজাহাদা ও বিশ্রামহীন কর্মব্যস্ততা তাঁকে আরো দুর্বল করে দিয়েছিলো। অন্ত্রের কষ্ট তো জন্মগত ও উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। কিন্তু লাগাতার সফর এবং সফরজনিত অসতর্কতা ও অনিয়ম তাঁর শারীরিক কাঠামোকে নড়বড়ে করে দিয়েছিলো। তেতাল্লিশ সনের নভেম্বর মাসে তিনি আমাশয়ে আক্রান্ত হলেন এবং এমনভাবে হলেন যে, আর উপশম হলো না। তখন দিল্লী প্রত্যাগত যে কেউ এ খবরই বয়ে আনতো যে, মাওলানার অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং শারীরিক দুর্বলতা বেড়েই চলেছে। তবে কর্মব্যস্ততা ও আত্মনিমগ্নতা ছিলো একই রকম আর আবেগ ও চিন্তাব্যাকুলতা ছিলো প্রবল থেকে প্রবলতর। ৪৪ সনের ১৩ই জানুয়ারী জনৈক দোসত [১] দিল্লী থেকে লিখেছেন,

আল্লাহর ফজলে সুস্থতা এখন আশাব্যাঞ্জক; তবে দুর্বলতা আশংকাজনক। চিকিৎসকদের জোর তাকিদ সত্ত্বেও কথা বলা বন্ধ নেই। হযরত মাওলানা বলেন, 'নিরব জীবনের' সুস্থতার চেয়ে তাবলীগের পথে 'সরব জীবনের' মৃত্যুই আমার বেশী পছন্দ। আরও বলেন, কাজের প্রতি আলিম সমাজের যত্ন ও মনোযোগের অভাবই আমার অসুস্থতার বড় কারণ। যোগ্য ও বুঝবান আলিমদের এগিয়ে আসা উচিত। এজন্য করজ করতে হলেও তাদের ঘাবড়ানো উচিত নয়। আল্লাহ বরকত দিবেন। আমার এ অসুস্থতা আসলে নেয়ামত। এ খবর শুনেও যদি মানুষ আসে! কিন্তু তারা তো আসছে না। দেখ, আমার অসুস্থতার কল্যাণ আমি স্পষ্ট অনুভব করছি। এসব বলার সময় হযরতের যে ভাবান্তর হতো তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। বিশেষ করে শেষ বাক্যটি।

১। আব্দুল হাইয়ার ছাহেব।

৬৩ হিজরীর একুশে মুহররম (১৭ই জানুয়ারী ৪৪ ইংরেজী) লৌখনোর জামা'আত দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার মুহতামিম মাওলানা হাফেয ইমরান খান ছাহেব ও হাকীম কাসিম হোসায়ন ছাহেবও জামা'আতের সদস্য ছিলেন। হযরত মাওলানা, মনে হলো– দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছেন। তবে যথারীতি চলাফেরা করছিলেন। নামায সাধারণতঃ নিজেই পড়াচ্ছিলেন। দাওয়াতি আলোচনা ও বয়ানেরও কোন কমতি ছিলো না। অবশ্য বসা থেকে উঠতে মাঝে মধ্যে সাহায্য নিতে হতো। রোগ বেশ আশংকাজনক পর্যায়েই চলে গিয়েছিলো। মাওলানা মোহম্মদ ইউসুফ কাশমীরী (মীর ওয়াইয) ছাহেব তখন নিযামুদ্দীনে ছিলেন। মাওলানা সর্বশক্তি ব্যয় করে ওলামায়ে কেরামকে কাজের গুরুত্ব ও বড়ত্ব বোঝাতে চাইতেন। বস্তুতঃ এটাই ছিলো তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা, একমাত্র আলোচনা। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ কাছে বসে গুরুত্বের সাথে তাঁর কথা শুনুন। দাওয়াতের নিয়ম নীতি এবং পথ ও পন্থা বুঝুন এবং এটাকে জীবনের মিশন রূপে গ্রহণ করুন– এ প্রয়োজনীয়তা মাওলানা তখন খুব বেশী অনুভব করছিলেন। ওলামায়ে কেরামের নামে বারবার তিনি পায়গাম পাঠাচ্ছিলেন যে, এ দাওয়াত ও আন্দোলন আপনাদেরই উপযুক্ত এবং আপনারাই এর উপযুক্ত। আপনারা এর দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হলেই তা প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবে। আমি তো নিমিত্তমাত্র। আমার ভূমিকা তো শুধু কোথাও আগুন লাগা দেখে লোকজন ডেকে আনা। ডাকাডাকি করাই আমার কাজ। আগুন নেভাবেন তো আপনারা।

দিল্লীর ব্যবসায়ী ও মুবাল্লিগদেরকে মাওলানা তাকীদ করতেন তারা যেন ওলামায়ে কেরাম থেকে যথাযোগ্য ফায়দা হাছিল করেন এবং শহরে বিভিন্ন জলসা করে তাদের দ্বারা সাধারণ মানুষকে উপকৃত করেন এবং তাঁদের সমর্থন সহযোগিতা দ্বারা দাওয়াতি মেহনতকে শক্তি যোগানোর ব্যবস্থা করেন। সেই সূত্রে তখন বিভিন্ন স্থানে জলসা সমাবেশ হলো, তাতে জনাব মুফতি কেফায়েতুল্লাহ ছাহেব, মাওলানা আব্দুল হান্নান ছাহেব, মাওলানা ইমরান খান ছাহেব ও অন্যান্য আলিমগণ কাজের সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন। বিশেষতঃ জনাব মুফতি কেফায়েতুল্লাহ ছাহেব অত্যন্ত পরিষ্কার, জোরদার ও উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় দাওয়াতের প্রতি সমর্থন জানালেন। তাঁর এ উদার ভূমিকায় মাওলানা খুবই প্রীত হলেন এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

এ সব জলসার কারগুযারি ও কার্যবিবরণী শোনার জন্য হযরত মাওলানা ব্যাকুল প্রতিক্ষায় থাকতেন এবং একাধিক মানুষ থেকে বিশদ বিবরণ না শুনে শয্যা গ্রহণ করতেন না। জলসার কাজ থেকে ফারেগ হয়ে ফিরে আসতে সাধারণতঃ আমাদের গভীর রাত হয়ে যেতো। মাওলানা যথারীতি জেগেই থাকতেন। আমাদের আওয়াজ শোনামাত্র তলব করতেন এবং গভীর আগ্রহ ও মনোনিবেশ সহকারে জলসার সার্বিক অবস্থা ও বিশদ বিবরণ শুনতেন। তাঁর চিন্তা ও বক্তব্য উপস্থাপনে বক্তার ত্রুটি বা অসতর্কতা হয়েছে জানলে মুখে কিছু বলতেন না। তবে তাঁর ভাব ও অবস্থা যেন সবাক হতো কবির ভাষায়–

هر کسے از ظن خود شد یار من + وزدرون من نجست اسرار من

'সবাই আমার স্বঘোষিত বন্ধু। অথচ মনের খবর রাখে না কেউ।'

তিনি কথা বলতেন সাধারণতঃ সকালে চায়ের মজলিসে এবং রাতে খাওয়ার পরে। কখনো তা কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ হতো। ফলে দুর্বলতা আরো বেড়ে যেতো। আমারা আদব বশতঃ নিরব থাকতাম। একদিন মির ওয়াইয সাহেব (এক হাদীছের প্রতি ইংগিত করে) মাওলানা ও তাঁর শ্রোতাদের অবস্থা বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ করলেন। বললেন, সম্ভবতঃ এমন কোন মুহূর্তেই বলা হয়েছিলো حتى قلنا ليته سكت (এমনকি আমরা ভাবতাম, হায়, এবার যদি তিনি চুপ হতেন!)

সে সময়েই ছাহেবজাদা মাওলানা মোহম্মদ ইউসুফ ছাহেবের নেতৃত্বে ঘটমেকা অঞ্চলে এক সফল তাবলীগী সফর হলো। তাতে মেওয়াতি জলসাগুলোর যাবতীয় রূপ বৈশিষ্ট্য বেশ পরিস্ফূট ছিলো, যা এতদিন হযরত মাওলানার উপস্থিতিতে দেখা যেতো।

ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ

হযরত মাওলানার দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিলো উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মাঝে পারস্পরিক দূরত্ব ও অপরিচয় এবং ভুল বোঝাবুঝি ও ঘৃণা–ভীতির বিরাজমান পরিবেশ দূর করা এবং একদা উম্মতের সর্বস্তরে প্রীতি ও সম্প্রীতির যে সুন্দর আবহ ছিলো তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা;

যাতে ইসলামের জন্য তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ব্যাপক সহযোগিতা নিয়োজিত করতে পারে, পরস্পরকে সম্মান ও কদর করা শিখতে পারে এবং পরস্পরের গুণ ও যোগ্যতা থেকে পরস্পর উপকৃত হওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে পারে।

আগামী আলোচনায় তাই আমরা দেখতে পাবো যে, উম্মতের যে সকল শ্রেণী বা মহল দ্বীন ও দ্বীনী আখলাক থেকে বহু দূরে সরে গেছে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদেরকেও হযরত মাওলানা উপেক্ষা করতে চাইতেন না। এ কারণেই আওয়াম ও ওলামায়ে কেরামের অপরিচয় ও দূরত্ব কিছুতেই তাঁর বরদাশত ছিলো না। এটাকে তিনি উম্মতের বিরাট দুর্ভাগ্য, ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য বিরাট খাতরা এবং ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতার পূর্বলক্ষণ মনে করতেন। মাওলানা তাঁর দাওয়াতি মেহনতের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। (এবং কিছু সুলক্ষণও ফুটে উঠেছিলো) যে, একাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আওয়াম ও উলামা কেরাম পরস্পর কাছাকাছি হতে পারবেন এবং একে অপরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবেন।

'ঘাটমেকা'–এর জলসায় আমি অধম মাওলানা মোহম্মদ ইউসুফ ছাহেবের হুকুমে মেওয়াতি ওলামা কেরামের সামনে এ মর্মে এক সংক্ষিপ্ত বয়ান রেখেছিলাম যে, দাওয়াতি মেহনতের মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম যদি আওয়ামকে কাছে না টানেন এবং আওয়ামের মাঝে দ্বীনী জাগরণ সৃষ্টি না করেন তাহলে খুবই আশংকা হয় যে, নিজ দেশে তারা এমন এক অদ্ভুত সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পরিণত হবেন যাদের তাহজীব কৃষ্টি আওয়ামের কাছে হবে একেবারে অপরিচিত এবং তাদের ভাষা ও ভাবনা পর্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর জন্য হবে অস্বস্তিকর। এমনকি সম্ভবতঃ চিন্তার আদান প্রদানের জন্য উভয়ের মাঝে দোভাষীরও প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

মৌলবী ইউসুফ ছাহেবের জবানীতে বয়ানের খোলাছা শুনে হযরত মাওলানা খুবই পসন্দ করেছিলেন। আসলে এটা ছিলো মাওলানারই মজলিসী আলোচনা থেকে আহরিত বক্তব্য, যার সত্যতা দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

মাওলানা একদিকে ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াতের মাধ্যমে আওয়ামের

'কাছে' যাওয়ার এবং আওয়ামের প্রতি দরদী হওয়ার তাকীদ করতেন। অন্যদিকে আওয়ামকে উদ্বুদ্ধ করতেন, যেন তারা ওলামায়ে কেরামের কদর ও মর্যাদা বুঝে এবং উছুল আদব রক্ষা করে তাদের খিদমতে হাজির হয় এবং প্রয়োজনীয় ইলম হাছিল করে। তাদেরকে তিনি ওলামায়ে কেরামের যিয়ারত ও মুলাকাতের ছাওয়াব এবং তাঁদের খিদমতে হাজির হওয়ার উছুল আদব শেখাতেন। ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত দেয়ার, তাঁদের থেকে ফায়দা হাছিল করার এবং তাঁদেরকে কাজে যুক্ত করার হিকমত ও তরীকা বলতেন। ওলামায়ে কেরামের কোন কথা বা কাজ বুঝে না আসলে তার সুব্যাখ্যা গ্রহণ এবং সুধারণা পোষণের অভ্যাস তাদের মাঝে গড়ে তুলতেন। তাদেরকে তিনি ওলামায়ে কেরামের খিদমতে পাঠাতেন এবং ফিরে আসার পর অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন যে, কিভাবে গিয়েছো? কি করেছো? কি বলেছো?(ইত্যাদি অতঃপর প্রয়োজনে তাদের (আপত্তিকর) সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়ার সংশোধন করতেন। এভাবে কারবারী শ্রেণীকেও ওলামায়ে কেরামের এতো কাছে তিনি নিয়ে এসেছিলেন যে, বিগত বহু বছরে (সম্ভবতঃ খেলাফত আন্দোলনের পরে) এমনটি কখনো দেখা যায়নি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ শহরগুলোতে রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং স্থানীয় মতবিরোধ মিলে আওয়ামের মাঝে ওলামায়ে কেরামের প্রতি একটা সাধারণ অসন্তোষ ও জেদী মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করেছিলো, যা ব্যতিক্রমহীনভাবে দ্বীনের ধারক বাহক সকল আলিমের ব্যাপারেই প্রযোজ্য ছিলো।

হযরত মাওলানার এ সকল প্রচেষ্টা ও কর্মকৌশল এতটুকু সফল অবশ্যই হলো যে, অন্তত দাওয়াতি পরিমণ্ডলে আওয়াম দ্বীনের খাতিরে রাজনৈতিক বিরোধ বরদাশত করে নিলো এবং রাজনৈতিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও হক্কানী ওলামায়ে কেরামের প্রতি ইজ্জত সম্মান এবং তাদের বড়ত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানের একটা সুযোগ হলো। বড় বড় ব্যবসায়ী যারা বহু বছর ধরে ওলামায়ে কেরামের প্রতি 'কেমন' হয়ে ছিলো; তারাও বা-আদব সেখানে হাজির হতে লাগলেন এবং নিজেদের তাবলীগী জলসায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তাদেরকে নিতে লাগলেন। শেষ অসুস্থতার সূচনাপর্বে এ বিষয়ে মাওলানা খুব মনোযোগী হয়েছিলেন এবং যথেষ্ট সুফলও পেয়েছিলেন।

বিভিন্ন দল ও উপদলের প্রতি মনোযোগ

চিন্তার খুঁটিনাটি পার্থক্য এবং বহু বছরের দূরত্বের কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিভিন্ন দল উপদলের মাঝেও পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বৈরিতা বিরাজ করছিলো। প্রতিটি দল, উপদল পরস্পরের ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলাকে দ্বীন ঈমানের হিফাজত বলে মনে করতো। একের উত্তম গুণাবলী সম্পর্কে অপরের কোন ধারণা ছিলো না। ফলে পরস্পর উপকৃত হওয়ার পথ দীর্ঘ দিন থেকে বন্ধ ছিলো।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই মনে করতো যে, বাহাছ-বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাই হলো মীমাংসার মোক্ষম উপায়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত সত্য এই যে, এ পথে মীমাংসার পরিবর্তে জিঘাংসাই শুধু বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

মাওলানার দৃষ্টিতে মীমাংসার আসল পন্থা হলো আখলাক ও চরিত্র দ্বারা এবং ইকরাম ও মুহব্বত দ্বারা চিন্তার জট খুলে দেয়া এবং মনের জড়তা বিদূরীত করা। এভাবে এক অন্তরংগ সম্পর্কের পরিবেশে পরস্পরকে কাছে থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হলে দ্বিধা সংশয় ও ভুল বোঝাবুঝি আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। সঠিক পন্থায় দ্বীনের মৌলিক কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং পারস্পরিক মেলামেশা দ্বারা মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য ও স্বাভাবিকতার একটা অবস্থা তৈরী হবে। কারো মধ্যেই তখন আর বাড়াবাড়ির মানসিকতা থাকবে না।

শেষ অসুস্থতার সময় এদিকে মাওলানার মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হলো। এ জন্য তিনি বিশেষ কিছু নীতি নির্দেশনা দান করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তার সূক্ষ্মতা, মানুষের অনুভূতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি এবং উদ্যোগ আয়োজনের ব্যাপকতা এমন ছিলো যে সম্ভবতঃ রাজনীতিবিদ ও সংগঠন বিশারদরাও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক বিষয়গুলোতেও করে উঠতে পারে না।

'কম আসা যাওয়া' আলিমদের কেউ কখনো মসজিদে কিংবা মাওলানার সাক্ষাতে আগমন করলে তাকে তিনি এতটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন এবং তার ইকরাম ও খাতির যত্নের এতটা খেয়াল রাখতেন যার অধিক কল্পনা

করাও সম্ভব নয়। অপরিচয়ের দূরত্ব এবং দলীয় সংকীর্ণতার সামান্যতম আভাসও তাকে তিনি পেতে দিতেন না।

রোগের বাড়াবাড়ি

চৌচল্লিশ সনের মার্চে দুর্বলতা এত বেড়ে গেলো যে, নামায পড়ানো আর সম্ভব ছিলো না। অবশ্য দু'জন খাদেমের কাঁধে ভর করে জামা'আতে শরীক হতেন এবং দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। কয়েকবার তিনি বলেছেন, এ অসুস্থতা থেকে আমি বাঁচবো না। দৃশ্যতঃ সুস্থতা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। সমসাময়িকদের সম্পর্কে দুঃখ করে বলতেন, গৌণ ও সম্পুরক বিষয়ে এবং শাখা প্রশাখায় এরা এমন মেতে আছেন যে, মৌলিক ও বুনিয়াদি কাজের সময় সুযোগ আর নেই। এ সময়কালে তিনি অতি সূক্ষ্ম ভাবপূর্ণ দুটি বয়ান করলেন, যার প্রতিটি কথায় ইংগিত ছিলো যে, শেষ সময় খুব বেশী দূরে নয় এবং তাতেও আল্লাহ পাকের বড় হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে।

ওলামায়ে কেরামের সমাগম

সিন্ধু সফরকারী জামা'আতের মাধ্যমে দাওয়াতের প্রতি মাওলানা হাফেজ হাশিম জান মুজাদ্দিদী ছাহেবের আকর্ষণ এবং হযরত মাওলানার প্রতি গায়েবানা মুহব্বত হয়ে গিয়েছিলো। মার্চ মাসে তিনি দিল্লী তাশরীফ আনলেন। মাওলানা তাঁর শুভাগমনকে বেশ গুরুত্ব দিলেন এবং অশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। আল্লাহ যাদেরকে বিশেষ প্রতিভা ও যোগ্যতা এবং আলাদা দিল দেমাগ ও মানসিকতা দান করেছেন এবং যাদের পূর্ব পুরুষ ইসলামের খিদমতে বড় অবদান রেখেছেন; দাওয়াতের কাজে তাদের অংশগ্রহণে মাওলানা অশেষ খুশী হতেন। এ কারণে হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ)-এর সাথে 'ঔরসগত' সম্পর্কের অধিকারী মাওলানা হাশিম ছাহেবকে তিনি শাহজাদাদের ন্যায় ইকরাম ও সম্মান প্রদর্শন করলেন।

এর ক'দিন পর মার্চ মাসেই 'লেখকের' বড় ভাই ডাক্তার মৌলবী সৈয়দ আব্দুল আলী ছাহেবের শুভাগমনে মাওলানা এত আনন্দিত হলেন যে, শোয়া

থেকেই আলিংগনাবদ্ধ হয়ে বললেন, আপনার আগমন–আনন্দে আমি আগের তুলনায় সুস্থবোধ করছি। এই অন্তিম অসুস্থতার অবস্থা এমন ছিলো যে, দাওয়াতি বিষয়ে আনন্দের কিছু হলে মাওলানার স্বাস্থ্যের আকস্মিক উন্নতি দেখা দিতো। প্রাণমন অদ্ভুত রকমের সতেজ হয়ে উঠতো। ফলে রোগের প্রভাব প্রতিক্রিয়া চাপা পড়ে যেতো।

এ দুই মেহমান দ্বারা মাওলানা দিল্লীর ঐ সব মহলে কাজ নিতে চাইলেন যেখানে তাবলীগ এখনো বিশেষ সাড়া পায়নি অথচ মেহমানদ্বয়ের সাথে তাদের 'হৃদতা' রয়েছে। মাওলানা উভয়ের আগমনকে নিছক 'ব্যক্তিগত' পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কাজের জন্যও ফলদায়ক করার চেষ্টা নিলেন। সংশ্লিষ্ট লোকদের বারবার তিনি তাগাদা দিলেন যে, তাঁদের থেকে যথাযোগ্য কাজ নাও এবং অন্যদের দিয়ে যা সম্ভব নয় সেই বিশেষ ফায়দাটুকু তাদের আগমনের সুযোগে হাছিল করে নাও। বারবার তিনি বলতেন, ডাক্তার ছাহেবের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। তোমরা তাঁর ফায়দা নিচ্ছো না। বারবার এ কথা বলার পর একবার তাঁকে বললেন, আপনি তো আবার মনে করে বসছেন না যে, সময় নষ্ট হচ্ছে? তিনি না–বাচক জবাব দিলেন। মাওলানা বললনে, ব্যস, আমার বারবার বলার দ্বারা আপনি আবার মনে করবেন না যে, সত্যি বুঝি সময় নষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার ছাহেবকে তিনি কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরোনো মেওয়াতিদের সাথে সময় কাটানোর তাকিদ দিতেন। ডাক্তার ছাহেব মসজিদের পিছনে দারুল ইকামা (বাসভবন) এর এক কামরায় থাকতেন। কিন্তু তা মাওলানার মনঃপূত ছিলো না। একবার তিনি বললেন, মসজিদের বাইরে যে থাকে, থাকুক; আপনি কিন্তু 'আগন্তুক' হয়ে থাকবেন না। এরপর ডাক্তার ছাহেব অধিকাংশ সময় মসজিদেই থাকতে শুরু করলেন। পরে তিনি স্বীকার করলেন যে, মসজিদের মেওয়াতি ও অন্যান্য মুবাল্লিগদের সংস্পর্শে তিনি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ও লক্ষণীয় ফায়দা অনুভব করেছেন।

মাওলানার অনুরোধে ও তাগাদায় বিভিন্ন মাদরাসার ওলামায়ে কেরাম ও মুহতামিমগণও একবার জমায়েত হলেন। সেখানে মাদরাসাগুলোর (নিজস্ব অবস্থান থেকে) কাজে অংশগ্রহণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ ও মত বিনিময় হলো। দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামীম মাওলানা ক্বারী তৈয়ব ছাহেব,

মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ ছাহেব, দিল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার মুহতামীম মাওলানা মুহম্মদ শফী ছাহেব, সাহারানপুর মাযাহেরুল উলুম মাদরাসার নাযিম মাওলানা হাফেয আব্দুল লতীফ ছাহেব, দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা ইযায আলী ছাহেব ও শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব এ পরামর্শ সভায় শরীক হয়েছিলেন। মাওলানা আব্দুল কাদের ছাহেব রায়পুরীও নিযামুদ্দীনে তাশরীফ আনলেন। ফলে এর নূরানী পরিবেশ দ্বিগুণ ঝলমলে হয়ে উঠলো। মাসের শেষ দিকে এই 'তারকা মাহফিল' ভংগ হলো। বড়ভাই ছাহেবের বিদায়কালে মাওলানা বললেন–

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد

হায়, চোখের পলকে ফুরিয়ে গেলো বন্ধুর সান্নিধ্যসুখ।

সিন্ধুর উদ্দেশ্যে তৃতীয় জামা'আত

এপ্রিলের শুরুর দিকে ৬০/৭০ জনের জামা'আত হাফেয মাকবুল হাসান ছাহেবের নেতৃত্বে সিন্ধুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। কাফেলা তার প্রথম মঞ্জিল লাহোরে দু' তিনদিন অবস্থানপূর্বক কাজ করলো। জামা'আত পৌঁছার পরের দিন পীর হাশিম জান ছাহেব তাশরীফ আনলেন। হযরত নূরুল মাশায়েখ ছাহেব (কাবুল) তখন লাহোরে অবস্থান করছিলেন। জামা'আতের কয়েকজন সাথী পীর হাশেম জানের সংগে একদিন তাঁর খিদমতে হাজিরা দিলেন এবং মৌলভী সৈয়দ রেযা হাসান খান ছাহেব জামা'আতের পরিচিতি পেশ করলেন।

পেশাওয়ারি জামা'আতের আগমন

পেশাওয়ারে হযরত মাওলানার পরিচয় এবং দাওয়াতের পরিচিতি লাভ করে সাথীদের এক জামা'আত দিল্লীতে মারকাযে আসার সিদ্ধান্ত নিলো। পত্রযোগে বিষয়টি মাওলানাকে অবহিত করা হলো। তাতে এ নিবেদনও ছিলো যে, আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য ইসলামের জন্য এক অমূল্য সম্পদ এবং মুসলমানদের জন্য আল্লাহর প্রদত্ত মহানেয়ামত। এ নেয়ামত মুসলমানদের উপর আরো দীর্ঘদিন যেন ছায়াদান করে সেজন্য আপনি নিজেও আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

মাওলানার তরফ থেকে এর জবাব গেলো এভাবে–

এপ্রিলে জামা'আতের আগমন মোবারক হোক। তবে মনে হয় এখানে আসার আগে জামা'আত যদি আপনার তত্ত্বাবধানে উছুলের পূর্ণ পাবন্দীসহ সেখানেই কিছুদিন কাজ করে নেয় এবং এভাবে কাজের সাথে কিছুটা ভাব পরিচয় হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী এপ্রিলে এখানে আসা অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। সুতরাং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিজ তত্ত্বাবধানে জামা'আতকে দিয়ে সেখানে আপনি কিছু কাজ করিয়ে নিন।

নিজের সুস্থতার জন্য আমি দু'আ রত আছি। তবে এই শর্তে যে, আমার সময় যেন কর্মসূচী মুতাবেক অতিবাহিত হয়। মুহূর্ত সময় যেন অযথা কাজে ব্যয় না হয়, যেমন আমার বর্তমান অবস্থায় হচ্ছে। অসুস্থতার জীবন থেকে এ শিক্ষাই আমি লাভ করেছি যে, আমাকে ছাড়া যে কাজ হওয়া সম্ভব নয় তাতেই শুধু আমি যোগ দিবো। অন্যথায় জামা'আতই সব কাজের আয়োজন ও ব্যবস্থা করবে।

(১৪ই মার্চ ১৯৪৪ ইং)

বিভিন্ন তাবলীগী গাশতের মাধ্যমে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পর ৮ই এপ্রিল এক সংক্ষিপ্ত জামা'আত পেশাওয়ার থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। কাফেলার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আরশাদ ছাহেব, মাওলানা এহসানুল্লাহ ছাহেব নদভী, জনাব আব্দুল কুদ্দুস ছাহেব প্রমুখ, দুটি বাচ্চাও ছিলো তাদের সংগে। ১০ই এপ্রিল থেকে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত ছিলো নিযামুদ্দীনে জামা'আতের অবস্থানকাল।

নিযামুদ্দীনের পরিবেশ ও কর্মসূচী

আরশাদ ছাহেব তার সফরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা এখন ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা লাভ করেছে। তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করার জন্য কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হলো।

বেলা একটার সময় খাবার প্রস্তুত বলে খবর এলো। মসজিদের এক

কোণায় হযরত মাওলানার হুজরা। আমরা সেখানে গেলাম। দস্তরখানে খাবার সাজানো ছিলো। হযরত মাওলানা লেপ জড়িয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চৌকিতে বসা ছিলেন। তাঁর সামনে 'পথ্য খাবার' রাখা ছিলো। শরীর যাকে বলে 'অস্থি চর্মসার'। তবে চেহারায় নূরের ঝিলিক উদ্ভাসিত ছিলো। চিকিৎসার দায়িত্বে নিযুক্ত হাকীম ছাহেব চৌকির পাশে জমিনে বসা ছিলেন। সালাম করে আমরা ত্রিশ বত্রিশ জন দস্তরখানে বসে গেলাম। খানার মাঝে হযরত মাওলানার কিছু কথা হলো। প্রথমে হাকীম ছাহেবকে বললেন, ভাই! আমি তো আপনার ব্যবস্থাপত্র মেনে চলা শরীয়তি ফরয মনে করি। এটাই কি কম যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি!

এরপর অন্যদের সম্বোধন করে বললেন, ভাই সকল! বান্দার সংগে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক আছে। এমনকি কাফির বান্দার সংগেও আছে। এ সম্পর্কের কারণেই তো হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ

(مُلِيمٌ শব্দটির উপর খুব জোর দিয়ে হযরত বললেন,) কাফির বান্দার সাথে পর্যন্ত আল্লাহর এমন সম্পর্ক হলে মুমিন বান্দার সাথে সম্পর্কের অবস্থা কেমন হবে?

ভাই সকল! মুমিনদের খিদমত হলো আবদিয়াত (ও দাসত্বের) আসল স্তর। আবদিয়াত কি? (আবদিয়াত হলো) মুমিন বান্দার জন্য যলীল হওয়ার ইজ্জত হাছিল করা। আমাদের আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান মূলনীতি এটা। আর এ এমন এক সর্বস্বীকৃত উছুল বা মূলনীতি যা কোন আলিম গর-আলিম, এমনকি (যারা দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া কোন কাজই করে না সেই) জড়বাদীরা পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারে না।

এরপর 'কিবর' ও রিয়া'র নিন্দা বয়ান করে মজলিস বরখাস্ত হয়ে গেলো।

যোহরের সময় হযরত মাওলানা দু'জন খাদিম ও একটি লাঠির সাহায্যে বাইরে এলেন এবং মিম্বরে হেলান দিয়ে বসে বললেন,

ভাই সকল! আমরা রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ হতে বিচ্যুতই শুধু হইনি; অনেক বেশী বিচ্যুত হয়েছি। রাষ্ট্র ক্ষমতা বা অন্য

কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও পন্থা অনুসরণ করে যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা এসে যায় তবে তা থেকে আমাদের সরে দাঁড়ানো উচিত নয়। কিন্তু তা আমাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই নয়। ব্যস, এ পথে জীবনের সবকিছু, এমনকি জীবন পর্যন্ত আমাদেরকে বিলিয়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ একথা মনে রেখো যে, মুসলিম সমাজের মন্দের নিন্দা দ্বারা মন্দ নির্মূল হতে পারে না। বরং কর্তব্য হলো; সমাজে দু' একজনও ভালো মানুষ যারা আছে তাদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা। তখন মন্দ নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে।

এরপর নামাযের সময় হলে দু'জন খাদেম হযরতকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলো। কিন্তু কি আশ্চর্য দু'জন খাদিম ছাড়া জায়গা থেকে যিনি নড়তে পর্যন্ত পারেন না তিনিই চার রাকাত পূর্ণাংগ নামায পূর্ণ উদ্যম ও প্রশান্তির সাথে আদায় করলেন।

নামাযের পর আমাদের সম্বোধন করে বললেন, দেখো, মসনদ দখলের জন্য তোমরা দুনিয়াতে আসোনি। মূল্যবান সময় নষ্ট হতে দিও না। যিকির ও তালিমে সর্বক্ষণ মশগুল থেকো। খুবই অল্প সময়ের জন্য তোমরা দুনিয়াতে এসেছো। এ সময় তো কিছুই না। এরপর খুব অনুনয় বিগলিত স্বরে বললেন,

ভাই! অন্যবার আরো বড় জামা'আত নিয়ে আরো বেশী সময় থাকার জন্য এসো। এখানে যথা সম্ভব বেশী সময় থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

নামাযের পর দু'জন খাদিমের উপর ভর করে মাওলানা তাঁর হুজুরায় ফিরে গেলেন। উপস্থিত মাজমাকে আরবী জানা ও নাজানা এ দু'ভাগে বসানো হলো। আরবী না জানা অংশে দাওয়াতি আন্দোলন সম্পর্কিত উর্দূ কিতাবের তালিম চললো। আর আরবী শিক্ষিতদের অংশে কিতাবুল ঈমান থেকে কিছু হাদীছ পাঠ-শ্রবণ ও মুযাকারা (আলোচনা) হলো। এখানে যারা মুকীম, তাদের জন্য নাকি এ নিছাব পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক।

রাতে পেশাওয়ারী ও অন্যান্য জামা'আত যুক্তভাবে পাহাড়গঞ্জ এলাকায় তাবলীগী কাজ করে সেখানেই রাত যাপন করলো।

দুপুরের পূর্বে হাদীছের দরস হলো এবং মনের মতো হলো। চায়ের মজলিসে হযরতের তবীয়ত বেশ খোলাসা মনে হলো। আমাকে বলতে লাগলেন, ভাই! বড় জামা'আত পাঠাবে। দুনিয়ার সাধারণ কাজও না শিখে হয় না। তালিম ছাড়া চলে না। এমনকি চৌর্যবৃত্তির জন্যও 'উস্তাদ' ধরা প্রয়োজন। পাকা তালিম ছাড়া চুরিতে গেলে নির্ঘাত ধরা খেতে হবে। তাহলে তাবলীগের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ না শিখে কিভাবে আয়ত্বে আসতে পারে! এরপর তিনি অত্যন্ত স্নেহ কোমল স্বরে বললেন, কি ভাই! জামা'আত আনবে তো? আমি আরয করলাম। হযরত! আগে এখান থেকে জামা'আত গেলে ইনশাআল্লাহ পেশাওয়ারীরা সহজেই একাজে আকৃষ্ট হতে পারে।

তিনি বললেন, ভাই! এক কাজ করো; অমুক অমুকের নামে তুমি নিজে এবং সেখানের প্রভাবশালীদের হাতে এ মর্মে পত্র লেখাও যে, আপনারা জামা'আত নিয়ে পেশাওয়ারে আসুন। এতে একদিকে তোমাদের শহরে জামা'আতও আসা হলো অন্যদিকে এখনো যারা গদীনশীনী করে চলেছেন তারাও আমলের জন্য তৈরী হবেন।

আজ বাদ যোহর জামা'আতসমূহের তাশকীল ও রওয়ানা হওয়া সম্পর্কে হযরত মাওলানা হিদায়াত দিচ্ছিলেন।

যোহরের পর দরসে হাদীছ হলো এবং বড় সুন্দর হলো। মাওলানা ওয়াছিফ ছাহেব কিতাবুল জিহাদ থেকে কিছু আশ্চর্য হাদীছ শোনালেন।

মেলা ও ওরস উপলক্ষে মসজিদে বহু লোকসমাগম ছিলো। তাদের মাঝেও তাবলীগী কাজ হতে লাগলো। সন্ধ্যা পাঁচটায় যথানিয়মে তাবলীগী জামা'আত রওয়ানা হলো।

১২ই এপ্রিল, আজ চায়ের মজলিসে হযরত মাওলানা বললেন, পূর্ববর্তী রাসূলগণের শরীয়তের মতো আমাদের পেয়ারা নবীও শরীয়ত এনেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর ইঞ্জিল তাওরাতকে মনসূখ (বা রহিত) করেনি। বরং তার বিধিবিধান রদবদল করেছে। কিন্তু আখেরী নবীর কোরআন পূর্ববর্তী সব কিতাব মানসুখ করেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে সেগুলো পালন করা হারাম।

অন্যান্য আম্বিয়া থেকে আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের যে আলাদা বৈশিষ্ট্য সেটা হলো তাবলীগ পদ্ধতি। পূর্বযুগে নবুওয়তের সিলসিলা জারি থাকার কারণে তাবলীগের প্রয়োজন সেই পরিমাণ তাঁরা অনুভব করেননি, যা আমাদের নবীজী করেছেন। কেননা তাঁর পরে নবুওয়তের সিলসিলা খতম ছিলো এবং সার্বিক তাবলীগী দায় দায়িত্ব উম্মতের উপর অর্পিত হওয়ার কথা ছিলো।

রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে জামা'আত তৈরী করে দ্বীনের আহকাম শেখানোর জন্য পাঠাতেন সেই তাবলীগী তরীকার পুনরুজ্জীবনই হলো উম্মতের আজকের প্রয়োজন।

অতঃপর হযরত মাওলানা لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ [১] প্রসংগে আলোকপাত করে বললেন, দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমনকি পীর-মুরশিদ, মা-বাবা ও উস্তাদ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এ মূলনীতি সর্বদা দৃষ্টি পথে থাকা চাই।

মৌলবী ইহসানুল্লাহ ছাহেবকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, বুঝলে মৌলবীজী, এ কাজ হলো প্রথম যুগের অমূল্য সম্পদ। এর জন্য জানমাল কোরবান করো এবং আত্মসর্বস্ব মিটিয়ে দাও। এ পথে যত বেশী কোরবানী ততবেশী প্রাপ্তি।

এসবকিছু যা তোমরা মজা করে শুনছো তার উদাহরণ হলো পরের বাগানের 'ফল' দেখে খুশী হওয়ার মতো। আসল মজা তো নিজের বাগানে ফল ধরাতে পারলে। মেহনত ও কোরবানী ছাড়া সেটা কিভাবে হতে পারে!

আছরের সময় জোর বৃষ্টির কারণে দাওয়াতে বের হওয়ার ইচ্ছা মুলতবী ছিলো। আছরের সময় হযরত বাইরে এসে অবস্থা জেনে মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং মেওয়াতিদের ঈমান ও কোরবানীর প্রসংগ টেনে বললেন, এরা তোমাদের অনুগ্রহকারী বন্ধু। তোমাদের সঠিক পথের দিশারী। এরপর এক গরীব মেওয়াতিকে কাছে ডেকে বসালেন এবং বললেন, প্রথম যখন এ বেচারাকে

১। খালিকের নাফরমানি করে মাখলুকের আনুগত্য বৈধ নয়।

বললাম, যাও তাবলীগ করো তখন সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তলবীগ' [১] আবার কি? আমি বললাম, মানুষকে কালিমা শেখাও। সে বললো, হযরত! আমি নিজেই তো কালিমা জানি না। আমি বললাম, যাও মানুষকে একথাই বলো, ভাইসকল! দেখ, আমার এতো বয়স হওয়া সত্ত্বেও না শেখার কারণে এখনো মুখে কালিমা আসে না। তোমরা অবশ্যই কারো কাছে গিয়ে কালিমা শিখে নাও।

মাওলানার বয়ান থামল। বৃষ্টি থামল না। তখন আছরের পর কাদা পানিতেই জামা'আত রওয়ানা হয়ে গেলো। কিন্তু আল্লাহর কি শান! রওয়ানা হওয়া মাত্র বৃষ্টি থেমে গেলো এবং পূর্ণ অনুকূল আবহাওয়ায় আধা মাইল দূরে এক গ্রামে মাওলানা ওয়াছিফ এর নেতৃত্বে তাবলীগী গাশত হলো এবং বাদ মাগরিব জামা'আত বা-সালামাত মারকাযে ফিরে এলো।

এখানে বিষ্যুদবার রাতে দিল্লীর বিশিষ্ট লোকেরা মাওলানার যিয়ারতে এসে থাকেন। বৃষ্টি সত্ত্বেও মজমা আজ বেশ জমজমাট। কিছু নূরানী চেহারা দেখা যাচ্ছে।

তাহাজ্জুদের সময় বেশীরভাগই যিকির আযকারে মশগুল দেখলাম। 'ফজর' হযরত মাওলানার হুকুমে আমাদের সফরসংগী মাওলানা ইহসানুল্লাহ পড়ালেন। চায়ের মসলিসে পঞ্চাশ ষাটজনের সমাবেশে হযরত মাওলানা বললেন,

নামাযের মধ্যে ছোট্ট সুরাতুল ফাতেহার যে পরিমাণ ছাওয়াব নামাযের বাইরে পুরা কোরআন খতমের ছাওয়াবও ততটা নয়। তাহলে যে জামা'আত নামাযের দাওয়াত দেয় তাদের আজর ছাওয়াবের পরিমাণ অনুমান করা কিভাবে সম্ভব! প্রতিটি কাজ স্ব-স্থানে ও স্ব-ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। সুতরাং জিহাদে [২] থাকা অবস্থার যিকির আযকারের ছাওয়াব ঘরের বা খানকায় যিকির আযকার থেকে অনেক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বন্ধুগণ (আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায়) যত পারো যিকির করো।

১। বেচারা শব্দটাও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারতো না,
২। বৃহত্তর অর্থে জিহাদ অর্থ দ্বীনের প্রচার প্রসারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

মাওলানা আরো বললেন,

এ আন্দোলনের হাকীকত কি? এটা اِنۡفِرُوۡا خِفَافًا وَّثِقَالًا এর উপর আমল ছাড়া আর কিছু নয়। এতে ত্রুটি করা মানে আল্লাহর আযাব ডেকে আনা। বন্ধুগণ! তাবলীগে উছূলের পাবন্দী খুবই জরুরী। যে কোন উছূলের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটিও যদি করো তাহলে আল্লাহর যে আযাব হয়ত বিলম্বে আসতো তা অবিলম্বে তোমাদের উপর এসে যাবে। এ আন্দোলনের ইতিহাসে দুটি ঘটনা এমন আছে যে, আন্দোলন দৃশ্যতঃ উন্নতির শিখরে আরোহণ করা সত্ত্বেও উছুল অমান্য করার কারণেই আবার নীচে নেমে গেছে। সুতরাং ভাই সকল! কঠোরভাবে ছয় উছূলের পাবন্দী করো।

তিনি আরো বললেন, ইসলাম কি? ইসলাম অর্থ বর্তমানের দাবী ও হুকুম মাথা পেতে নেয়া। শয়তান আমাদেরকে বর্তমানের দাবী ও হুকুম মেনে নেয়া থেকে বিরত রাখে। আমাদের চোখের সামনে সে দু'ধরনের পর্দা টেনে দেয়।

প্রথমতঃ জুলমত ও অন্ধকারের পর্দা। অর্থাৎ নফসকে মন্দকাজের স্বাদ লাগিয়ে তাতে মজিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ নূরানী পর্দা। অর্থাৎ 'গুরুত্বপূর্ণ' থেকে 'কম গুরুত্বপূর্ণ' তে সরিয়ে আনে। যেমন, ফরযের সময় নফলে ব্যস্ত রাখে। আর নফস মনে করে যে, ভালো কাজেই তো আছি আমি।

বর্তমানের সবচে' বড় দায়িত্ব হলো দাওয়াত ও তাবলীগ। উত্তম থেকে উত্তম ইবাদতও এখন দাওয়াতে শিথিলতার বিকল্প হতে পারে না।

চা-মজলিসের পরে সিদ্ধান্ত হলো যে, আগামীকাল ভোরে পেশাওয়ারী ও দিল্লীওয়ালী জামা'আত যুক্তভাবে তাবলীগী সফরে সাহারানপুর রওয়ানা হয়ে যাবে। আমরা বিদায় নিতে হযরতের খিদমতে হাজির হলাম। বাচ্চাদেরকে না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদেরকে সাথে আনলে না কেন? আমরা ওযর পেশ করলাম। তিনি বললেন, ভাই, আসলে তোমরা নিজেরাই বাচ্চাদেরকে বোঝাতে অক্ষম। এখন নিজেদের অক্ষমতাকে চাপা দাও বাচ্চাদেরকে অবুঝ বলে। বাচ্চাদের জন্য বোঝা জরুরী নয়। তাদের কানে দেয়া, চোখের সামনে তুলে ধরা এবং অনুভবে আনাটাই হলো আসল। নচেৎ শিশুর কানে 'জন্ম-আযান' দেয়ার উদ্দেশ্য কি?

এরপর তিনি বারবার যিকিরে নিমগ্ন থাকার জোরদার তাকীদ করলেন। বললেন, যিকির হলো এক দুর্গ, যেন হানাদার শয়তান তোমাদের উপর বিজয়ী হতে না পারে। اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ 'শোন আল্লাহর যিকির দ্বারা কলব স্বস্তি লাভ করে।' আর ভাইসব! আপন সন্তানদের 'ভালো' কথা শোনাতে থাকো।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকীদসহ যিকিরের ফাযায়েল বর্ণনা চলতে থাকলো।

মৌলবী আব্দুল গাফফার ছাহেব নদভী (দিল্লীতে মাওলানার সাথে দেখা করে) সাহারানপুরে আমাদের সাথে মিলিত হলেন এবং আমাদের নামে মাওলানার পায়গাম শোনালেন যে, "তোমরা আসলে এবং ক'দিন 'বেড়িয়ে' চলে গেলে। কিন্তু মনে রেখো এ পথে ক্ষুধা পিপাসার কষ্টের প্রয়োজন রয়েছে। এ পথে কপালের ঘাম ঝরাও আর বুকের রক্ত ঝরাতে তৈরী থাকো।

দাওয়াতি কাজে আত্মনিমগ্নতা

মৃত্যুকালীন অতি কঠিন অসুস্থতার সময়ও কাজের প্রতি মাওলানার কেমন একাগ্রতা ও আত্মনিমগ্নতা ছিলো, নীচের ঘটনাগুলো থেকে তা কিছুটা হলেও অনুমান করা যাবে। আল ফোরকান-এর সম্পাদক মাওলানা মনযূর নোমানী ছাহেবের সূত্রে ঘটনাগুলো পেশ করা হচ্ছে।

শেষ এপ্রিলের দিকে মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী হযরত মাওলানাকে দেখতে ও কুশল জানতে এসেছিলেন। দু'দিন আগের মারাত্মক স্বাস্থ্যাবনতির কারণে শারীরিক দুর্বলতার চূড়ান্ত ছিলো। দু'চার মিনিটও কথা বলার শক্তি ছিলো না। শাহ ছাহেবের আগমন সংবাদ শুনে অধমকে [১] তলব করে তিনি বললেন, তাঁর সাথে আমার কিছু জরুরী কথা আছে। উপায় এই হবে যে, আমার মুখের কাছে কান পেতে তুমি শুনবে এবং কথাগুলো তাঁকে বলে যাবে। শাহ সাহেবকে ভিতরে ডাকার শুরুটা তো এভাবেই হলো কিন্তু দু'তিন মিনিট পরেই এমন সতেজ হয়ে উঠলেন যে, সরাসরি সম্বোধনে নিজেই কথা বলতে লাগলেন এবং একাধারে ত্রিশ মিনিট কথা বললেন।

১। মাওলানা মনযূর নোমানী

ঐ এপ্রিল মাসেই অসুখের বেশী রকম বাড়াবাড়ির দিন দু'ঘন্টার মতো প্রায় বেহুঁশ অবস্থা ছিলো। এমন কি চোখের পাতাও বন্ধ ছিলো। অনেক পরে হঠাৎ চোখ খুলে বলতে শুরু করলেন

اَلْحَقُّ يَعْلُوْ اَلْحَقُّ يَعْلُوْ اَلْحَقُّ يَعْلُوْ وَ لَا يُعْلٰى

(সত্যের বিজয় হবে, বিজয় হবে, বিজয় হবে, কখনো সত্যের পরাজয় নেই। এরপর কেমন এক ভাবনিমগ্ন অবস্থায় (অভ্যাসের বিপরীত) কিছুটা সুর প্রয়োগ করে তিনবার এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

মুমিনদের মদদ করা আমার দায়িত্ব।

মসজিদের চত্বর থেকে তেলাওয়াতের উচ্চ আওয়াজ শুনে আমি হযরতের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম শুনলাম, ভিতরে খাছ খাদেমকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। সাথে সাথে হাজির হলাম। আমাকে দেখে বললেন, মৌলবী ছাহেব! আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, এ কাজ হবে এবং আল্লাহর মদদ একে পূর্ণতা দান করবে। তবে শর্ত হলো সাহায্যের ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রাখা এবং দু'হাত পেতে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে থাকা এবং সাধ্য পরিমাণ চেষ্টায় কোন ত্রুটি না করা।

একথার পর আবার চোখ বুজে এলো। কিছুক্ষণের গভীর নিরবতার পর এতটুকু শুধু বললেন, "হায়, ওলামায়ে কেরাম যদি এ কাজের দায়িত্ব নিতেন এরপর আমরা চলে যেতাম।" আশ্চর্যের বিষয় ছিলো এই যে, তাঁর স্বাস্থ্যের যতই ক্রমাবনতি ঘটছিলো আল্লাহর দ্বীন যিন্দা করার তড়প ও জযবা ততই যেন বেড়ে চলেছিলো।

কয়েক মাস তো হযরতের দুর্বলতা ও নির্জীবতার এমনই নাযুক অবস্থা ছিলো যে, বাঘা বাঘা মানুষও তখন ঠোঁট নেড়ে কিছু বলার কথা চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু আগাগোড়া এ নাযুক সময়কালেও প্রত্যক্ষদর্শীরা সাধারণতঃ তিন অবস্থার কোন এক অবস্থাতেই তাঁকে পেয়েছে।

১। হয় দ্বীন পুনরুজ্জীবনের দাওয়াতি চিন্তায় ডুবে আছেন।

২। কিংবা ভগ্ন হৃদয়ের অশেষ আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ মুনাজাত করছেন। দাওয়াতকর্মীদের জন্য ইখলাছ ও অবিচলতা, মোহম্মদী তরীকা ও পছন্দনীয় উছূলের পাবন্দী এবং সন্তুষ্টি ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছেন এবং এমন দরদের সাথে করছেন যে, অনেক সময় পাশে বসা লোকদেরও কান্না এসে যায়।

৩। কিংবা কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন হেদায়াত ও নীতি নির্দেশনা দান করছেন।

এমনকি চিকিৎসা উপলক্ষে হেকীম ডাক্তার যারা আসতেন তাদেরকেও আগে 'নিজের কথা' শোনাতেন তারপর দেখা শোনার সুযোগ দিতেন। হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ ছাহেব একদিন দিল্লীর প্রসিদ্ধ এক ডাক্তার নিয়ে এলেন। মাওলানা বড় আশ্চর্য প্রজ্ঞার সাথে তার কাছে দাওয়াত পেশ করলেন। বললেন, ডাক্তার সাহেব! আপনার কাছে মানুষের উপকারী এক বিদ্যা আছে। কিন্তু এ বিদ্যাকে নিষ্প্রভ করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ)-কে অন্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ নিরাময় করা, মৃতকে জীবন দান করা ইত্যাদি কতিপয় প্রকাশ্য মুজিযা দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো। আর এটা তো আপনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাঁর সমস্ত প্রকাশ্য মুজিযাসমূহ থেকে বহুগুণে উত্তম ছিলো। তো আমি আপনাকে বলতে চাই যে, আমাদের প্রিয় নবী খাতামুল আম্বিয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রেরিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিধান এমন উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শরীয়তকে তা অচল করে দিয়েছে। এবার তবে ভেবে দেখুন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি মনোযোগ না দেয়া কত বড় বে-কদরির ব্যাপার! মানুষকে আমরা একথাই শুধু বলি যে, এ নেয়ামতের পূর্ণ ফায়দা গ্রহণ করো। অন্যথায় বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

'দ্বীন যিন্দা করার ফিকির' এই একটি বিষয় ছাড়া আর কোন প্রসংগে কিছু বলা তো দূরের কথা, শোনা পর্যন্ত বরদাশত ছিলো না তাঁর। কেউ অন্য প্রসংগ শুরু করলে বেশীর ভাগ সময়ই সহ্য করতে পারতেন না। সাথে সাথে থামিয়ে দিতেন। শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন "ভাই! সুস্থতা ও অসুস্থতা তো মানুষের নিত্যসংগী। তার আবার কুশল অকুশল কি? কুশল তো হবে তখনই যখন মানুষ যে কাজের জন্য পয়দা হয়েছে সে কাজে লেগে থাকবে

এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক শান্তি পাবে। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অবস্থার উপর রেখে গিয়েছিলেন তাতে সামান্যতম পরিবর্তন আসাকেও ছাহাবা কেরাম অকল্যাণ মনে করতেন।[১]

হাজী আব্দুর রহমান ছাহেব বলেন, মাওলানার জন্মস্থান কান্ধলা থেকে কিছু আত্মীয়–স্বজন কুশল জানতে এসেছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বললেন, যে শরীর (মাটির সাথে) মিশে যাওয়ার জন্যই তৈরী হয়েছে তার কুশল জানতে কান্ধলা থেকে ছুটে এসেছো। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রীয় দ্বীন দুনিয়া থেকে মুছে যাচ্ছে কিন্তু তোমরা তার কোন খবর নাও না।

এক শুক্রবার মাওলানা ইউসুফ ছাহেব ফজরের ইমামতিতে কুনূতে নাযেলা পড়লেন। নামাযের পর এক মেওয়াতি খাদেমের মাধ্যমে হযরত মাওলানা তাঁকে ডাকিয়ে বললেন, কুনূতে নাযেলায় অন্যান্য কাফির দলের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে 'সাধনাশক্তি' ব্যবহারকারী অমুসলিম সাধু সন্ন্যাসীদেরও নিয়ত করা উচিত।

এখানে হযরত মাওলানা মূলতঃ সাহারানপুরের এক হিন্দু–মুসলিম বিতর্ক সভার ঘটনার দিকে ইংগিত করেছেন। জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী সেখানে মুসলিম তার্কিকের বিরুদ্ধে সাধনাশক্তি ব্যবহার করার ফলে তিনি বক্তব্য উপস্থাপনে 'জড়তা' বোধ করছিলেন। সভায় উপস্থিত মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেবের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হলে তিনি পাল্টা তাওয়াজ্জুহ দিলেন এবং স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি নিবদ্ধ করলেন তখন হিন্দু সাধু ঘাবড়ে গিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করলো। আর সংগে সংগে মুসলিম তার্কিকের বাকজড়তা দূর হয়ে গেলো।

ঐ দিন সকালে আমি অধম ও মাওলানা মুহম্মদ মঞ্জুর ছাহেব সংক্ষিপ্ত বয়ান রাখলাম। হযরত মাওলানার সংকটজনক স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে সকলেই বিষণ্ন ছিলো। যে মিম্বর থেকে মাওলানা একদা বয়ান করতেন, আজকের সেই শূন্য মিম্বরের অতীত স্মৃতি স্মরণ করে কেমন একটা 'আপ্লুত' অবস্থা ছিলো সকলের। বিশেষতঃ বয়ানের এক পর্যায়ে যখন বলা হলো, এ মিম্বর ও মিহরাবকে আল্লাহ আবাদ রাখুন। এখান থেকে কতবার আপনারা

১। আল ফোরকান সাময়িকী, রজব–শাবান সংখ্যা ১৩৬৩হিঃ

শুনেছেন..... তখন মজলিসের সব ক'টা চোখ ছিলো অশ্রু ছলছল।

বেশ কয়েক বছর ধরে বিষ্যুদবার রাতের মজমায় হযরত মাওলানা নিয়মিত তাবলীগী বয়ান রাখতেন। বিভিন্ন মহল্লা থেকে এমনকি মাঝে মধ্যে অন্যান্য শহর থেকেও বহু লোক জমায়েত হতো। অন্তিম অসুস্থতার দিনগুলোতে এই লোক সমাগম আরো বেড়ে যেতো। মাওলানা নিজে তো বয়ান করতে অপারগ ছিলেন। কিন্তু কাজকাম ও আয়েশ আরাম ছেড়ে দ্বীনের জন্য যারা এখানে আসবে তারা বেকার সময় কাটাবে কিংবা তাদের আসা যাওয়া শুধু ব্যক্তিগত কুশল জিজ্ঞাসা এবং হাত পা দাবানোর খিদমতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে; এটা তিনি মেনে নিতে পারতেন না। দ্বীনের ডাকে আগত মানুষের আল্লাহকেন্দ্রিক এই মুহব্বত ও দ্বীনী জযবার অপব্যবহার কিংবা অপব্যয়কে তিনি বিরাট খেয়ানত মনে করতেন। এজন্য নিজের ভিতরে তাগাদা অনুভব করতেন যেন আগত লোকদেরকে দ্বীনী কাজে মশগুল রাখা হয় এবং এখান থেকে প্রচারিত বিশেষ দাওয়াত তাদের সামনেও যেন পেশ করা হয়। এক্ষেত্রে সামান্য বিলম্ব বা শিথিলতা মাওলানার নাযুক তবিয়ত বরদাশত করতে পারতো না।

এক বিষ্যুদবারে মাগরিব বাদ মসজিদের ছাদে জমায়েত লোকদের সামনে বয়ান করার হুকুম হলো। বয়ান শুরু হতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হলো। এরই মধ্যে লোক মারফত দু' তিনবার জলদি বয়ান শুরু করার তাগিদসহ বলে পাঠালেন যে, এক একটি মিনিটের অপচয় আমার জন্য অসহনীয় হচ্ছে। বয়ানের মাসনূন খোতবা শুরু হওয়ার খবর পেয়ে তবেই মাওলানার ইতমিনান ও স্বস্তি হলো।

শেষ মাস

অবস্থা দিন দিন নাযুক থেকে নাযুকতর হয়ে চলেছিলো। দাঁড়িয়ে নামায পড়তে যখন অপরাগ হয়ে গেলেন তখন কাতারের এক কিনারে খাটিয়া রেখে দেয়া হতো। তাতেই তিনি বা–জামা'আত নামায পড়ে নিতেন।

সে সময় নিযামুদ্দীনে অবস্থানকারী মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব বলতে গেলে চিকিৎসাবিষয়ক পরামর্শদাতা ও জিম্মাদার ছিলেন। আম মজমার বয়ান

এবং বিভিন্ন জলসার তাকরীর সাধারণতঃ তিনিই করতেন। তাঁর উপস্থিতিতে হযরত মাওলানা বড় স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতেন। ২৮শে জুমাদাসসানী (মুতাবেক ২১শে জুন) শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবও তাশরীফ আনলেন।

৩০শে জুমাদাস–সানী ৬৩ হিজরী (মুতাবিক ২৩শে জুন ৪৪ সন) তারিখে নূহ অঞ্চলস্থ মুঈনুল ইসলাম মাদরাসার বার্ষিক জলসা ছিলো। সম্ভবতঃ মাদরাসার এটাই ছিলো মাওলানার উপস্থিতিবিহীন প্রথম বার্ষিক জলসা। ২৩শে জুন সকালে বাসযোগে নিযামুদ্দীনের কাফেলা রওয়ানা হলো। মাওলানা ইউসুফ ছাহেব জামা'আতের আমীর হলেন। মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব, মাওলানা মঞ্জুর ছাহেব, মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব কুদ্দুসী, মৌলবী আমীর আহমদ ছাহেব, জনাব আব্দুল মুগনী ছাহেব, (প্রফেসর মহারাজা কলেজ জয়পুর) মুহতারাম চাচা সৈয়দ আযীযুর রহমান কাফেলায় শরীক ছিলেন। এছাড়া লৌখনোর জামা'আতও ছিলো। কিছুক্ষণ যিকির, কিছুক্ষণ ফিকির এবং কিছুক্ষণ বয়ান ও ইলমী আলোচনার মাঝে সফরের পথ অতিক্রম হলো। বেলা প্রায় দু'টার সময় আমাদের পৌঁছার সাথে সাথে জলসা শুরু হয়ে গেলো। মাওলানার নিজ হাতে লাগানো বাগান সামনে ছিলো এবং বেশ সজীব ও পুষ্পময় ছিলো। বাগান ছিলো, বাগানের সবকিছু ছিলো, বাগানের মালিক শুধু ছিলো না।

রাত্রে যখন পুনরায় জলসা শুরু হলো তখন স্থানীয় ইংরেজী হাই স্কুলের ছাত্রাবাসের একটি ভবনে আগুন লেগে গেলো। গোটা মজমা আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অতিকষ্টে আগুন আয়ত্তে আনা হলেও ভবনটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

আমাদের রাত যাপনের ব্যবস্থা হলো মসজিদের সেই কোণায় যেখানে সব সময় হযরত মাওলানার খাটিয়া পাতা হতো আর নিবেদিতপ্রাণ মেওয়াতি পতংগদল হিদায়াতের এই উজ্জ্বল প্রদীপের চারপাশে জড়ো হতো। শেষ জুনে প্রচণ্ড গরম ছিলো। কিন্তু নূহ এর আবহাওয়ায় কিংবা মানুষের দিলে সেই তাপদগ্ধতা ছিলো না যার উৎস ছিলো হযরত মাওলানার দরদভরা কথা, নামাযের পর সমর্পিতচিত্তের সকাতর প্রার্থনা এবং সার্বক্ষণিক অস্থিরতা ও

ব্যাকুলতা, যা জলসার দিনগুলোতে মেওয়াতে অবস্থানকালে তাঁর মাঝে অতিমাত্রায় দেখা যেতো।

নূহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত মাওলানা জলসার কার্যবিবরণী শুনলেন। আগুন লাগার ঘটনা শুনে বললেন, তোমরা যিকির কম করেছো। তাই শয়তানের দল সুযোগ পেয়ে গেছে।

কেউ একজন ইংরেজী স্কুলে আগুন লেগেছে বলে খুশি প্রকাশ করলো। তখন মাওলানা সামনাসামনি তো কিছু বললেন না কিন্তু মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত সম্পদের ক্ষতিতে আনন্দ প্রকাশ তাঁর খুবই অপছন্দ হলো। অন্য এক সময় তিনি বললেন, এটা আমার পছন্দ হয়নি। এটা খুশির বিষয় নয়।

মৌলবী ইউসুফ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাবলীগী জামা'আতগুলো রওয়ানা হওয়ার দৃশ্য কি মাওলানা জাফর আহমদকে দেখিয়েছো? তিনি না বাচক উত্তর দিলেন। হযরত মাওলানা বললেন, বড় ভুল করেছো। এটাই তো দেখার জিনিস ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক যুগে মুসলমানদের ওয়াফদ ও জামা'আত কিভাবে রওয়ানা হতো।

সমাসন্ন পরম মুহূর্ত

এটা হযরত মাওলানার পূর্ণ অনুভবে ছিলো যে, পরম মুহূর্ত সমাসন্ন। আর মৃত্যু–লগ্নের কোন নড়চড় হতে পারে না। কখনো কখনো কোন দ্বীনী স্বার্থে কিংবা কর্মোদ্যম ও কর্মতৎপরতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তা প্রকাশও করে দিতেন। মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব দেখা করতে এলে তাকে বললেন, তুমি আমার সাথে সময় দেয়ার ওয়াদা করেছিলে। এখনও তো ওয়াদা পুরা করলে না। তিনি বললেন, এখন তো বেশ গরম। ইনশাআল্লাহ রমযানের ছুটিতে এসে কিছু সময় ব্যয় করবো। মাওলানা বললেন, তুমি রমযান বলছো। আমার তো শাবান ধরতে পারবো বলেও আশা হয় না। একথা শুনে মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব থেকে যাওয়ার ফায়সালা করে ফেললেন।

চৌধুরী নওয়ায খানকে বললেন, ভাই, তুমি এখানেই পড়ে থাকো। বিশদিনের ব্যাপার। এদিক বা সেদিক কিছু একটা হয়ে যাবে।

(আল্লাহর কি শান! এর ঠিক বিশদিন পরেই তিনি 'সেদিকে' চলে গেলেন)।

এ অধমকেও তিনি কয়েকবার বলেছেন, এ রোগের হাত থেকে বাঁচবো বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য আল্লাহর কুদরতে সবকিছুই আছে। বেঁচে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে শুশ্রূষাকারীদের অন্তরে আশার সঞ্চার হয় এমন কথাও মাঝে মধ্যে বলতেন।

চিকিৎসা পরিবর্তন

শুরু থেকেই তিনি হাকীম করীম বখশ (পাহাড়গঞ্জ) এর চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে ইউনানী চিকিৎসা পরিবর্তন করে মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেবের পরামর্শে বায়োকেমিক চিকিৎসা শুরু হলো। অবশেষে দিল্লীর প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার আব্দুল লতীফ ছাহেবের চিকিৎসা গ্রহণ করা হলো। ইতিমধ্যে রোগ বেশ জটিল হয়ে পড়েছিলো। ডাক্তার শওকাতুল্লাহ আনসারী ছাহেব প্রথম থেকে আন্ত্রিক জ্বর নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু বলতে গেলে তিনি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ডাক্তার আব্দুল লতীফ ছাহেবের রোগনির্ণয় ছিলো ভিন্ন। তিনি সম্ভবতঃ পুরোনো আমাশয় ধরেছিলেন। সে সময় তাপমাত্রা বরাবর উর্ধ্বমুখী ছিলো। শেষে ডাক্তার ছাহেব ইঞ্জেকশন প্রয়োগের ব্যবস্থা দিলেন এবং অনেক দু'আর পর বড় আশা নিয়ে ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো।

বিশেষ শুশ্রূষা ও খেদমতকারীগণ

মৌলবী ইকরামুল হাসান কান্ধলবী ছাহেব (মাওলানার ভাগ্নে) ঔষধ পান করানোর যিম্মাদার ছিলেন। পথ্যের যিম্মাদারি ছিলো মৌলবী লতীফুর রহমান ছাহেবের উপর। মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব ও মাওলানা ইহতিশামুল হাছান ছাহেব সাধারণ পরামর্শ দিতেন ও তত্ত্বাবধান করতেন। মৌলবী ওয়াছিফ আলী ছাহেব অযু ও নামাযের দায়িত্ব পালন করতেন। চৌধুরী নওয়ায খান, নম্বরদার মেহরাব খান এবং বিশেষভাবে উম্মিদ খান, রহীম খান, রহীম বখশ ও সোলায়মান খুব দরদের সাথে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে খিদমত করছিলেন। (কুশনগঞ্জের ব্যবসায়ী) মোহম্মদ ইউসুফ ছাহেব ঘন্টার পর ঘন্টা রাত জেগে মাথায় মালিশ করতেন। মাওলানা তাঁর খিদমতকারী ও শুভার্থীদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলতেন, আমার খাদেমদেরকে খাদেম মনে করো না। এরা

সকলেই মাখদুম (খেদমত লাভের যোগ্য)। আসলে এরা বিরাট দৌলত কামিয়েছে।

দিল্লীর ব্যবসায়ীবৃন্দ

দিল্লীর ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী মাওলানার এ নাযুক অবস্থায় বিষণ্ন ও ভারাক্রান্ত ছিলেন। অনেকে নিজেদের মাঝে সমঝোতাপূর্বক পালাক্রমে হাজির থাকতেন। সাধারণতঃ দু'দিন, তিনদিনের জন্য তারা নিযামুদ্দীনে এসে পড়ে থাকতেন এবং যথাসাধ্য খিদমতের চেষ্টা করতেন।

শুধু শারীরিক সেবা ও ব্যক্তিসম্পর্কের প্রতি অসন্তুষ্টি

কোনভাবে যদি হযরত মাওলানার অনুভব হতো যে, অমুকের সম্পর্ক শুধু আমার ব্যক্তির সাথে তাহলে খুব নারায হতেন এবং কষ্ট পেতেন। তিনি বলতেন, সম্পর্ক হওয়া উচিত দ্বীনের সাথে, ব্যক্তির সাথে নয়। এমন কারো খিদমত ও আরাম পেতে তিনি রাজি ছিলেন না যে শারীরিক খিদমতকেই যথেষ্ট মনে করতো। জনৈক মেওয়াতি একবার মাথায় তেল মালিশ করছিলো। হঠাৎ তাকে দেখে চিনতে পেরে বললেন, তুমি তো কখনো তাবলীগের কাজে অংশ নাও না। তোমার খেদমত আমি নিতে পারি না। ছেড়ে দাও।

তাঁর খিদমতে আগত একব্যক্তি সম্পর্কে মাওলানা মুহম্মদ মনযূর ছাহেবকে তিনি বললেন, আমার সাথে এঁর বড় মুহব্বতের সম্পর্ক। কিন্তু কখনো ইনি আমার এ কথাটা মানেননি এবং দাওয়াত কবুল করেননি। অথচ আমার খিদমতের জন্য নিবেদিত। আপনি তাকে নিয়ে গিয়ে বুঝান, যেন তিনি এ কাজে শরীক হন। নচেৎ আমার কষ্ট হয়। মাওলানা মনযূর ছাহেব তাকে আলাদা নিয়ে গেলেন এবং কথা বললেন। বৃদ্ধ বুজুর্গ বললেন, (বোঝানোর দরকার নেই) আমি তো এবার কাজে শরীক হওয়ার ফায়সালা করেই এসেছি। হযরতকে সে কথা জানানো হলো। হযরত তখন তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন এবং মুহব্বতের সাথে তাঁর হাতে চুমু খেলেন।

বাইরে কাজের অগ্রগতি

বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা চিঠিপত্র থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে, চারদিকে তখন অশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ এগিয়ে চলেছে। যে সব শহর ও লোকালয়ে দীর্ঘদিন থেকে একটা শীতল অবস্থা বিরাজমান ছিলো এবং কাজ করে যাওয়া খুবই মুশকিল মনে হচ্ছিলো সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে অনুকূল পরিবেশ ও নুতন প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। এই অসুস্থতাকালে কিছু নতুন মারকাযে কাজের বিসমিল্লাহ হয়ে গেলো। মৌলবী আব্দুর রশীদ মিসকীন ছাহেবের আবদার অনুরোধে এক বড় জামা'আত ভূপাল সফর করলো। জনাব মুফতী কেফায়াতুল্লাহ ছাহেবও তাতে শরীক হয়েছিলেন। মৌলবী আব্দুর রশীদ ছাহেব নোমানী ও প্রফেসর আব্দুল মুগনী ছাহেবের উদ্যোগে জামা'আত দু'বার রায়পুর সফর করলো। কাজের জোশ-উদ্দীপনা নতুন এলাকাগুলোর মধ্যে মুরাদাবাদেই বেশী ছিলো। সেখান থেকে কাজের অব্যাহত অগ্রগতির খবর আসছিলো। প্রতিনিধিদলও এসেছিলো কয়েকবার।

ক্রমবর্ধমান দাওয়াতি জযবা

মৃত্যুর নির্ধারিত সময় যতই ঘনিয়ে আসছিলো তবীয়তের নাযুকতা ও অস্থিরতা এবং দাওয়াতের জযবা ও স্পৃহা ততই বেড়ে চলেছিলো। দাওয়াত ছাড়া অন্য কিছু দেখার বা শোনার সহন ক্ষমতা ক্রমে লোপ পাচ্ছিলো। শরীর স্বাস্থ্যের বিধ্বস্ত অবস্থা সত্ত্বেও মৃত্যুশয্যা থেকেই স্বয়ং পুরো কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন। রাতদিন বারবার ডেকে ডেকে কাজের খুঁটিনাটি নির্দেশ ও নির্দেশনা দিতেন এবং বিভিন্ন জনের নামে পায়গাম ও বার্তা পাঠাতেন। এমনকি আলোচনার মজলিসে, দরসের হালকায় ও খানার দস্তরখানে দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া অন্য কথা হচ্ছে কি না সে বিষয়েও বরাবর নজরদারি রাখতেন। কখনো এমন কিছু আঁচ করতে পারলে নাযুক তবিয়তের জন্য তা খুবই কষ্টদায়ক হতো। সর্বক্ষণ যিকির-ফিকির ও তালিম তাবলীগে মশগুল থাকার জন্য তাকিদের পর তাকিদ দিয়ে যেতেন এবং রূঢ়তা ও তিরস্কারের পরিবর্তে উপদেশের কোমলতা ও তারগীবের মিষ্টতা দ্বারা উদ্দেশ্য হাছিল করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকার ইংগিতে সতর্ক করতেন। একবার যোহর বাদ

ওলামায়ে কেরামের জন্য নির্ধারিত দরসে যেতে অলসতা হয়ে গেলো। মাওলানা অত্যন্ত কুশলী ভাষায় বার্তা পাঠালেন এবং আমিও সতর্ক হয়ে গেলাম। জনৈক বিশিষ্ট আলিম ব্যস্ততার ওজরে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতেন। একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আপনি নিজের পক্ষ থেকে তার অনুপস্থিতির ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করুন। প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের আরেকটা উপায় ছিলো ঐ বিষয়ের ফাযায়েল বয়ান করা, যাতে নিজস্ব ভাবেই তার গুরুত্বের অনুভূতি জাগ্রত হয়।

বিভিন্ন তাবলীগী জলসার কারগুজারি ও কার্যবিবরণী শোনার জন্য তিনি ব্যাকুল প্রতিক্ষায় থাকতেন। এক রাত্রে মীর দরদ রোড-এর জলসা শেষে সওয়ারি না পাওয়ার কারণে রাতে নিযামুদ্দীন পৌঁছা সম্ভব হলো না। ভোরে গিয়ে শুনি; রাতে কয়েকবার খোঁজ হয়েছে। খিদমতে হাজির হওয়া মাত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনে তবে সুস্থির হলেন।

দুর্বলতার কারণে তবিয়তের নাযুকতা এবং নিজস্ব কাজের প্রতি সংবেদনশীলতা এমনই বাড়ন্ত ছিলো যে, আগে যে সব জিনিস মেনে নিতেন এখন তা শোনার মতো সহন ক্ষমতাও ছিলো না। নিজস্ব দ্বীনী প্রসংগ ছাড়া অন্য কোন তথ্য মোটেই বরদাশত হতো না। হালকায়ে দরসে একবার ইতিহাসের আলোচনা এবং মুসলিম শাসকদের সমালোচনা শুরু হলো। দরসে উপস্থিত লোকেরা নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে লাগলো। আল্লাহ জানেন, কিভাবে যেন তা হযরত মাওলানার কানে গেলো আর আমাদেরও 'কানমলা' খাওয়ার উপক্রম হলো। মৌলবী মুঈনুল্লা মাখফী হুকুম নিয়ে এলেন যে, এক্ষুণি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দাও এবং প্রসংগমুখী হও। তাকরীর বায়ানের ক্ষেত্রেও জোর তাকিদ ছিলো যেন مَا قَلَّ وَدَلَّ [১] মুলনীতি অনুযায়ী দীর্ঘ বাক্যবিস্তারের পরিবর্তে অল্প কথায় মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ পরিমাণ সামান্য কিন্তু মান যেন হয় অসামান্য। খোতবায়ে নববী সম্পর্কে হাদীছ শরীফে যেমন এসেছে-

كَاَنَّهٗ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَ مَسَاكُمْ *

১। অর্থাৎ স্বল্প শব্দের ভাব সমৃদ্ধ কথাই উত্তম কথা

মনে হতো, হানাদার বাহিনীর আসন্ন হামলা সম্পর্কে যেন তিনি সতর্ক করে বলছেন, সকালে বা সন্ধ্যায়, যে কোন লমহায় তোমাদের উপর হামলা হতে যাচ্ছে।

বয়ানের মাঝে প্রাসংগিক ঘটনা ও কাহিনী উপস্থাপন এবং কবিতা ও প্রবাদ প্রবচন পরিবেশন তিনি মোটেই শুনতে পারতেন না। বক্তৃতার নিয়ম ও ধারা অনুসরণ করে যখনই কোন বক্তা বক্তব্য সম্প্রসারণ ও বিষয়বৈচিত্র আনয়ন করতেন তখনই মাওলানার অপ্রসন্নতা শুরু হয়ে যেতো। বলতেন, আসল বিষয় বলো কিংবা কথা বন্ধ করো। আরও বলতেন, বক্তৃতা চালানো থোড়াই আমার উদ্দেশ্য! সে তো বিভিন্ন মাদরাসায়, বিভিন্ন জলসায় হয়েই থাকে। এ কারণে শুশ্রূষাকারীগণ সদা সতর্ক থাকতেন যেন বক্তার আওয়াজ মাওলানার কানে না আসে, যাতে বক্তার স্বতঃস্ফূর্ততা ক্ষুণ্ন না হয়। আবার মাওলানারও কষ্ট না হয়।

এক শুক্রবার সকালে বিরাট মজমা ছিলো। মুরাদাবাদের জামা'আত ছিলো এবং কিছু ওলামায়ে কেরাম ছিলেন। বয়ানের জন্য এ অধমের নির্বাচন হলো। আমি বক্তৃতার ধাচেই শুরু করলাম এবং বিষয়বস্তু সম্প্রসারিত করলাম। কিছুক্ষণ পরেই মাওলানার হুকুম হাজির হলো। মূল বক্তব্যে ফিরে এসো এবং আসল পায়গাম পৌঁছাও। আমিও মূল কথা বলে বক্তব্যের ইতি টেনে দিলাম।

আছরের পর স্বাভাবিক নিয়মেই মজমা হয়ে যেতো। সাধারণতঃ মাওলানা উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে কোন পায়গাম ও বাণী পাঠাতেন। মজমায় তা শুনিয়ে দেয়া হতো। সেদিন জ্বরের উচ্চ মাত্রার কারণে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি কিছু বলতে পারেননি। আমি তো সকাল থেকেই ভয়ে জড়সড়!

শায়খুল হাদীছ ছাহেব বয়ানের জন্য বললেনও। কিন্তু আমি অপারগতা জানিয়ে বললাম, কি বলবো? বক্তৃতা তো উদ্দেশ্য নয়। আর এখন বলার মতো বিশেষ কোন কথা জানাও নেই। হুঁশ ফিরে আসার পর হযরত মাওলানা বললেন, আজ মজমায় বয়ান কেন হলো না। সময় কেন নষ্ট করা হলো? আরয করা হলো, হযরত তো বলার জন্য কোন বাণী দেননি। তিনি বললেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? আরয করা হলো। এত জ্বরের মধ্যে কষ্ট দেওয়া ভালো মনে হয়নি। তিনি বললেন, দ্বীনের মুকাবেলায় আমাকে কেন তোমরা

অগ্রাধিকার দিলে। আমার কষ্টের চিন্তা কেন করলে? মোটকথা, সময় হাতছাড়া হওয়ার খুবই আফসোস করতে লাগলেন।

(সকালে বক্তৃতার সময় তাড়া খাওয়ার কারণে) আমার তবীয়ত কিছুটা মনমরা ছিলো। মাগরিবের নামায খুবই বিস্বাদ অবস্থায় পড়া হলো। বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা ও দুশ্চিন্তার ভিড় ছিলো। মন ক্রমশঃ দমে যাচ্ছিলো। সালাম ফেরামাত্র তলব হলো। অতিস্নেহে মাথায় হাত বুলালেন। অনেক আদর করে বললেন, এতেই ঘাবড়ে গেলে! ভেংগে পড়লে! হিম্মত বুলন্দ করো। তারপর বললেন, তোমার কোন সাহায্যকারী নেই? পরে নিজেই বললেন, মৌলবী ওয়াছিক, মৌলবী সাঈদ খান ও মৌলবী ওবায়দুল্লাহ অবশ্য আছে।

কতিপয় বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

এ সময় তিনি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সারা জীবন যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তারচে' বেশী গুরুত্ব দিতে লাগলেন। এর মধ্যে আবার ইলম ও যিকিরের প্রতি তাকিদ ও তারগীর ছিলো সবচে' বেশী। কেননা ইলম ও যিকির ছাড়া এ কাজ বিভিন্ন আধুনিক আন্দোলনের ন্যায় নিছক প্রাণহীন এক কর্মকাঠামো এবং নিয়মকানুনসর্বস্ব এক 'বস্তুনির্ভর' ব্যবস্থা হয়ে পড়ার ষোল আনা আশংকা রয়েছে। তাই সব সময় তিনি শংকিত ও কম্পিত থাকতেন এবং মনের উপর ভীষণ একটা চাপ ও বোঝা অনুভব করতেন। বারবার সবাইকে এ বিষয়ে সতর্ক করে ইলম ও যিকিরের জোর তাকীদ দিতেন। নিজে বলতেন এবং অন্যদের দিয়েও বলাতেন যে, ইলম ও যিকির হলো এ দাওয়াতি গাড়ীর দুটি চাকা যা ছাড়া তা চলতে পারে না। কিংবা দুটি ডানা যা ছাড়া সে উড়তে পারে না। বস্তুতঃ ইলম ও যিকির হলো পরস্পর অপরিহার্য ও সম্পূরক। একটি ছাড়া অন্যটি গোমরাহীর অন্ধকার। একটি ছাড়া অন্যটি ফিতনার দুয়ার! আর ইলম ও যিকির ছাড়া এ দাওয়াতি আন্দোলন আগাগোড়া বস্তুবাদিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম সমাজের যে বিরাট অংশ সীমাহীন পশ্চাদ্‌পদতা ও মুর্খতার শিকার, তাদের প্রতি অপরিসীম দরদ এবং তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও দাওয়াতের প্রবল চিন্তা ও আগ্রহ। এ উদ্দেশ্যে খুব যত্ন ও গুরুত্বের সাথে তিনি

সড়ক পারে মসজিদ সংলগ্ন একটি মকতব এবং আরেকটু আগে বেড়ে চৌরাস্তার মুখে হুক্কা পানির ব্যবস্থা সম্বলিত আরেকটি মক্তব কায়েম করলেন।[১] শহরে ও মেওয়াতি মুবাল্লিগদেরকে জোর তাকীদসহ বলে দিলেন, যেন তারা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং পথচারী মুসলমানদেরকে হামদরদী ও মুহব্বতের সাথে ডেকে হুক্কা-পানি দ্বারা আপ্যায়ন করে। অতঃপর হিকমতের সাথে তাদের কালিমা শোনা হয় আর তাদেরকে দ্বীনী কথা শোনানো হয় এবং তাদের অন্তরে দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ জাগ্রত করার কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়। মাওলানার কাছে এ কাজের এত গুরুত্ব ছিলো যে, লোক পাঠিয়ে তিনি সেখানকার খোঁজ খবর নিতেন এবং পথচারী মুসলমানদেরকে হুক্কা-পানি দ্বারা আপ্যায়নের ছাওয়াব ও ফযীলত তাদের বোঝাতেন। তখন ছিলো আজমিরী ওরসের যামানা। হিন্দুস্তানের দূর দূরান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক সাধারণ গরীব মুসলমান হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ)-এর যিয়ারতে আসতো। পথে গাছের শীতল ছায়া এবং তাজা হুক্কা ও ঠাণ্ডা পানি দেখে তাদের লোভ হতো একটুখানি জিরিয়ে নেয়ার। 'ধূম্র সেবনের' এই অবসরে মুবাল্লিগগণ তাদের 'আসল কাজ' সেরে ফেলতেন। কোমল ও বিনম্র ভাষায় তাদেরকে দ্বীনের পায়গাম শুনিয়ে দিতেন। এভাবে হাজারো জাহিল মুসলমানের কানে তারা দ্বীনের কথা পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ-ই জানেন তাঁর কত পথভুলা বান্দা এই 'চলতি পথে' হিদায়াতের আলো লাভ করেছে। কখনো কখনো ফজরের পূর্বে দু'একজন আলিমকে মথুরাগামী সড়কে উটচালক ও গাড়ীওলাদের মাঝে তাবলীগের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

তৃতীয়তঃ যাকাত আদায় করা এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আদব ও শরীয়ত সম্মত পন্থা শিক্ষাদান। এদিকে যথাযোগ্য মনোযোগ নিবদ্ধ করার অবকাশ তো মাওলানার জীবদ্দশায় ঘটেনি। তবে অন্তিম মুহূর্তে এ বিষয়ে বড় ফিকির ছিলো। ব্যবসায়ী ও বিত্তশালীদের সমাগম তো হতো সেখানে। হযরত মাওলানা নিজে এবং অনান্যদের মাধ্যমে তাদের সামনে বারবার এ পায়গাম তুলে ধরেছেন যে, অন্যান্য ইবাদতের মতো যাকাতের একই রকম ইহতিমাম করা এবং হকদারদেরকে নিজে তালাশ করে যাকাত আদায় করা মানুষের কর্তব্য। সর্বোপরি যাকাত আদায় করতে পেরে নিজেকেই কৃতার্থ মনে করা উচিত। মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব ও অন্যান্যরা এ বিষয়ে বহুবার বয়ান করেছেন।

চতুর্থতঃ ডাক ও চিঠির গুরুত্ব। ডাকযোগে প্রাপ্ত চিঠিপত্র প্রতিদিন বাদ ফজর উপস্থিত মাজমাকে পড়ে শোনানো এবং উত্তর লেখার ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার বিশেষ তাকীদ ছিলো। চিঠিপত্রের যাবতীয় বিষয় ও সমস্যা মজমায় পেশ হতো এবং এর সমাধানকল্পে তাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হতো। ডাক খোলার আগে এ সম্পর্কিত এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলা হতো, আপনাদের সামনে এ ডাক খোলার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের বর্তমান হালাত ও অবস্থা সম্পর্কে আপনাদেরকে চিন্তা ফিকিরের সুযোগ দেওয়া এবং আপনাদের মাঝে দ্বীনী চিন্তা ফিকিরের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিজেদের যে চিন্তাশক্তি এতদিন 'সংসার ধর্মে' ব্যয় হয়ে আসছে তা 'দ্বীন ধর্মের' কাজেও ব্যয় করার উদ্বোধন ঘটানো।

বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত কারণে এ সকল চিঠিপত্রের সমাধান ও সিদ্ধান্তমূলক উত্তর দিতে সাধারণতঃ দিল্লী ও মেওয়াতের অভিজ্ঞ মুবাল্লিগদের পারস্পরিক পরামর্শ ও মতবিনিময়ের প্রয়োজন হতো। কোন চিঠিতে হয়ত কাজের সমস্যার কথা থাকতো। উপস্থিত মুবাল্লিগগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে তার সমাধান পেশ করতেন। কোন চিঠিতে হয়ত এলাকার তাবলিগী কর্মপদ্ধতির বিশদ বিবরণ থাকতো। তাতে যদি সম্ভাব্য অসুবিধাজনক কোন ত্রুটি ধরা পড়তো তাহলে সে বিষয়ে সংশোধনী দিয়ে সতর্ক করা হতো। কোন চিঠিতে হয়ত জামা'আত প্রেরণের ফরমায়েশ থাকতো। ব্যবস্থাপক মুরুব্বীগণ ঐ মজলিসেই তার উপায় ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করতেন।

১। মক্তব মানে প্রচলিত ধরনের কোন মক্তব, মাদরাসা নয়। এখানে মকতব মানে এক গাছের নীচে চট জাতীয় কোন বিছানা পেতে একটি তাবলীগী জামা'আতের অবস্থান, যারা আছহাবে ছুফফার অনুসরণে দ্বীন শেখা ও শেখানোর কাজে মগ্ন থাকতো। সেই সাথে হুক্কা পানির ব্যবস্থার সুবাদে পথচারী মুসলমানদের সাথে তাবলীগী কথা বলা এবং তাদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ ধর্মীয় বোধ ও উপলব্ধি দান করাও ছিলো তাদের কর্তব্য। বরং রাস্তার মাথায় প্রতিষ্ঠিত এই মকতবের এটা আসল উদ্দেশ্য ছিল।

এই 'পত্র পর্যালোচনা সভা' প্রথম দিকে হযরত মাওলানার পরিচালনাতেই অনুষ্ঠিত হতো এবং স্বভাবতঃই তাঁকে বেশ কথা বলতে হতো, যা তাঁর অতিরিক্ত ক্লান্তি ও দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। সে জন্য পরবর্তীতে এই পরামর্শের কাজ কিছুটা দূরত্বে বসে করা হতো। আমি অধমের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত ছিলো। দিনের কোন সময় খিদমতে হাজির হওয়ার মওকা হলে আজকের ডাক এবং মজলিসের ফয়সালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং প্রয়োজনে মতামত ও সংশোধনী দিতেন। পরবর্তী দিনের মজলিসে তা শোনানো হতো।

এভাবে বলতে গেলে মাওলানা তাঁর পরবর্তীতে কাজ অব্যাহত রাখার এবং মেহনতের চড়াই উতরাই সম্পর্কে পরিপক্কতা অর্জনের জন্য হাতে কলমে মশক করাচ্ছিলেন। এ পরামর্শ নিঃসন্দেহে খুবই শিক্ষাপ্রদ ও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিলো।

দিল্লীর বিভিন্ন জলসা

দিল্লীর অধিবাসী ও ব্যবসায়ী মহলকে মাওলানা লাগাতার তাগাদা দিতেন যেন তারা মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেবের উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর জন্য বিভিন্ন জলসা ও বয়ানের ব্যবস্থা করে। তাদের উদ্যোগ আয়োজনে শহরে বেশ কিছু জলসা হলো। শেষ বুধবারে জামে মসজিদের জলসা ছাড়াও খাওয়াসওয়ালী মসজিদ, কালী মসজিদ (তুর্কম্যান গেট), সারায়ওয়ালী মসজিদ, কাছাবপুর, জামেয়া মিল্লিয়া ইত্যাদি স্থানে জলসা হলো। তাতে মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব ও অন্যান্যদের বয়ান হলো। মীরদরদ রোডের রবিবারের জলসা ও গাশতের প্রতি হযরত মাওলানা খুবই আগ্রহী ও যত্নবান ছিলেন। কেননা একে তিনি নতুন দিল্লীর তাবলীগী মারকায মনে করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি অধম, মৌলবী মুঈনুল্লাহ নদবী ও মৌলবী ওয়াছিক আলী–আমরা এ কজন উক্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ায় দায়িত্ব–সৌভাগ্য লাভ করতাম।

মজমায় ক্রমবর্ধমান লোক সমাগম

মজমার পরিধি এমনই ক্রমবর্ধমান ছিলো যে, একেক সময় দু'শ তিনশ লোক হয়ে যেতো। রাতের খাবার ও রাত্রিযাপন সেখানেই হতো। নিযামুদ্দীনের

মসজিদ ও আবাসিক ভবন মানুষে মানুষে একেবারে টইটুম্বুর থাকতো। সবদিকে একটা সরগরম অবস্থা ও কর্মচাঞ্চল্য বিরাজমান ছিলো। অবস্থা এমন ছিলো যে, একটু উদাসীনতা হলে ভিতরে বা বাইরে নামাযের কাতারে জায়গা পাওয়া কিংবা রাত্রে শোয়ার ব্যবস্থা করা কষ্টকর হতো। এমন ভরা মজমা দেখে দেখে কখনো আমি ভাবতাম, এই যে নূরানী পরিবেশ এবং এই যে আধ্যাত্মিকতার বসন্ত বাহার সব কিছুই তো হয়েছে ঐ জীর্ণ শীর্ণ মানুষটির কল্যাণ স্পর্শে, যিনি এক পাশে রোগশয্যায় (এবং হয়ত বা মৃত্যুশয্যায়) শুয়ে শুয়ে দু'চোখ জুড়িয়ে সবকিছু দেখছেন। কত শত মানুষ আজ তার ভরা দস্তরখানের মেহমান। অথচ কত অনাহারে উপবাসে তিলে তিলে তিনি সাজিয়েছেন এ মাহফিল! এখনো এক দু'লোকমার বেশী তাঁর জন্য বরাদ্দ নয়। হালকায় হালকায় এই যে ফিরিশতা পরিবেষ্টিত দরসে তালীম, এই যে যিকিরের সুমধুর গুঞ্জরন, নূরাণী ছুরত মানুষগুলোর এই যে অসংখ্য রুকু সিজদা ও শেষ রাতের রোনাযারি, আর কতদিন আছে এর আয়ূ! আমি এই সব বসন্ত– বাহার দেখতাম আর যিনি সবার মনের সব কথা শুনেন তাঁর কাছে মিনতি জানাতাম, কবির ভাষায়ঃ

الله رکھے آبادان ساقی تری محفل کو

সাকী! তোমার শরাব জলসা হোক চির আবাদ। তোমার হাতের পেয়ালা উপচে পড়ুক চিরকাল। কোন দিন নিভে না যেন এ আলো। থেমে যায় না যেন এ সুর মুর্ছনা, এ নুপুর ঝুমুর।

মাওলানা আব্দুল কাদের ছাহেবের আগমন

শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব মাদরাসার 'সবক' এর ব্যবস্থা করতে কয়েকদিনের জন্য সাহারানপুর গিয়েছিলেন। ফিরতি পথে মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী ছাহেবকে তিনি সংগে নিয়ে এলেন। এ শুভাগমনে হযরত মাওলানা এতই পুলকিত হলেন যে, শায়খুল হাদীছকে সকৃতজ্ঞ দু'আ দিলেন।

মাওলানা রায়পুরী ছাহেবের সাথে তাঁর ভক্ত যাকিরীনদেরও এক জামা'আত ছিলো, ফলে নিযামুদ্দীনের নূরানী পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক বরকত দ্বিগুণ বেড়ে গেলো।

ভুল সংবাদ, তবে শিক্ষাপ্রদ

মাওলানার অবস্থার মারাত্মক অবনতির কথা দিল্লীবাসীর জানা ছিলো। প্রতিদিন অসংখ্য যানবাহনের আসা যাওয়া চলছিলো। রাত্রি যাপন শেষে প্রত্যাবর্তনকারীরা শহরের পরিচিতদেরকে কুশল জানিয়ে দিতো। এরই মধ্যে আল্লাহ মালুম, হযরত মাওলানার 'বিদায় খবর' কিভাবে বিদ্যুৎ বেগে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। মুহূর্তে গাড়ী ঘোড়ার ভিড় লেগে গেলো। বাসের পর বাস থেকে মানুষ নেমে আসছিলো এবং আশ্বস্ত হয়ে ফেরত যাচ্ছিলো। টেলিফোনেও উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হয়রান অবস্থা। গুজবের সত্যতা সুদৃঢ়ভাবে নাকচ করা হলো। কিন্তু তাৎক্ষণিক ফল তাতে বিশেষ কিছু হলো না। জনশ্রোত অব্যাহত থাকলো এবং দেখতে দেখতে বিরাট মজমা হয়ে গেলো। এভাবে রাসূলুল্লাল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সুন্নতও আদায় হয়ে গেলো। মাওলানা মন্‌যূর ছাহেব মসজিদের নীচের অংশে গাছের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(মুহম্মদ রাসূল ছাড়া আর কিছু তো নন। তাঁর পূর্বেও রাসূলগণ গত হয়েছেন।) আয়াতের উপর অত্যন্ত সময়োচিত ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখলেন।

বস্তুতঃ এ ভুল খবর ছিলো দিল্লীবাসীদের 'সবক' লাভের জন্য এক আসমানী চাবুক। এখনো যারা কাজে মনোযোগী হয়নি, ব্যস্ততার অযুহাত এখনো যাদেরকে দাওয়াতি আন্দোলনে মাওলানার হাতে হাত রাখার সুযোগ দেয়নি; তারা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয় এবং নেয়ামতের কদর করে। অন্যথায় আজ তো এ খবর মিথ্যা হলো কিন্তু কাল! পরশু!! কিংবা তার পরে! একদিন তো অবশ্যই এটা সত্য খবর হবে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا *

নির্ধারিত ফায়সালা এই যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন মানুষ মৃত্যু বরণ করতে পারে না।

আখেরী দিনগুলো

মৃত্যুর দিনদুই আগে হালকা বৃষ্টি হলো। ফলে বাতাসে মাঝে মধ্যে হিমেল ভাব ছিলো। শেষ দিকে মাওলানা খুব বেশী গরম বোধ করতেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে বহুক্ষণ ধরে খাটিয়া বাইরে রাখা হতো। এই ফাঁকে তখন নিউমোনিয়ার হামলা হলো; কিন্তু তা ধরা পড়লো যথা সময়ের বেশ পরে। তবু প্লাস্টারসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হলো।

আলো ঝলমল মাহফিলে আধার নেমে আসার সময় অত্যাসন্ন ছিলো। তাই প্রদীপ দপ্‌দপ্ করে জ্বলছিলো। মস্তিষ্কও সতেজভাবে কাজ করে যাচ্ছিলো। একের পর এক দ্রুত বাণী ও বার্তা দিয়ে চলেছিলেন।

৮ই জুলাই রাত বারটার কাছাকাছি সময়ে আমি পায়চারি করতে চৌরাস্তার দিকে চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে যার সাথে দেখা হলো সে বললো, দু'জন মানুষ আপনার খোঁজে ছোটাছুটি করছে। হযরত মাওলানা স্মরণ করছেন। আমি খিদমতে হাজির হয়ে একেবারে ঠোঁটের কাছে কান লাগালাম। প্রথমবার শুধু আওয়াজের একটা কম্পন অনুভূত হলো। মাঝে মাঝে আওয়াজ ডুবে যাচ্ছিলো। অতি কষ্টে দু'তিনবারে শব্দ উচ্চারণ করে কথা পুরো করলেন। সকলকে যিকিরের তাকিদ এবং মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরীর মজলিসে বসার অসিয়ত করলেন। পুরো কথা অবশ্য এখন মনে নেই। সকালে দ্বিতীয়বার তলব করে কিছু একটা পায়গাম দিলেন। তাও এখন মনে নেই।

৯ই জুলাই রাত একটার দিকে হুজুরার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি, মাওলানা জেগে আছেন। শুশ্রূষাকারীও ব্যস্ত রয়েছেন। গিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থার পর বিশিষ্ট একজনের নাম নিয়ে জানতে চাইলেন, তিনি কি তার এলাকায় গিয়ে কাজ শুরু করবেন? আরয করা হলো, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই করবেন। অধিক আশ্বস্তির জন্য আরও বলা হলো যে, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি প্রভাবশালী মানুষ। তার কথার ভালো আছর হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি শুধু বললেন, জ্বি হাঁ, আল্লাহওয়ালাদের কথার আছর হয়েই থাকে। এরপর আবার আচ্ছন্ন অবস্থা। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে বললেন, মৌলবী মোহম্মদ তৈয়ব (রায়পুরী), মৌলবী যহীরুল হাসান ছাহেব (কান্ধলবী) ও হাফেয ওছমান ছাহেব (প্রফেসর ইসলামিয়া কলেজ, (পেশাওয়ার) এঁ

তিনজনের উদ্যোগে 'বাগপত' এলাকায় জলসা করা গেলে খুবই ভালো হয়।

১০ই জুলাই সন্ধ্যায় 'আচ্ছন্নতা' থেকে হুঁশ হয়ে ওলামায়ে কেরামকে তাদের উপযোগী পর্যায়ে কাজে শরীক হওয়ার জোর তাকিদ করলেন,

১১ই জুলাই সকালে 'যমযম' পান করার সময় আল্লাহর দরবারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ দু'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ الشَّهَادَةَ فِىْ سَبِيْلِكَ وَ اجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بِلَادِ رَسُوْلِكَ *

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত নছীব করো এবং তোমার রাসূলের শহরে আমাকে মৃত্যুদান করো।

ঐ দিনই একজনকে দেখতে পেয়ে বললেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো তো; নিজ এলাকায় দাওয়াতি কাজ শুরুর কী ব্যবস্থা সে করেছে?

সেদিনই হাফেজ ওছমান ছাহেব আসলেন। মাওলানা আমার কাছে খবর পাঠালেন; ওছমান আমার আপন মানুষ। তার বিশেষ একরাম করুন।

শেষ দিকে একদিন চিকিৎসক মন্তব্য করলেন, তাঁর অংগ প্রত্যংগ একে একে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। এখন শুধু 'কলব'-এর শক্তি তাঁকে ধরে রেখেছে। নিজেদের উপর তাঁর অবস্থা অনুমান করা ভুল হবে। যা দেখছেন তা শারীরিক শক্তি নয়। আত্মিক শক্তি, যা সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না।

১২ই জুলাই বুধবার শায়খুল হাদীছ্ ছাহেব, মাওলানা আব্দুল কাদির ছাহেব ও মাওলানা মুজাফফর আহমদ ছাহেব-এর নামে পায়গাম পাঠালেন যে, আমার আপনজনদের মধ্যে এ কয়জনের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। এদের মধ্যে যাকে ভালো মনে করেন তার হাতে আমার বাইআত প্রত্যাশীদেরকে বাইআত করিয়ে নিন। এরা হলেন, হাফেজ মকবুল হাসান ছাহেব, ক্বারী দাউদ ছাহেব, মৌলবী ইহতিশামুল হাসান ছাহেব, মৌলবী ইউসুফ ছাহেব, মৌলবী এন'আমুল হাছান ছাহেব, মৌলবী রেযা হাসান ছাহেব।

মুরুব্বী তিনজন নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় বার মশওয়ারা করে মাওলানার খিদমতে আরয করলেন, মৌলবী ইউসুফ ছাহেব মাশাআল্লাহ সর্বদিক থেকেই যোগ্য। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ ছাহেব খেলাফতের জন্য যে সমস্ত শর্ত القول الجميل। কিতাবে লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো সবই তাঁর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি পরহেযগার আলিম, আবার ইলম চর্চায়ও নিয়োজিত রয়েছেন। মাওলানা বললেন, এই-ই যদি হয় তোমাদের প্রস্তাব তাহলে আল্লাহ এতেই খায়র ও বরকত দান করবেন। আমি তাতে সম্মত হলাম। তিনি আরও বললেন, প্রথমে আমার মনে বড় খটকা ছিলো। দ্বিধা-অস্বস্তি ছিলো। কিন্তু এখন বেশ ইতমিনান হয়েছে। আশা করছি ইনশাআল্লাহ আমার পরেও কাজ চলবে।

সন্ধ্যায় তিনি বললেন, যারা আমার হাতে বাইআত প্রত্যাশী তারা বাইআত হয়ে যাক। কিন্তু মশওয়ারাতে সিদ্ধান্ত হলো যে, এখন যে রকম ক্লান্তি তাতে কাল পর্যন্ত বিলম্ব করা ভালো। কিন্তু 'কাল' আর হলো না। আসলে وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا। (আল্লাহর ফায়সালাই অবধারিত)।

'শেষ রাতে নিভিল নক্ষত্র'

রাতের শুরু থেকেই 'সফরের আয়োজন' শুরু হয়েছিলো। জিজ্ঞাসা করলেন, কাল কি বিষ্যুদবার? বলা হলো, জ্বি হাঁ। তিনি বললেন, আমার কাপড় চোপড় দেখে নাও, কোন নাপাকি আছে কি না। নেই শুনে খুশী ও আশ্বস্ত হলেন। খাটিয়া থেকে নেমে অযু করে নামায পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু শুশ্রূষাকারীরা বাধা দিলো। জামা'আতের সাথে এশার নামায শুরু করলেন কিন্তু নামাযের মধ্যেই ইস্তিঞ্জার হাজত হয়ে গেলো। পরে হুজরায় আলাদা ছোট জামা'আতে নামায পড়লেন। বললেন, আজ রাত্রে দু'আ ও দম বেশী পরিমাণে করাও। আরো বললেন, আজ আমার কাছে এমন লোকদের থাকা উচিত যারা শয়তান ও ফিরেশতাদের আলামতের মাঝে পার্থক্য বুঝে। মৌলবী ইন'আমুল হাসান ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ দু'আটা যেন কি? তিনি পুরো দু'আ স্মরণ করিয়ে দিলেন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ *

(হে আল্লাহ! গোনাহ যত হোক তোমার মাগফেরাত আরো প্রশস্ত আর আমার আমল নয় তোমার রহমতই ভরসা।)

এ দু'আ তাঁর মুখে লেগে থাকলো। বললেন, আজ মন চায়, আমাকে গোসল করিয়ে নীচে নামিয়ে দাও, দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়ি। তাহলে দেখতে পেতে নামায কি অপরূপ রূপ ধারণ করে।

১২ টার দিকে একটা ভয়ভাব দেখা গেলো। তক্ষুণি ডাক্তারকে ফোন করা হলো। তিনি এসে বড়ি দিলেন। রাত্রে অনবরত اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ধ্বনি শ্রুত হলো। শেষ রাতের দিকে মৌলবী ইউসুফ ছাহেব ও মৌলবী ইকরামুল হাসান ছাহেবকে স্মরণ করলেন। মৌলবী ইউসুফ ছাহেবকে বললেন, আয় বেটা ইউসুফ! আমার বুকে আয়! আলিংগন কর্। আমি তো চললাম।

ভোর রাতে আযানের কিছু আগে তিনি প্রাণ 'প্রাণদাতার' হাতে অর্পণ করলেন। এভাবে শেষ রাতের আধারে নিভে গেলো মিটিমিটি করা শেষ তারাটি। সারা জীবনের সাধনাক্লান্ত মুসাফির যিনি হয়ত কখনো নিশ্চিন্ত ঘুমের স্বাদ পাননি, তিনি আজ আখেরী মঞ্জিলে এসে সুখের আবেশে মিষ্টি ঘুম ঘুমিয়ে গেলেন।

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَ ادْخُلِىْ جَنَّتِىْ *

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার পালন কর্তার নিকট ফিরে যাও। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

ফজরের নামাযের পর হাজারো চোখের তপ্ত অশ্রুর মাঝে মৌলবী ইউসুফ ছাহেবের স্থলাভিষিক্তি সম্পন্ন হলো এবং মাওলানার পাগড়ী তার মাথায় বেঁধে দেয়া হলো।

গোসল ও কাফন দাফন

এরপর গোসল দান শুরু হলো, ওলামায়ে কেরাম যাবতীয় সুন্নত মুস্তাহাব রক্ষা করে নিজেদের হাতে গোসল দান করলেন।

সিজদার অংগগুলোতে যখন খুশবু মাখা হচ্ছিলো তখন হাজী

আব্দুর-রহমান ছাহেব বলে উঠলেন। কপালে ভালো করে খুশবু মাখো। এ কপাল ঘন্টার পর ঘন্টা সেজদায় পড়ে থাকতো।

শহরে ব্যাপক ভাবেই খবর প্রচার হয়ে গিয়েছিলো। তাই সকাল থেকেই লোক সমাগম শুরু হয়ে গেলো। অল্পক্ষণেই বিরাট মাজমা হয়ে গেলো, যে মজমা মাওলানা কখনো কর্মশূন্য ও অবসর দেখা পছন্দ করতেন না। তাই শায়খুল হাদীছ ও মাওলানা মোহম্মদ ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে মাজমাকে মাঠে সমবেত করে বয়ান করার হুকুম হলো।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

–এর চেয়ে সান্ত্বনামূলক ও প্রেরণাদায়ক বাণী আর কিই বা হতে পারতো। তাই এ মযমুনের উপরই বয়ান হলো। মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব ও মুফতি কেফায়াতুল্লাহ ছাহেবও লোকদেরকে ছবর ও অবিচল ধৈর্যের উপদেশ দান করলেন।

মাজমা ক্রমেই বেড়ে চলেছিলো। যোহরের নামাযের সময় লোক সমাগম ছিলো অকল্পনীয়। অযুর কারণে হাউযের পানি তলায় চলে গেলো। মসজিদের উপর–নীচ কানায় কানায় ভরে গেলো। নামায পড়ার জন্য মাওলানার জানাযা বাইরে আনা হলো। জনসমুদ্রের তখন এমনই উথাল পাতাল অবস্থা যে, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সম্পুর্ণ ভেংগে পড়লো। মানুষ যাতে মুহূর্তের জন্য হলেও কাঁধ দিতে পারে সে জন্য খাটিয়ার সাথে লম্বা বাশ বেঁধে দেয়া হলো। বহু চেষ্টার পর অতিকষ্টে জানাযা গাছের নীচে আনা হলো। শায়খুল হাদীছ ছাহেব নামায পড়ালেন। এরপর দাফনের উদ্দেশ্যে জানাযা ফেরত নেওয়া হলো। মসজিদের ভিতরে যাওয়া দুঃসাধ্য ছিলো। বহু লোক রশি ধরে ধরে ভিতরে পৌঁছলো। মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে বাবা ও ভাইয়ের পার্শ্বে কবর তৈরী ছিলো। বহু চেষ্টার পর অতিকষ্টে জানাযা কবরের পারে নীত হলো এবং হাজারো মানুষের 'সংযত' কান্না ও 'অসংযত' অশ্রুর মাঝে কবরে নামানো হলো। এভাবে দ্বীন ও উম্মতের এক কীমতি আমানত জমিনের সোর্পদ করা হলো। দিনের সূর্য যখন ডুবলো তখন দ্বীনের এ সূর্য মৃত্তিকার আড়ালে অদৃশ্য হলো, যে সূর্যের আলোতে কত অসংখ্য মানুষ ঝলমল করে উঠেছিলো। কত অসংখ্য হৃদয় ঈমানের প্রাণ–উষ্ণতা লাভ করেছিলো।

সন্তান সন্ততি ও আপনজন

মাওলানা একপুত্র (মৌলবী মোহম্মদ ইউসুফ) ও এক কন্যা (শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের স্ত্রী) রেখে গিয়েছিলেন। খোদ শায়খুল হাদীছও ছিলেন মাওলানার আপন ভাতিজা, জামাতা এবং পরম প্রিয় ও আস্থাভাজন ছাত্র।

وَ مَا مَات من كَانَت بقَايَاه مِثْلهُمْ + شَبَابٌ تسَامِى للعلٰى وَ كهولُ

যার উত্তরাধিকারী তাঁরই মতো উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন যুবক কিংবা প্রবীন তার মৃত্যু হলেও সে অমর।

বস্তুতঃ হযরত মাওলানার প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণ ছাড়াও ভক্ত অনুরাগীদের বিস্তৃত হালকা এবং বিশেষতঃ মেওয়াতি জনপদ ছিলো তার জীবন সাধনার জীবন্ত ছবি। ইন্তিকালের আগে একদিন তিনি বলেছিলেন, অন্যরা তো কয়েকজন মানুষ রেখে দুনিয়া থেকে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমার পরে গোটা দেশ রেখে যাচ্ছি।

দৈহিক অবয়ব

হযরত মাওলানা ছিলেন খাটো ও খুবই শীর্ণদেহী। কিন্তু অত্যন্ত চৌকশ ও কর্মোদ্যমী। অলসতার নামগন্ধও ছিলো না। গায়ের রং বাদামী। দাড়ী ঘন ও কালো। কয়েকটা মাত্র সাদা চুল শুধু কাছে থেকেই দেখা যেতো। চেহারায় ছিলো ভাবনা ও সাধনা এবং মেহনত ও মুজাহাদার সুস্পষ্ট ছাপ। ললাটের উজ্জ্বলতায় ছিলো সুউচ্চ মনোবল ও সুদুর প্রসারী দৃষ্টির উদ্ভাস। জিহ্বায় কিছুটা জড়তা ছিলো। কিন্তু কণ্ঠ ছিলো শক্তিময় এবং কথা ছিলো আবেগোদ্দীপ্ত। আবেগোচ্ছ্বাসের ফলে প্রায়শঃ কথা-শ্রোত জিহ্বা-জড়তায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেগবান জলপ্রপাতের একটা হৃদয়গ্রাহী রূপ ধারণ করতো।

সপ্তম অধ্যায়

বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আত্মনিবেদন

যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ হযরত মাওলানা (রহঃ) এর গোটা কর্ম জীবনে পরিব্যাপ্ত ছিলো এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম-উদ্যোগের মূল প্রাণ ছিলো সেটা হলো ঈমান ও ইহতিসাব। এর বিশদ ব্যাখ্যা হলো; আল্লাহকে আল্লাহ মনে করা [১] এবং তাঁর হুকুমকে তাঁর হুকুম মনে করা [২] এবং তাঁর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমল করে যাওয়া। হাদীছ শরীফে এসেছে–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ *

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের [৩] সাথে রমযানের রোযা রাখবে তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ *

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে শবে কদরে রাত্রি জাগরণ করবে তার পিছনের যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

বস্তুতঃ ঈমান ও ইহতিসাবের এ অনুভূতিই হলো আমলের মূল প্রাণ, যার কল্যাণে মানুষের আমল মুহূর্তের মাঝে পাতাল থেকে আকাশে উর্ধ্বগতি লাভ

১। অর্থাৎ তাঁর যাত ও ছিফাত তথা যাবতীয় গুণ ও সত্তার উপর বিশ্বাস রাখা।

২। অর্থাৎ দুনিয়ার সব কিছুর উপরে তাঁর হুকুমকে স্থান দেওয়া।

৩। ইহতিসাব অর্থ আল্লাহকে যাত ও ছিফাত সহ বিশ্বাস করা এবং তাঁর কাছেই শুধু আমলের পুরস্কার আশা করা।

করে। পক্ষান্তরে ঈমান ও ইহতিসাব ছাড়া অতিবড় মাপের আমলও হয়ে পড়ে প্রাণহীন। ফলে উর্ধ্বগমনের কোন শক্তিই থাকে না তার। অন্য এক হাদীছে বিষয়টির অধিক ব্যাখ্যা ও সমর্থন রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْن عمر و بْنِ العَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهَا مَنِيْحَةُ العَنْزِمَا مِن عَامِلٍ يَّعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَ تَصْدِيْق مَوعُودهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ *

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চল্লিশটি আমল রয়েছে যার মধ্যে সর্বোত্তম হলো এ উদ্দেশ্যে বকরী দান করা যে, কিছুদিন দুধ খেয়ে বকরী ফেরত দেবে। যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশায় আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রেখে ঐ আমল গুলোর কোন একটি করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী)

হযরত মাওলানা ঈমান ও ইহহিসাবের বড় গুরুত্ব বুঝেছিলেন। তাই উম্মতের জীবনে এর পুনর্জাগরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর পত্রাবলী থেকে নিম্নপ্রদত্ত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারাও কিছুটা আন্দায করা যাবে যে, এর কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিলো তাঁর চিন্তা চেতনায়।

১। দ্বীনের অন্তঃসার হলো ঈমান ও ইহতিসাব। (হাদীছে) বহু আমল প্রসংগে اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রে যে 'সম্বোধন' এসেছে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব এবং তাঁর সান্নিধ্য-বোধ ও একীনকে বৃদ্ধি করা এবং ঐ সমস্ত আমলের প্রতিশ্রুত ইহকালীন ও পরকালীন দান ও পুরস্কারগুলোকে বিনিময় মনে না করে 'দান' মনে করাই হলো দ্বীনের বাতিন বা 'অন্তঃসার'।

২। নিজস্ব সত্তায় আমলের কোনই মূল্য নেই। আমলের মূল্য শুধু আল্লাহর হুকুম হিসাবে তাঁর মহান সত্তার সাথে সম্পৃক্তির কারণে। সুতরাং সম্পৃক্তির সূত্রগুলো যে পরিমাণ আয়ত্তে আসবে এবং এ যোগ্যতা যত উৎকর্ষ লাভ করবে এবং আমল যত অধিক চিত্ত প্রশান্তি ও আত্মশক্তির সাথে করা হবে আমলের

আসল মূল্য ও কদরও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

৩। জনাব আপনি (ইবাদতে) আবেগ ও উদ্দীপনা না থাকার কথা লিখেছেন। আমার জন্য এ কিন্তু বড় ঈর্ষণীয় বিষয়। মুমিনের কাছে তো হুকুমে ইলাহীর আসল হাকীকত এই যে, হুকুমের 'বড়ত্ব-বিশ্বাস' দ্বারা সে এতই দমিত থাকবে যে, তা আবেগ উদ্দীপনাকে পর্যন্ত দাবিয়ে রাখবে। আবেগ উদ্দীপনা তো 'স্বভাব' থেকে উৎসারিত হয়। এর মিশ্রণে যা হয় সেটা স্বভাবজাত ভালবাসা। পক্ষান্তরে বড়ত্ব ও ফরযিয়ত-এর অনুভূতি থেকে যদি হুকুম পালন হয় তাহলে সেটা হলো বুদ্ধিজাত ও ঈমানী মুহব্বত।

৪। অল্প আমলে তুষ্টি অনেক সময় অবশিষ্ট আমলের ত্রুটি সমূহ অনুভব করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে যায়। এ আত্মপ্রতারণা থেকে বাঁচার খুব ফিকির রাখতে হবে। আমলকারীদেরকে দেখে তাদের 'খুশি'র এতটুকু প্রতিক্রিয়াই শুধু গ্রহণ করবে যে, স্বভাবতঃ কাজের ফলাফলকে 'আত্মকৃতিত্ব' ভাবার যে ভুল আমরা করি তা না হওয়া উচিত। ফলাফল নয় বরং কর্ম প্রচেষ্টাই হলো আসল কৃতিত্ব। সুতরাং দ্বীনী কাজের আসল ফল হলো ছাওয়াব ও প্রতিদান। আর তার সম্পর্ক হলো কর্মের সাথে। পার্থিব ফলাফলের সাথে তার কি সম্পর্ক? তবে দুনিয়াতেও ফলাফল দেখা দিলে শুধু এতটুকু ভাববে যে, আমরা ভুল করে কাজের যে ফলাফল দুনিয়াতে তালাশ করি সেটাও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ফলাফল ছাড়াও চেষ্টায় লেগে থাকা যেখানে কর্তব্য ছিলো সেখানে ফলাফল দেখার পর চেষ্টায় ত্রুটি করা কত বড় ভুল! ব্যাস এ অনুভবের ভিত্তিতে আসল মানোযোগ শুধু নিজস্ব ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার প্রতি নিবদ্ধ রাখবে।

৫। (যিকির আযকার)সম্পর্কিত শরীয়তের বাণী সমূহ অধ্যয়ন করতে থাকা এবং যিকিরের প্রতিদানসম্পর্কিত ওয়াদা সমূহ বিশ্বাস করা এবং একীন হাছিলের পূর্ণ চেষ্টার সাথে ঐ সকল অযিফা আদায় করা কর্তব্য। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি একীন লাভের চেষ্টাই হলো আসল জিনিস। এই একীন যেহেতু হৃদয় ও কলবের সাথে সম্পর্কিত সেহেতু ইবাদতের জন্য এটা 'কলব' বা হৃদপিণ্ড সমতুল্য। রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার আশা এর সাথে সম্পৃক্ত।

৬। প্রত্যেক ওয়াক্তের আজমত ও মর্যাদাসম্পর্কিত ফযীলতের হাদীছগুলো জেনে জেনে একীন ও বিশ্বাস করাই হলো সেগুলো আদায়ের তরীকা। হাদীছে

প্রতি ওয়াক্তের আলাদা ফযীলত, নূর ও বরকত রয়েছে। আমাদের মত সাধারণদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, প্রতি ওয়াক্তের নামায আদায়কালে আমরা এই প্রার্থনা করবো যে, ঐ ওয়াক্তের যে নূর ও বরকত রয়েছে তার অংশ যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেন।

৭। ইবাদতে স্বাদ ও তৃপ্তির খেয়াল করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মনে করে পালন করতে থাকা এবং আনুগত্যকেই বড় মনে করা উচিত। কেননা নির্দেশ পালন ও আদেশানুগত্যই হলো মূল কথা।

এই ঈমান ও ইহতিসাবের উপরই ছিলো হযরত মাওলানার সমগ্র মেহনত ও আন্দোলনের বুনিয়াদ। অর্থাৎ মেহনত মোজাহাদার মাধ্যমে আল্লাহর রিযামন্দি অর্জন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ, কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শনের নিরন্তর কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছাওয়াব ও প্রতিদানের হকদার হওয়া এবং মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত জীবনের জন্য সামান তৈয়ার করা।

এক পত্রে তিনি লিখেছেন-

তাবলীগের কিছু তরীকার সম্পর্ক হলো হৃদয়ের সাথে এবং কিছু তরীকার সম্পর্ক হলো শরীরের সাথে। হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো হলো–

১। এ কাজ নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরার উদ্দেশ্য হবে (সাধারণভাবে) সকল নবী রাসূলের এবং (বিশেষভাবে) শ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মোহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ এবং এ পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন।

২। اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ (কল্যাণের পথ প্রদর্শক কল্যাণ সাধকের সমতুল্য) এই বক্তব্যকে মজবুতভাবে খেয়াল রেখে একথা পুর্ণ বিশ্বাস করা যে, আমার চেষ্টায় যত মানুষ ইবাদতে ও যিকিরে মগ্ন হবে তা সব আমার আখেরাতের যখীরা ও সঞ্চয় হবে। সেই সাথে ঐ সমস্ত আমলের প্রতিটির বিশদ ছাওয়াব ও ফযীলতের কথাও ধেয়ানে রাখা কর্তব্য।

৩। মহান মহীয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ ও কাকুতি মিনতি করার শক্তি ও যোগ্যতা তৈরী করা এবং পদে পদে আল্লাহর দান ও দয়ার কথা চিন্তায় জাগরূক রাখা এবং আল্লাহ পাকের হাযির নাযির হওয়ার বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও তাবলীগের কামিয়াবির জন্য দু'আ করতে থাকা।

৪। এ বরকতপূর্ণ কাজে কদম রাখা ও শরীক হতে পারাকে নিছক গায়বী মদদ মনে করে আল্লাহর প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতার ধেয়ান রাখা।

৫। মুসলমানের খোশামোদ করা এবং তার সাথে বিনয়নম্র ব্যবহার করার আন্তরিক মশক মেহনত করা।

অন্য এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

দ্বীনের কাজ তখনই স্থায়ী ও অব্যাহত থাকে যখন মানুষ কেয়ামতের দৃশ্যকে এবং কেয়ামতে কাজে আসার মতো যে সকল 'কীর্তি' মানুষ এখানে করেছে সেগুলোকে সামনে রাখে।

অতঃপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও বড়ত্বকে চিন্তাস্থ করে তিনি (আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার শর্তে) ঐ সকল 'কীর্তি'র যে বিনিময় ও প্রতিদানের সংবাদ জানিয়েছেন সেগুলোকে নিজের জন্য আখেরাতের সম্পদ বিবেচনা করবে।

এ ধারণা ও চিন্তা যতই দৃঢ়মূল হতে থাকবে ততই আল্লাহ পাক তাকে নিরংকুশ ঈমানের স্বাদ দান করতে থাকবেন। আর যতই স্বাদ লাভ হতে থাকবে ততই আকাঙক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাতে কল্যাণ ও বরকত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, তোমার ওছিলায় যত বে নামাযী নামাযী হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখো যে, শরীয়তে তার কি পরিমাণ ছাওয়াব রয়েছে। প্রতিটি নামাযের যে পরিমাণ ছাওয়াবের কথা শরীয়ত বলেছে, চিন্তাকে খুব স্থির করে ভেবে দেখো যে, ছাওয়াবের এ সব ভাণ্ডার আমাকে দেয়া হবে। নিজের উপর 'সমাসন্ন' একদিনের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কেয়ামতের ধেয়ান করো। অতঃপর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলে গেছেন সেটাই আখেরাতে কাজে আসবে।

অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন–

আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার এবং অহীর প্রচার প্রসার করার যাবতীয় চেষ্টা মেহনত আল্লাহকে আল্লাহ মনে করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং মৃত্যুর পরের সামান হওয়ার বিশ্বাসের সাথে যেন করা হয়। আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে প্রতিশ্রুত 'ফায়যান' বা করুণার প্রকাশ এই (দাওয়াতি

মেহনত ও মোজাহাদাপূর্ণ) যিন্দেগীর উপরই নির্ভরশীল। যা أُولَٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ [১] এর 'সীমাবদ্ধতাজ্ঞাপক' বক্তব্য দ্বারাই শুধু প্রমাণিত নয় বরং অন্য বহু কোরআনী আয়াত দ্বারাও সমর্থিত।

অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের নফসকে আন্তরিকভাবে এমন গান্দা, হীন, স্বার্থপর ও কাজ বিনষ্টকারী বলে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ তো দূরের কথা; এ নফস তো মৃত্যু পর্যন্ত সোজা পথে আসবে বলেই মনে হয় না। সুতরাং এই নিয়তে চেষ্টা মেহনত করতে থাকবে এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অন্যদের মাঝে প্রচার করবে যে, আমি ছাড়া আল্লাহর অন্য সব বান্দা, যারা নিজস্ব সত্তার গণ্ডিতে পুণ্যস্বভাব ও পবিত্র আত্মার অধিকারী তারা দ্বীনের যে কোন আমল করবে তা 'ভিতর–বাহির' উভয় দিক থেকেই উত্তম আমল হবে। তখন আল্লাহ পাক اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ এর নিয়ম হিসাবে ঐ পুণ্যাত্মাদের বরকতে আমাকেও তাঁর করুণার অংশ দান করবেন।

চিন্তা ফিকিরের প্রতি জোর তাকিদ দিয়ে তিনি বলেন, চিন্তা ফিকির কোন বড় কঠিন জিনিস নয়। অর্থাৎ নির্জনে বসে নিজের নফসকে সম্বোধন করে মনে মনে এ কথা বলা যে, নিঃসন্দেহে এ কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম। আর অবধারিত মৃত্যু তোমার খাহেশাতপূর্ণ যিন্দেগীকে অবশ্যই সোজা পথে এনে ছাড়বে।

তদ্রূপ اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ এ কথাকে সত্য মনে করে কষ্টার্জিতভাবে হলেও এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার

১। পুরো আয়াতটা হলো

اِنَّ الذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ (البقرة)

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে মেহনত করেছে তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে।

মাধ্যমে যত নেক কাজ অস্তিত্ব লাভ করে কিংবা লাভ করতে পারে সেগুলোকে একত্র করা (অর্জন করা)র সাথেই আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত। ব্যস এ সমস্ত কথা ভাবার নামই হলো চিন্তা ফিকির।

হযরত মাওলানা আন্তরিকভাবে চাইতেন যে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদের সাথে তাদের নিকটজনেরাও যেন সন্তুষ্টচিত্ততা, ধৈর্যধারণ, উৎসাহ ও সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কাজের ছাওয়াব ও প্রতিদানে শরীক হতে পারে। ছাওয়াব ও প্রতিদান লাভের এ আগ্রহ তথা ঈমান ও ইহতিসাবের মনোভাব হযরত মাওলানা গোটা উম্মতের অন্তরে পয়দা করতে চাইতেন। নিজের ঘর থেকেই তিনি এ পদক্ষেপের সূচনা করেছিলেন। হিজায থেকে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর এ পত্রটি পড়ুন।

চিন্তা করে দেখো, দুনিয়ার জন্য মানুষ প্রিয়জনদের কত দীর্ঘ বিচ্ছেদ মেনে নেয়। একটু তো চিন্তা করে দেখো, বর্তমানেও কাফিরদের বাহিনীতে [১] হাজারো মুসলমান সৈনিক শুধু পেটের দায়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। এত দুর্বলচিত্ততা কিছুতেই শোভনীয় নয়। তুমি হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে খুশি মনে আমার দ্বীনী খিদমতের জন্য বিচ্ছেদ ও দূরত্ব কবুল করে নাও এবং সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে ছেড়ে রাখো। তাহলে খুশি ও সন্তুষ্টির পরিমাণ অনুযায়ী ছাওয়াব ও প্রতিদানে তুমিও শরীক থাকবে। নিজের সৌভাগ্য মনে করো যে, তোমার স্বামী দ্বীনের খিদমতের জন্য পথে পথে কষ্ট বরদাশত করছে। আল্লাহর শোকর করো যে, এই কষ্টের ছাওয়াব ও প্রতিদান যখন পাওয়া যাবে তখন কোন দিন তা শেষ হবে না। একেকটি কষ্ট বসন্ত–বাগানের ফুল হয়ে ফিরে আসবে।

মাওলানার মতে দুর্বল ও ব্যস্ত মানুষের এই সংক্ষিপ্ত জীবন পরিসরে নিজের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান এক 'আমল ভাণ্ডার' গড়ে তোলার এবং 'অশেষ' ছাওয়াব লাভের উপায় ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে তাবলীগী মেহনতে আত্মনিবেদন ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। দিনভর রোজা, রাতভর নফল এবং দৈনিক খতমে কোরআন বা

১। বিশ্ব যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীতে ভর্তি মুসলিম সৈনিকদের প্রতি ইংগিত।

লাখ টাকা দান– এগুলোর ছাওয়াব মান ও পরিমাণ হিসাবে এবং নূরানিয়াত ও কবুলিয়াতের বিচারে ঐ লোকদের সমকক্ষ কিছুতেই হতে পারে না যাদের আমলনামায় সৎপথ প্রদর্শনের কারণে হাজারো বান্দার লাখো আমলের ছাওয়াব প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে গিয়ে জমছে এবং যাদের রূহ অভিমুখে বহু শতাব্দী ধরে আজর–ছাওয়াবের নিরন্তর স্রোতধারা বয়ে চলেছে, আনওয়ার–বারাকাতের বারিধারা বর্ষিত হয়ে চলেছে। এক ব্যক্তির আমল ইখলাছের একক শক্তি বহু শত মানুষের আমল ইখলাছের সম্মিলিত শক্তির সমকক্ষ কিছুতেই হতে পারে না। এ কারণেই মাওলানা ব্যক্তিগত নফল ইবাদতের মুকাবেলায় (তাতে তার পূর্ণ আত্মনিমগ্নতা এবং অশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ সত্ত্বেও) এই সম্প্রসারণধর্মী কল্যাণকর্ম তথা দাওয়াত ও তাবলীগকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং এটাকেই অধিক আশাপ্রদ মনে করতেন। 'জীবনে বড় বড় বহু দ্বীনী কীর্তিকর্মের অধিকারী কিন্তু বর্তমানে স্বাস্থ্যহীনতার শিকার' এক বুজুর্গকে তাঁর জনৈক বন্ধুর মারফত মাওলানা এ পরামর্শ পাঠিয়েছিলেন যে, এখন তো আত্মকর্মের শক্তি আপনার বড় একটা নেই। সময় কম অথচ কাজ বেশী। এজন্য দুরদর্শিতা, সময়জ্ঞান ও দ্বীনী প্রজ্ঞার দাবী এটাই যে, অন্যের আমলের ওছিলা ও মাধ্যম হওয়ার চেষ্টা করুন। জোর চলে এমন বন্ধুদেরকে এবং কথা মেনে নেয় এমন অনুরাগীদেরকে মুখে ও কলমে এবং কথায় ও লেখায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ছাওয়াব ও প্রতিদানে শরীক হোন।

এ দাওয়াতি আন্দোলন তো মাওলানার দৃষ্টিতে ঈমান ও ইহতিসাবের সহজতম ও শক্তিশালীতম মাধ্যম ছিলো। এছাড়া সাধারণভাবেও ঈমান ও ইহতিসাবের অনুভূতি তাঁর এমনই প্রবল ছিলো যে, ছাওয়াবের প্রত্যাশা ছাড়া নিছক নফসের তাকাযায় কোন কথা বা কাজ তাঁর জীবনে খুব কমই হয়ে থাকবে। لَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا فِيمَا رَجَا ثَوَابُهُ [১] ছিলো তাঁর জীবনাদর্শ। ছাওয়াব ও প্রতিদান এবং দ্বীনী ফায়দা লাভের আশা ও প্রত্যাশাই ছিলো তাঁর প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ এবং চাহিদা ও অংশগ্রহণ–এর অনুঘটক। এ উদ্দেশ্যেই তিনি কথা বলতেন, এ উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন, এ কারণেই

১। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঐ বিষয়েই কথা বলতেন যাতে ছাওয়াব লাভের আশা হতো।

রুষ্ট হতেন, আবার তুষ্ট হতেন। এ উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশার বাইরে কোন কিছুর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিলো না। নিত্যদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেও একই অবস্থা ছিলো। মাওলানা মোহম্মদ মনযূর নোমানী ছাহেবের ভাষায়–"নিয়ত ছাড়া সম্ভবত এক কাপ চাও গ্রহণ করতেন না, পরিবেশনও করতেন না।"

প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানানো এবং তা দ্বারা ফায়দা ও বরকত হাছিল করার জন্য বিশেষভাবে নিয়ত করতেন এবং অত্যন্ত কুশলতার সাথে ঐ আমলের গতিমুখ 'কর্ম' থেকে 'ধর্মের' দিকে ফিরিয়ে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও চিন্তাশক্তি কিতাবী জ্ঞান ছাড়িয়ে হিকমত ও প্রজ্ঞার সুউচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। এ বিষয়ে তাঁর উপস্থিত জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা এমনই ছিলো যে, একই কাজের বিভিন্নমুখী নিয়ত দ্বারা প্রত্যেককে তার স্তর অনুযায়ী বিশেষ ফায়দা ও ছাওয়াব লাভের উপায় দেখাতেন। মাওলানা মোহাম্মদ মনযূর নোমানী ছাহেব একটি আর্কষণীয় ঘটনা লিখেছেন যা থেকে মাওলানার স্বভাবের এ বিশেষ গুণটি সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যায়। মাওলানা নোমানীর যবানিতেই শুনুন–

অন্তিম অসুস্থতার শেষের দিকে হযরত যখন উঠাবসা করতে পারেন না তখন একদিন দুপুরে কয়েকজন মেওয়াতি খাদেম তাঁকে অযু করাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন–

মৌলবী ছাহেব! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যদিও বহু বছর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং পরবর্তীতে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)কে অযু করতে দেখেছেন; তা সত্ত্বেও তিনি শিক্ষার্থীসুলভ দৃষ্টিতে হযরত আলী (রাঃ)–এর অযু করা দেখতেন।

বাস্তবিকই যখন শেখার দৃষ্টিতে হযরত মাওলানার অযু করা দেখলাম তখন উপলব্ধি হলো যে, তাঁর অযু থেকে অসুস্থতাকালীন অযু সম্পর্কে শেখার মতো বহু কিছু আমাদের জন্য রয়েছে।

হযরতের অযুর খাদিমরা সকলে ছিলো মেওয়াতি। তাদেরকে দেখিয়ে তিনি বললেন, এ বেচারারা আমাকে অযু করায়। আমি তাদেরকে বলি, তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ভালবেসে খেদমত করছো। আর আমার নামায

তোমাদের চেয়ে উত্তম বলে তোমাদের ধারণা। সুতরাং তোমরা এই নিয়তে আমাকে অযু করিও যে, আমার নামাযের ছাওয়াবে যেন তোমাদেরও হিসসা হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে এভাবে আর্যি জানাবে যে, হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দার নামায আমাদের চেয়ে উত্তম বলে আমাদের ধারণা; তাই আমরা তাকে অযু করাই, যেন তার নামাযের ছাওয়াবে আমাদেরও হিসসা থাকে।

আর আমার নিজের দু'আ এই যে, হে আল্লাহ! আমার সম্পর্কে তোমার সরল প্রাণ বান্দাদের সুধারণার লাজ রক্ষা করো এবং আমার নামায কবুল করে তাদেরকেও এতে শরীক করে নাও।

হযরত মাওলানা বললেন, আমিও যদি নিজের সম্পর্কে তাদের মতো ভাবতে শুরু করি তাহলে মারদূদ হয়ে যাবো। বরং আমি তো মনে করি যে, এই সরল প্রাণ মানুষগুলোর ওছিলাতেই আমার নামায কবুল হতে পারে।

দেখুন; এক অযুর আমলে শুধু মাত্র নিয়ত দ্বারা তিন স্তরের সকলের জন্য দ্বীনের দৌলত হাছিল করার কেমন পথ তিনি খুলে দিলেন। মাওলানা মনযূর ছাহেবের জন্য হলো, শিক্ষার আলাদা ফযীলত, সুন্নত তালাশ করে নিজের অযুকে উন্নত ও পূর্ণাংগ করার নিয়তের আলাদা ছাওয়াব। মেওয়াতিদের জন্য হলো উত্তম নামাযের ছাওয়াব ও কবুলিয়াতে শরীক হওয়ার সুযোগ। আর নিজের জন্য হলো মুসলমানের সুধারণার ওছিলায় নামাযের মাকবুলিয়াত হাছিল করা।

এই নিয়তবৈচিত্র এবং ঈমান ও ইহতিসাব ছাড়া তো এটা ছিলো নিত্যদিনের সাধারণ একটা অযু মাত্র। একজন অযু করছিলেন, কয়েকজন খাদিম অযু করাচ্ছিলো। আর তৃতীয় একজন বিনা মনোযোগে, বিনা উদ্দেশ্যে সে অযু করা দেখে যাচ্ছিলো।

ইহসান পর্যায়ের ভাব

ইহসানের হাকীকত হাদীছ শরীফে বয়ান করা হয়েছে এভাবে-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ (وَ فِى رِوَايَةٍ) اَنْ تَخْشَى اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য ও ভয় এমন পর্যায়ের হবে যেন আল্লাহকে তুমি দেখছো।

হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলিয়াস (রহঃ) এই ইহসান গুণের বাস্তব নমুনা ছিলেন। নির্জনে এবং অনির্জনেও সাধারণতঃ তাঁর এমন অবস্থা হতো যেন তিনি আল্লাহর সমীপে উপস্থিত আছেন। মাওলানা মোহম্মদ মনযূর নোমানী যথার্থই লিখেছেন (এ অধম নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি)-

আল্লাহ পাকের তাসবীহ ও প্রশংসা, তাওহীদ ও একত্ব এবং তাওবা, ইস্তিগফার ও ফরিয়াদ জ্ঞাপনের সর্বাঙ্গীন কালিমা তথা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ وَ لَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ *

প্রায়ই তাঁর যবানে জারী থাকতো। মাঝে মাঝে এমন ভাব ও অনুভবসহ তা বলতেন যেন আল্লাহ পাকের 'জালালী আরশ'-এর সামনে হাজির হয়ে তিনি কালিমা নিবেদন করছেন।

কিয়ামত ও আখিরাতের দিব্য দর্শন

এ পর্যায়েরই মাওলানার আরেকটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, কেয়ামত ও আখিরাতের দৃশ্য যেন তাঁর চোখের সামনে ছবির মত বিদ্যমান থাকতো। বস্তুতঃ কেয়ামত ও আখিরাতের দিব্য দর্শন তাঁর এমনই প্রবল ছিলো যে, তাঁকে দেখে অবচেতন ভাবেই মনে পড়ে যেতো হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর এই মন্তব্য- كَاَنَّهُمْ رَاْىُ عَيْنٍ (ছাহাবা কেরামের সামনে আখিরাত ছিলো এমন 'বিমূর্ত' যেন তা তাঁদের চোখে দেখা জিনিস।)

এক মেওয়াতিকে একবার দিল্লী আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাদা দিল মেওয়াতি বললো, দিল্লী দেখতে এসেছি। পরে মাওলানার হাবভাব দেখে বেচারা ভুল হয়েছে মনে করে সাথে সাথে বললো, জামে মসজিদে নামায পড়তে এসেছি। আবার পরিবর্তন করে বললো, আপনার যেয়ারতে এসেছি। তখন মাওলানা বললেন, জান্নাতের মোকাবেলায় দিল্লী বা জামে মসজিদের কিই বা হাকীকত। আর আমিই বা কি যার যিয়ারতে তুমি আসবে। (কবরের) পঁচা গলা শরীর ছাড়া আর কিছুতো নই।

তারপরে যখন জান্নাতের বয়ান শুরু করলেন, মনে হলো যেন জান্নাত তাঁর চোখের সামনে সাজানো রয়েছে।

দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং আখেরাতি জীবনের চিরস্থায়িত্বের বিশ্বাস তাঁর এমনই স্বভাবজাত হয়ে গিয়েছিলো যে, প্রাত্যহিক কথাবার্তা ও পত্রাবলী থেকেও তা পরিস্ফুট হতো। শায়খুল হাদীছ মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া ছাহেবকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন–

"মাওলানা আব্দুল কাদির ছাহেব (রায়পুরী)কে বলো, আসা–যাওয়ার এই দুনিয়ায় দু' একদিনের জন্য যেন নিযামুদ্দীন হয়ে যান।"

একবার আমাকে বললেন, লৌখনোতে দেখা হবে। পরে বললেন, ভাই, সফরে কি আর দেখা করবো; ইনশাআল্লাহ আখিরাতেই দেখা হবে। মনে হলো রেলগাড়ীর যাত্রী যেন সহযাত্রীকে বলছে, গাড়ীতে ক্ষণিক দেখায় কি লাভ; বাড়ীতে গিয়েই দেখা হবে। ঠিক সেই রকম বিশ্বাস! ঠিক সেই রকম সরলতা!

মাওলানা সৈয়দ তালহা ছাহেবকে 'স্ত্রী–শোকে' সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, দুনিয়ার জীবন তো এই যেন দরজার দু'পাট আগে পরে বন্ধ করা হলো। ঠিক এভাবেই মানুষ দুনিয়া থেকে আগে পরে চলে যায়।

পূর্ণ একাগ্রতা ও আত্মনিমগ্নতা

বহু বছর থেকে হযরত মাওলানা তাঁর দাওয়াতি কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ 'একাগ্র' করে নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্যবিমুখ সবকিছু থেকেই 'নিঃসম্পর্ক' ছিলেন তিনি। বহু আগে শায়খুল হাদীছকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন–

আমার দিলের আকাঙ্ক্ষা এই যে, কম–সে–কম আমার দেমাগ, চিন্তা, সময় ও কর্মশক্তি এ কাজ ছাড়া আর সবকিছু থেকে ফারেগ থাকুক।

তিনি বলতেন, অন্য কিছুতে জড়িত হওয়া আমার জন্য কিভাবে জায়েয হতে পারে অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারাক (মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশা, দ্বীনের অধঃপতন ও দুর্বলতা এবং কুফরির আধিপত্য ও আগ্রাসনের কারণে) কষ্ট পাচ্ছেন।"

এক খাদেম একদিন অনুযোগ করে বললো, "অধমের প্রতি যে স্নেহ ও

নেকদৃষ্টি আগে ছিলো এখন তা কম মনে হচ্ছে।" তিনি বললেন, আমি অতি চিন্তানিমগ্ন। কেননা আমি অনুভব করছি যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাচ্ছেন। তাই অন্য কিছুতে মন দিতে পারি না। কখনো নিজেকে তিনি রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গাড়ী ঘোড়ার শ্রোত নিয়ন্ত্রণকারী ট্রাফিক পুলিসের সাথে তুলনা করতেন। বলতেন, অন্যান্য কাজও গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী সন্দেহ নেই। কিন্তু ট্রাফিক পুলিসের পক্ষে নিজ জায়গা থেকে সরে যাওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং নিষিদ্ধ জীবন থেকে মনোযোগ সরিয়ে এমনভাবে কর্ম নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, পরিপার্শ্বের বহু কিছুর দিকে চোখ মেলে তাকানোরও সুযোগ হতো না। নয়াদিল্লী অতিক্রম করার সময় একবার এক গুরুত্বপূর্ণ ভবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মাওলানা একান্ত নির্লিপ্ততার সাথে বললেন, ভাই এ সমস্ত বিষয় আমার জানার বাইরে।

কোন মজলিসে নিজের দাওয়াত ও বক্তব্য উপস্থাপনের সম্ভাবনা না দেখা পর্যন্ত তাতে অংশ গ্রহণ মাওলানার পছন্দ ছিলো না। শুধু নিয়ম ও সৌজন্য রক্ষা করতে যাওয়া তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর হতো। বলতেন, কোথাও যাবে তো নিজের বক্তব্য নিয়ে যাবে। দৃঢ়তার সাথে তা উপস্থাপন করবে এবং সব কিছুর উর্ধ্বে রাখবে। একবার তাঁকে আমি মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদবীর একটি মন্তব্য শোনালাম; এক জলসা থেকে ফিরে তিনি বলেছিলেন, নিজের একটি কথা বলতে যাবে তো (সৌজন্য রক্ষার জন্য) অন্যের দশটি কথা তোমাকে শুনতে হবে। মাওলানা দীর্ঘক্ষণ এর রস গ্রহণ করে বললেন, নদভী ছাহেব বড় ব্যথার সাথে কথাটা বলেছেন।

দীর্ঘ সময় উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিহীন অপ্রাসংগিক কথা শোনা তাঁর নাযুক তবীয়তের ছিলো অসহনীয়। একান্ত আপনজন হলে নিষেধ করে দিতেন। নচেৎ সৌজন্য রক্ষার্থে তবীয়তের উপর চাপ সহ্য করে শুনে যেতেন। কিন্তু যাদের বোঝার কথা তারা বুঝতো যে, কেমন মোজাহাদা ও ধৈর্যের পরিচয় তিনি দিচ্ছেন। এক রেল সফরে মাওলানার দুই সফর সংগী কোন এক প্রসংগের আলোচনা জুড়ে দিলেন। এক পর্যায়ে মাওলানা তাদের বলে দিলেন, ভাই, অন্য কোথাও বসে কথা বলো। মাওলানার হাজিরানে মজলিস এবং রাত দিনের আসা যাওয়াকারীরা এ বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং যথাসম্ভব তা লক্ষ্য

রাখতেন। কিন্তু নবাগতদের, বিশেষতঃ আলিমদের জন্য খোলা ছুটি ছিলো। তাদের সব কিছু তিনি অম্লান বদনে সয়ে যেতেন।

প্রিয় জন্মস্থান কান্ধলায় আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎকালেও আপন দাওয়াত ও বক্তব্য কখনো তিনি বিস্মৃত হতেন না এবং সম্ভবতঃ কোন সফরের কোন মজলিসেই তা বাদ যেতো না। তবে এ জন্য খুবই উপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী ক্ষেত্র বা উপলক্ষ তৈরী করে নিতেন এবং এমনভাবে প্রসংগ তুলতেন যে মজলিসের বিরক্তির কারণ না বসে সচেতনদের জন্য তা চিত্তপ্রসন্নতার কারণ হতো।

একবার দিল্লীর এক শুভার্থীর এখানে বিবাহ মজলিসে তাকে শরীক হতে হয়েছিলো। বিয়ের ভরা মজলিসে উভয় পক্ষকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, আপনাদের আজ এমন শুভদিন যখন 'ইতর'কে পর্যন্ত খুশী করা হয়। ঘরের ঝাড়ুদারকেও মানুষ অখুশী দেখতে চায় না। কিন্তু বলুন দেখি, আল্লাহর পেয়ারা রাসূলকে খুশী করার কোন চিন্তাও কি আপনাদের আছে। অতঃপর হাজিরানে মজলিসকে দাওয়াত দিয়ে তিনি বললেন, দ্বীনকে সজীব করার তাবলীগী মেহনতই হলো আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের সর্বোত্তম উপায়।

মাওলানা একে তো দাওয়াতি প্রয়োজন ছাড়া খুব কমই পত্র লিখতেন আর লিখলেও আগে 'নিজের কথা' বলে তারপর অন্য প্রসংগে যেতেন। আমার সামনে একবার এক মেওয়াতি তালিবে ইলম দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা মোহম্মদ তৈয়ব ছাহেবের নামে একটি সুপারিশপত্র লিখে দিতে মাওলানার কাছে আবেদন জানালো। মাওলানা যে সুপরিশ পত্র লেখালেন তার আগাগোড়াই ছিলো তাবলীগী প্রসংগ। শুধু শেষ দু' এক লাইন ছিলো তালিবে ইলমের সুপারিশ।

কোন আপন জনের সাথে দেখা করে ফেরার পর আমি অধমকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'নিজের কথাটাও' কি বলেছো? কাজের দাওয়াত দিয়েছো? না-বাচক উত্তর পেয়ে বলতেন, ভাই, 'সম্পর্ক' যতক্ষণ হযরত মোহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদানুগত না হবে ততক্ষণ তা মূল্যহীন ও মৃত। (অর্থাৎ 'সম্পর্ক' যতক্ষণ দ্বীনের মজবুতির উদ্দেশ্যে দাওয়াতি কাজে ব্যবহৃত না হবে ততক্ষণ তাতে কোন কল্যাণ নেই। রূহ বা প্রাণ নেই।

কোন উপলক্ষ বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকে এই দাওয়াতি মাকছাদের প্রেক্ষিতেই শুধু তিনি যথার্থ মনে করতনে। তাঁর মতে এটাই হলো অংশগ্রহণের আসল কায়দা। নিজ ঘরের এক বিবাহ মজলিস-এর দাওয়াতনামা তিনি এভাবে পাঠিয়েছিলেন,

আমি অধম বান্দা এই অধঃপতনের যুগে এধরনের অনুষ্ঠানকে মুসলমানদের চরম অনুভূতিহীনতা বলেই মনে করি। কিন্তু যেহেতু আমার বুজুর্গান ও মাশায়েখ তাশরীফ আনছেন সেহেতু পত্রযোগে জানাচ্ছি, যাতে সকল বন্ধু বান্ধব উপস্থিত হয়ে উভয় জাহানের সৌভাগ্য লাভ করতঃ অধমকে তার তাবলীগী দাওয়াত ও কর্মসূচী পেশ করার সুযোগ দান করেন।

লা ইয়ানী বিষয় (অর্থাৎ দ্বীনের জন্য তেমন উপকারী নয় আবার দুনিয়ার জন্য জরুরীও নয় এ ধরনের কথা বা কাজ) তিনি ঘৃণার সাথে পরিহার করে চলতেন। অন্যদেরকেও সে উপদেশ দিতেন। বিশেষতঃ তাবলীগে গমনকারীদের জোর তাকিদ দিয়ে বলতেন, দেখ, 'লা ইয়া'নী'তে মগ্ন হওয়া কাজের সৌন্দর্য, সজীবতা শেষ করে দেয়।

যে কাজে কোন দ্বীনী ফায়দা দেখতে না পেতেন সেটাকে সময়ের অপচয় মনে করতেন। একবার মসজিদের চত্বরের পাশে দাঁড়িয়ে মৌলবী সৈয়দ রেজা হাসান ছাহেবের কাছে কোন পুরোনো তাবলীগী সফরের ঘটনা-বিবরণী সাগ্রহে শুনছিলাম। মাওলানা তা অসমর্থন করে বললেন, এ তো হলো ঘটনার ইতিবৃত্ত। কিছু কাজের কথা বলুন।

জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ হিসাবে সময়ের তিনি পূর্ণ কদর করতেন এবং সময় বেকার খরচ হতে দেখলে বড় কষ্ট পেতেন।

একবার নতুন চিঠিপত্র দেখা হচ্ছিলো এর ভিতরে আগেই পড়া হয়ে যাওয়া একটা পুরোনো খাম বের হলো কিন্তু বিষয়টা বুঝে উঠতে কয়েক মিনিট ব্যয় হয়ে গেলো। হযরত মাওলানা তখন বিরক্তির সাথে বললেন, ছিঁড়ে ফেলো। নইলে এটা আবার আমাদের সময় নষ্ট করবে। অবশেষে বললেন, সময়ই তো হলো আমাদের জীবন সম্পদ।

সময়-সম্পদের কেমন মূল্য তিনি বুঝেছিলেন এবং কেমন দেখে শুনে তা

ব্যয় করেছেন সেটা তাঁর যুগান্তকারী এ মহান কর্ম–কীর্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি নেই কিন্তু তার 'বিপ্লব' দুনিয়ার সামনে রয়েছে। এত বিরাট কাজ তখনই শুধু আঞ্জাম পেতে পারে যখন বিন্দু পরিমাণ সময়ও অপচয় না হবে এবং উদ্দেশ্যবিমুখ ও বেদরকারী কাজে মুহূর্তকালও ব্যয় না হবে।

অখণ্ড উদ্দেশ্যপ্রেম

ইশক ও প্রেমের সংজ্ঞা দিয়ে হযরত মাওলানা একবার বললেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্টিত স্বাদ ও আকর্ষণ সব কিছু থেকে কর্তিত হয়ে কোন একটিতে কেন্দ্রীভূত হওয়ারই নাম হলো ইশক বা প্রেম।

দ্বীনের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছিলো স্বয়ং হযরত মাওলানার জীবনে। দ্বীনের সাথে তার আত্মার সম্পর্ক প্রকৃত অর্থেই ছিলো ইশক ও প্রেমের সম্পর্ক। এ প্রেম সম্পর্কের পথে দুনিয়ার যাবতীয় স্থূল স্বাদ আহ্লাদ ও ভাব অনুভূতি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলো। পক্ষান্তরে এই আত্মিক স্বাদই যেন তাঁর জন্য ছিলো সম্পূর্ণ স্থূল ও সহজাত এক স্বাদ। খাদ্য ও অষুধ মানুষকে শক্তি ও সজীবতা যোগায়; সেটাই তিনি লাভ করতেন রূহানী গিযা থেকে। ঘরের নিষ্ক্রিয় জীবনের অস্থিরচিত্ততার অনুযোগ করে পত্র লেখা এক তাবলীগী কর্মীকে ঠিক এ আধ্যাত্মিক সত্যের কথাই তিনি লিখে জানিয়েছিলেন। অন্য কারো জীবনে এটা সত্য হোক বা না হোক তাঁর নিজের জীবনে কিন্তু পূর্ণ সত্য ছিলো। তিনি লিখেছেন–

আমার মুহতারাম ভাই! তাবলীগী কাজ হলো মানুষের রূহের গিযা ও আত্মার খোরাক। আল্লাহ পাক নিজ দয়াগুণে এ রূহানী গিযা দ্বারা আপনাকে ধন্য করেছেন। সুতরাং এর সাময়িক অপ্রাপ্তি বা স্বল্পতার কারণে অস্থিরতা অবধারিত। এতে চিন্তার কিছু নেই।

বহুবার এমন হয়েছে যে, তাবলীগ বিষয়ক কোন খোশ খবর শুনে কিংবা তাবলীগের কাজে যাকে সহায়ক মনে করতেন তার সাথে মিলিত হয়ে তিনি অসুস্থতার কথা ভুলে গেছেন। দেহে ও মনে এতটা শক্তি ফিরে পেয়েছেন যে, অসুস্থতা চাপা পড়ে অকস্মাৎ স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে।

আবার কোন তাবলীগী দুশ্চিন্তায় আকস্মিক স্বাস্থ্যাবনতি ঘটতেও দেখা

গেছে। বস্তুতঃ তার সর্বচিন্তা এসে লীন হয়েছিলো একমাত্র চিন্তায়। তাই এক পত্রে তিনি এভাবে লিখতে পেরেছিলেন– মনে তাবলীগের দরদ ব্যথা ছাড়া এমনিতে কুশলেই আছি।

তাঁর অতিসংবেদনশীলতা সংকোচিত হতে হতে এই এক বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিলো। কখনো বলতেন, কর্মব্যস্ততা ও চিন্তাগ্রস্ততার কারণে আমার ক্ষুধা অনুভব হয় না। সময় হলে সবার সাথে বসে যাই মাত্র।

দাওয়াতবিষয়ক পত্রের আগমনে তার এমন আনন্দোদ্দীপনা হতো যা প্রতিক্ষাকাতর প্রেমিক হৃদয়ে মিলনের সুসংবাদে কিংবা প্রেমাস্পদের প্রেম–পত্র লাভ হয়ে থাকে। এক সময় তাবলীগী কারগুযারী লিখে জানাতেন এমন এক সক্রিয় কর্মীকে এক পত্রে মাওলানা লিখেছেন–

তোমার পত্রের কল্পনাই যেন আমার সর্বসত্তার জন্য প্রাণ প্রবাহ স্বরূপ। কথা সর্বাংশে সত্য না হলেও সর্বাংশে মিথ্যাও নয়। অন্তত বিশ্বাসের পর্যায়ে এ চিন্তাকে আমি প্রাণের চেয়ে প্রিয় করা ফরয মনে করি। দগ্ধ হৃদয়ের জন্য সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ মনে করে পত্র পাঠাতে কার্পণ্য করো না যেন।

মুবাল্লিগদের আগমন পথ চেয়ে তাঁর যে অস্থির প্রতিক্ষা আমরা দেখেছি তা ঈদ–রাতের সন্ধ্যায় নও হেলালের অপেক্ষার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলো না। জামা'আত নিয়ে আসার কথা ছিলো এমন এক মুবাল্লিগকে তিনি লিখেছেন–

জমুনার তীর ধরে ধরে মুবাল্লিগদের যে জামা'আত আসবে তার জন্য আমি সে অপেক্ষাই করছি যা মানুষ করে থাকে ঈদের চাঁদের জন্য। খুব ইহতিমাম ও যত্নের সাথে জামা'আত এনো।

অন্তিম অসুস্থতার সময় অতি দুর্বলতার কারণে মাঝে মধ্যে এ ধরনের 'খুশি' সহ্য হতো না। ১৯৪৪ এর জানুয়ারীতে লৌখনোর জামা'আত যখন গেলো তখন একদিন ফজরের পর মাওলানা আমাকে বললেন, আমার চলে আসার পর কানপুরের কাজ হয়ত বন্ধই হয়ে গেছে। (সম্ভবতঃ এমন কোন তথ্য তাঁর কাছে এসেছিলো।) আমি আরয করলাম, লৌখনোর এক জামা'আতের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে। হাজী

ওলী মোহম্মদ ছাহেবকে দেখিয়ে বললাম, ইনিও সেই জামা'আতে ছিলেন। মাওলানা মোছাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন এবং তাঁর হাতে চুমু খেয়ে বললেন, খুশিতে আমার মাথা ধরে গেছে। এখন আমাকে বেশী খুশীও করবেন না। খুশি সহ্য করার ক্ষমতাও এখন আমার মধ্যে নেই।

পক্ষান্তরে কখনো কোন জামা'আতের অনিয়ম বা শৈথিল্য দেখলে এমন আছর হতো যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। একবার তিনি আমাকে বললেন, আমি তো সাহারানপুর থেকে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, বাইরে থেকে আগত জামা'আতগুলো উছুলের পাবন্দী করেনি। লা-ইয়া'নী (অর্থহীন কথা ও কাজ) পরিহার করে চলেনি। শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

মাওলানার এ দাওয়াতি জযবা ও আবেগ উদ্দীপনা নিম্নোক্ত পত্র-উদ্ধৃতিগুলো থেকে কিছুটা আন্দায করা যায়।

এ কাজে জানমাল কোরবান করার মতো মরদে মুজাহিদ তৈরী করতে হবে যারা গোটা জীবন তাতে উৎসর্গ করে দিবে। মোটকথা, এ কাজে নির্দ্বিধায় জীবন উৎসর্গ করা একান্ত জরুরী।[১]

প্রতিটি মেহনতকে তার স্তরে রেখে এবং لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ[২] এর উপর অবিচল বিশ্বাস রেখে যদি আমরা অগ্রসর হতাম, যদি এ ক্ষেত্রে আমরা প্রেম-পাগল হওয়ার এবং পাগল আখ্যায়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী হতাম, সর্বোপরি যদি আমরা এ মেহনতে ফানা হওয়াতেই নিজেদের অস্তিত্বের সন্ধান পেতাম তাহলে এ মেহনতের বরকতে দুনিয়াতেই আমরা জান্নাতের স্বাদ পেতাম।[৩]

এটাই ছিলো হযরত মাওলানার বাস্তব অবস্থা। দাওয়াতি মেহনতে জান্নাতের স্বাদই পেতেন তিনি। এ পথে তপ্ত লু হাওয়া ভোরের হিমেল বায়ুর

১। লেখকের নামে লেখা পত্র

২। নেক আমলকারীদের প্রতিদান আল্লাহ নষ্ট করেন না।

৩। লেখকের নামে লেখা পত্র

একবার হযরত মাওলানার সংগে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব, মৌলবী ইকরামুল হাসান ছাহেব ও আমি অধম কারযোগে 'কুতুবছাহেব' এলাকায় যাচ্ছিলাম। তপ্ত লু হাওয়ার শরীর ঝলসানো ঝাপটা আসছিলো। হযরত মাওলানা বললেন, লু হাওয়া আসছে। জানালা বন্ধ করে দাও। শায়খুল হাদীছ ছাহেব বললেন, জ্বি হাঁ, এখন তো লু হাওয়া অনুভব হচ্ছে। কিন্তু কোন তাবলীগী ছফর হলে এ হাওয়া আর গরম মনে হতো না। মাওলানা বললেন, তা অবশ্যই।

এ অসাধারণ দ্বীনী ইশকের কারণেই কারো মাঝে কোন গুণ ও যোগ্যতা এবং মেধা ও চৌকশতা দেখতে পেলে সংগে সংগে তাঁর চিন্তায় দ্বীনী খিদমতের সম্ভাবনার কথা উঁকি দিতো এবং এ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতো যে, এ সমস্ত গুণ ও যোগ্যতা দ্বীনের পথে ব্যয় হোক এবং স্বরূপে তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক। হিজায থেকে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের নামে এক পত্রে তিনি লেখেন-

'হাকীম রশীদের চিঠি এসেছে। চিঠিতে তার স্বভাব বিশুদ্ধতার ইংগিত পেয়ে বড় লোভ হলো, আল্লাহ পাক আমাদের খান্দানকে কত উত্তম চরিত্রের মানুষ দান করেছেন এবং কত উৎকৃষ্ট খনিরূপে গড়েছেন। হায়, এ সকল প্রতিভা যে কাজের জন্য সৃষ্ট সে কাজে যদি একাগ্রভাবে লেগে যেতো তাহলে আল্লাহ চাহে তো দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামীদেরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারতো। মিয়াঁ ফারাগাতের কবিতা সম্পর্কেও একই কথা মনে করো।'

ডঃ যাকির হোসায়ন খান বলেন, অসুস্থতার সময় একবার পিঠে কিছু নাপাকি লেগে গেলো। ধুতে গেলে শরীরে পানি লেগে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। গোসল ছাড়া পাক হওয়ার উপায়ও কারোই বুঝে আসছিলো না। মৌলবী ইউসুফ ছাহেব বদনার নল দ্বারা এমনভাবে পানি ঢাললেন যে, পিঠ না ভিজেই নাপাকি দূর হয়ে গেলো মাওলানা খুব খুশী হলেন এবং দু'আ দিয়ে বললেন, এই সুবোধ ও সুবুদ্ধি দ্বীনের কাজে ব্যয় হওয়া দরকার।

দরদ, ব্যথা ও অস্থিরতা

(দ্বীনে মুহম্মদী ও উম্মতে মুহম্মদীর প্রতি) মাওলানার মত দরদ ব্যথা ও অস্থিরতা তাঁর সমকালে আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি। চোখে দেখার সুযোগ যার হয়নি তার পক্ষে তা কল্পনাও করা সম্ভব নয়। কখনো কখনো ডাংগায় তোলা মাছের মত শুধু তড়পাতেন, ছটফট করতেন। আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, আমার আল্লাহ! আমি কি করতে পারি, কিছুই যে হচ্ছে না!

এই দ্বীনী দরদ ও দাওয়াতি চিন্তার কারণে কখনো কখনো সারা রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করতেন। অস্থিরতা চরমে পৌঁছলে বিছানা ছেড়ে সারা ঘরে পায়চারি শুরু করতেন। একরাত্রে মাওলানা ইউসুফ ছাহেবের আম্মা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ঘুম আসছে না কেন আপনার? হয়েছে কি বলুন দেখি! তিনি বললেন, কি বলবো! সে কথা তুমিও যদি জেনে ফেলো তাহলে তো বিনিদ্র মানুষ একজনের পরিবর্তে দু'জন হয়ে যাবে।

মোটকথা; তাঁর অবস্থা এমন করুণ হতো যে, মনে করুণা জাগতো এবং মানুষ তাঁকে সান্ত্বনা দিতো। আর কথায় এমন আবেগ উচ্ছ্বাস হতো যেন তাঁর বুকে রয়েছে এক জ্বলন্ত চুল্লি কিংবা চলছে ইসলামী জোশ ও জযবার এক তুফান। যবান যেন সমান তালে চলছে না এবং শব্দ যেন ভাব প্রকাশে পেরে উঠছে না। কখনো কখনো মনের সবটুকু দরদ ব্যথা বলার পর সুন্দর সংশোধনী সহ গালিবের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করতেন–

بك رها هون جنون مين كيا كيا

کچه تو سمجھے خدا کرے کوئی

পাগলের মতো প্রলাপ বকে যাচ্ছি কতো কি! আল্লাহ করুন, কেউ না কেউ কিছু যেন বুঝে।

'শ্রোতাদের মন ঘাবড়ে যেতে পারে' ভেবে কখনো নিরব হয়ে যেতেন। তবে তাঁর সে অবস্থার পর্ণ চিত্র আপনি দেখতে পাবেন সেই বিখ্যাত কবিতা পংক্তিতে যা হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) চিঠির শেষে বারবার লিখেছেন।

اند کے پیش تو گفتم غم دل تر سیدم

که تو آزرده شوی درنه سخن بسیار ست

মনের ব্যথা খুব সামান্যই তোমার সামনে মেলে ধরেছি। আশংকা হয় যে, তুমি বিষণ্ন হবে। নইলে অনেক কথাই জমে আছে বুকে।

হযরত মাওলানার অবস্থা দেখে কিছুটা ধারণা হয় যে, যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামকে লোকেরা পাগল কেন বলতো এবং

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوا مُؤْمِنِيْنَ * [১]

বলে বারবার সতর্ক করার প্রয়োজন কেন দেখা দিতো। মাওলানার এ দরদ ব্যথা ও চিন্তা অস্থিরতা থেকে বিগত যুগের মহাউচ্চ মনোবলের অধিকারী দ্বীন–দরদী মানুষদের অবস্থা কিছুটা অনুমান করা যায় যে, দ্বীনী অধঃপতন এবং সমসাময়িক সমাজে দ্বীনের বিরান অবস্থার কি বেদনাদায়ক অনুভূতি তাঁদের অন্তরে ছিলো। তদ্রূপ দ্বীনী গায়রাত ও দ্বীনী জোশ জযবার কি উত্তাল তরংগ ছিলো হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ) এর অন্তরে, যা তাঁর কলমের মুখ থেকে বারবার এ কবিতা লিখেয়েছে–

انچه من گم کروه ام گراز سلیمان گم شدے

هم سلیمان ثم پری ثم اهر من بگریستے

আমি যা হারিয়েছি তা যদি সোলায়মানও হারাতেন তাহলে এ উপচে পড়া দুঃখের শব্দ তাঁর কলম থেকে বের হয়েছে।

" و اویلاه وا حزناه وا مصیبتاه محمد رسول الله صلى الله علیه و سلم که محبوب

رب العالمین است اتباع او ذلیل و خوار اند و دشمنان او باعزت و اعتبار"

হায় আফসোস, হায় বিপদ, হায় মরণ, মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তম পাত্র তাঁর অনুসারীরা আজ লাঞ্ছিত অপদস্থ। অথচ তাঁর শত্রুরা মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

চূড়ান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও মাওলানা যখন দাওয়াতের সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তার তুলনায় দ্বীনী কাজের পরিমাণ পরিধি লক্ষ করতেন তখন তাঁর কাছে তা খুবই অপ্রতুল মনে হতো। ফলে হক আদায় ও কর্তব্য পালনে ত্রুটির কারণে আল্লাহর

১। মনে হয় তারা ঈমান আনেনি বলে নিজেকে তুমি শেষ করে দেবে।

সামনে জবাবদেহির ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। আর এটাই ছিলো তাঁর ব্যথা বেদনা ও অস্থিরতার কারণ। এক পত্রে তিনি লেখেন–

এ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমার সামনে হক ও সত্য যে পরিমাণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন সে হিসাবে নিজের যাবতীয় চেষ্টা মেহনত, দরদ ব্যথা ও ডাক চি-ৎকারের ন্যূনতম তুল্যতাও দেখি না। সুতরাং যদি অনুগ্রহ হয় তবে সেটা তাঁর শান। আর যদি ইনসাফ হয় তবে তো কোন উপায় নেই।

সে যুগের বিভিন্ন ফিতনার অপ্রতিহত গতি, ধর্মহীনতার সর্বপ্লাবী ঢল এবং নাস্তিকতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তির মুকাবেলায় দ্বীনী মেহনত সমূহের ধীর অলসগতি দেখে মন তাঁর এমনই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তো যে, দাওয়াতের সন্তোষজনক খবরাখবরও তাঁকে আর আনন্দ দিতে পারতো না। এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

কয়েকদিন হলো পত্র এসেছে। এ পত্র দ্বারা হৃদয়ের সজীবতা ও শান্তি লাভ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিলো। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু! ঈমান বিধ্বংসী ও দ্বীনী জযবা নির্মূলকারী ঘোর অন্ধকার ফিতনার গতি ডাকগাড়ীর চেয়েও দ্রুত। পক্ষান্তরে এই তাবলীগী আন্দোলন যা ফিতনার জুলমাত ও অন্ধকারকে নূর ও আলোকোজ্জ্বলতায় পরিবর্তন করার একমাত্র উপায় তার গতি পিপিলিকার চেয়ে মন্থর। ফিতনার প্রবল গতিবেগের তুলনায় মেহনতের এ সামান্য পরিমাণ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয়।

মেওয়াতের বিভিন্ন জামা'আত ও কাফেলা বাইরে বের হতো। মানুষ তাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও সাহস দেখে খুশী ও আশাবাদী হতো। কিন্তু মাওলানার অস্থির ও যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় যেন অন্য কিছু প্রত্যাশা করতো। তার সন্ধানী দৃষ্টি তাদের অন্তরের গভীরে অনুসন্ধান চালাতো। সেখানে আবেগ ও জযবা এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতায় সামান্য ঘাটতি দেখতে পেলে কিংবা ঘরে ফেরার জন্য 'মন কেমন করা' ভাব দেখতে পেলে তাঁর মন চুপসে যেতো এবং আনন্দ বিসাদে পরিণত হতো।

এক পত্রে তাবলীগ সম্পর্কিত কয়েকটি সুসংবাদপ্রাপ্তির উত্তরে তিনি লেখেন–

(আপনার চিঠিতে) তাবলীগী কর্ম তৎপরতার উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে আশিজন মানুষ এখানে তাবলীগের জন্য এসেছে এবং (তাদের মধ্য থেকে) পঁচিশজনের জামা'আত তৈরী হয়েছে। প্রথম খবরটি তো আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের বিরাট ইহসান ও অনুগ্রহ এবং দান ও নিয়ামত যে, দাওয়াতের প্রতি অবহেলার এ নাযুক সময়েও দ্বীনের উন্নতির উদ্দেশ্যে আশি জনের মত মানুষ ঘর থেকে বের হয়েছে। কিন্তু প্রিয় বন্ধু! আল্লাহর শোকর আদায় করার পর নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিও একবার গভীর অনুতাপের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। দীর্ঘ পনের বছরের মেহনত, তাবলীগের নূরানী বরকত এবং দুনিয়াতে যাবতীয় ইজ্জত সম্মান, খ্যাতি ও উন্নতির বাস্তব নমুনা স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও সর্বমোট মাত্র আশিজন লোক বের হয়েছে। এত লাখ মানুষের মাঝে এ সংখ্যা কত নগণ্য। তদুপরি বের হওয়ার পর ঘরে ফেরার জন্য এমনই উতালা যে, ধরে রাখাই মুশকিল। ঘর থেকে বের তো হলো অতি কষ্টে। এখন আবার এই ক্ষণস্থায়ী বাড়ী ঘর তাদেরকে নিজের দিকে টানছে সীমাহীন আকর্ষণে। তাহলে দ্বীনের ঘর কিভাবে আবাদ হবে? মনে রেখো, যতক্ষণ ঘরে বসে থাক। এমনই কষ্টকর মনে না হবে যেমন মনে হয় এখন তাবলীগে বের হওয়া এবং যতক্ষণ তাবলীগের ময়দান থেকে ঘরে ফেরা এমন কষ্টকর মনে না হবে যেমন মনে হয় এখন তাবলীগের কাজে বের হওয়া। সর্বোপরি তাবলীগের উদ্দেশ্যে চার চার মাসের জন্য দেশে দেশে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়ার কাজকে জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জানবাযি রেখে যতদিন আপনারা না দাঁড়াবেন ততদিন জাতি আসল দ্বীনদারীর স্বাদ পাবে না এবং ঈমানের আসল মজা নছীব হবে না।

একইজনকে লেখা অন্য এক চিঠিতে তিনি বলেন–

প্রিয় বন্ধু! দুঃখের কথা কি আর বলবো, কয়েক বছরের চেষ্টার ফসলরূপে এরা ঘর থেকে বের হয় কিন্তু কয়েক মাসও টিকে না। দ্বীনী মেহনতের পরিবেশে কয়েক সপ্তাহ কাটানোরও ধৈর্য রাখে না।

আমি বলতে চাই, যতক্ষণ ঘরপ্রতি একজন পালাক্রমে সর্বক্ষণ দ্বীনের ঘর বানানোর মেহনতে ঘর ছেড়ে বের হওয়াকে অবশ্য কর্তব্য রূপে গ্রহণ না

করবে ততক্ষণ দ্বীনের সাথে নিবিড় ও স্থায়ী সম্পর্ক তৈরী হতে পারে না।

প্রিয় ঈসা! চিন্তা তো করে দেখো, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কায়কারবারে ঘরের সকল সদস্য নিয়োজিত আছে। অথচ দ্বীনের কাজে সে ঘর থেকে একজন মাত্র মানুষেরও বের হওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না। তাহলে আখেরাতকে দুনিয়া থেকে নীচে নামানো হলো কি হলো না? চিঠি লেখা হয়েছে ক'দিন হলো, অথচ ঐ জামা'আতগুলো সবই ফেরত গেছে। জামা'আত বের হওয়ার খোশ খবরে খুশী হওয়ার সুযোগও পাই না। এরই মধ্যে ফিরে যাওয়ার কোলাহল কানে আসে।

চিন্তার পর্দায় উদ্ভাসিত কোন সূক্ষ্ম ভাব ও মর্ম যদি শব্দযোগে ঠিক প্রকাশ করতে না পারতেন এবং যে কথা বলতে চান তা বলার উপযুক্ত ভাষা যদি খুঁজে না পেতেন তখন অদ্ভুত রকমের একটা অস্থিরতা তাঁর মাঝে দেখা দিতো। এক চিঠিতে তিনি লেখেন–

"আমি অধম তাবলীগ প্রসংগে এক দিশেহারা অবস্থায় আছি। সারকথা তুলে ধরার যোগ্যতাও নিজের মধ্যে নেই। আমল তো দূরের কথা। অথচ আল্লাহর অপরিবর্তনীয় বিধান এই যে, তাঁর মদদ ও রহমত ঐ পথেই এসে থাকে।"

"দ্বীনের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াই বিপদ মুছীবত দূর করতে পারে এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সজীব করতে পারে। পক্ষান্তরে এই দাওয়াতি জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে গাফেল থেকে উন্নতি ও সফলতার প্রত্যাশা এবং বিপদ ও দুর্যোগ দূর হওয়ার ভরসা পাগলের পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।" এক চিঠিতে এ বক্তব্য লেখার পর নিজের ইচ্ছার অজান্তেই যেন এই বলে ইতি টেনে দিলেন,

এ কথা লিখতে গিয়ে মন অস্থির হয়ে গেলো। তাই এখানেই ক্ষান্ত করছি।

হৃদয়ের এই তাপ ও উত্তাপ এবং প্রাণের এই যাতনা ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি যে সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন, মেহমানদের ইকরাম ও সেবা যত্ন করতেন এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজ স্বাভাবিক নিয়মে করে যেতেন এটা তাঁর মত 'বিশাল হৃদয়' মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিলো। অন্যথায় হৃদয় দগ্ধ করা যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জীবনভর তিনি বুকে নিয়ে বেড়িয়েছেন তা যদি তাঁর সব

কর্মক্ষমতা 'ছাই' করে ফেলতো তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিলো না। কেননা এ আগুনেই তো মোমের মত গলে গলে তাঁর জীবন–নিশি ভোর হয়েছিলো।

মেহনত মোজাহাদা

দ্বীনের প্রচার প্রসার তথা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে মুখ ও কলমের অধিক থেকে অধিকতর ব্যবহারের নিয়ম ও রেওয়াজ তো দুনিয়াতে ছিলো। কিন্তু এ পথে মেহনত মুজাহাদা এবং ত্যাগ ও কোরবানীকে অধিক গুরুত্ব দেয়া এবং মুখ ও কলম ব্যবহারের তুলনায় এর পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন উপলব্ধি করা– এটা ছিলো সমসাময়িক যুগে মাওলানার একক বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এ দিব্যজ্ঞান আল্লাহ তাঁর এ বান্দার হৃদয়ে অত্যন্ত জোরালো ভাবেই 'সুপ্রকাশিত' করেছিলেন। সহকর্মীদের তিনি এ উছুলের উপর অটল অবিচল থাকার উপদেশ দিতেন। নিজেও এজন্য দু'আ করতেন এবং আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের দ্বারা বিশেষভাবে দু'আ করাতে চাইতেন। এক পত্রে শায়খুল হাদীছের নিকট তার অনুরোধ ছিলো–

আমার প্রাণের একান্ত আকুতি এই যে, খুব ইহতিমাম ও হিম্মতের সাথে দু'আ করবেন, যেন আমার এ আন্দোলন আগাগোড়া আমলভিত্তিক হয়। কথার বড়াই যেন আমলের নূর বরবাদ না করে। বরং মুখের ব্যবহার যেন প্রয়োজন পরিমাণে সহায়কের পর্যায়ে থাকে। وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ (আল্লাহর জন্য তা কঠিন নয়)।

তিনি বলতেন, দ্বীনের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য জান কোরবান করার আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত করা এবং দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়ার যিন্দেগীর তুচ্ছতা তুলে ধরাই আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও খোলাসা।

আজীবন 'স্বাস্থ্যহীনতা' সত্ত্বেও শুরু থেকে মেওয়াতের দৌড়ঝাঁপ এবং বিভিন্ন তাবলীগী সফরে এমন পরিশ্রম ও মোজাহাদা তিনি করেছেন যা শক্ত সমর্থ ও কষ্টসহিষ্ণু তাগড়া মানুষের পক্ষেও দুষ্কর। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য আরাম আহার সব তিনি ভুলে যেতেন। অনভ্যস্ত পায়ে মাইলের পর মাইল, এমনকি চব্বিশ মাইল পর্যন্ত হেঁটে চলেছেন। চাহিদা ও রুচি বিরুদ্ধ খাবার খেয়েছেন। আবার লাগাতার অনাহারেও থেকেছেন। এমনকি 'খাবার' থাকা

অবস্থায়ও ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত আহার গ্রহণের সুযোগ হয়নি। এমনও হয়েছে যে, শুক্রবার রাত্রে বা ভোরে নিযামুদ্দীন থেকে কিছু মুখে দিয়ে রওয়ানা হয়েছেন। আর রোববারে ফিরে এসে পরবর্তী খানা খেয়েছেন। রাতের পর রাত জেগেছেন। কত পাহাড়ে চড়াই উতরাই করেছেন। কত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। মে, জুনের ভয়ংকর লু হাওয়া, মেওয়াতের উত্তপ্ত মরুভূমির গরম হলকা এবং ডিসেম্বর জানুয়ারীর রক্ত হিম করা শৈত্যপ্রবাহ সমানভাবে বরদাশত করেছেন। অন্যদিকে ক্লান্ত শ্রান্ত সাথীদের মনোবল এই বলে চাংগা রাখতেন যে, মেহনত মোজাহাদার সাথেই আল্লাহ রয়েছেন। যার ইচ্ছা সে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারে।

দু' একবার এমন প্রচণ্ড গরমের সময় এমন কমজোর স্বাস্থ্য নিয়ে মেওয়াতের সফর করেছেন যে, বাঁচার আশা ছিলো ক্ষীণ এবং মৃত্যুর আশংকা ছিলো প্রবল। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় সফরকে জিহাদের সফর এবং মেওয়াতের ময়দানকে জিহাদের ময়দান মনে করে জানের খতরা থেকেও বেপরোয়া হয়ে তিনি কদম আগে বাড়াতেন।

১৯৩৬-এর ষোলই মে মেওয়াতের এক সফরের সময় শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া ছাহেব ও ছাহেবযাদা মাওলানা মোহম্মদ ইউসুফ ছাহেবকে লিখেছেন-

দুর্বলতা এত বেশী যে, তবিয়তবিরুদ্ধ উল্টোসিধে কথায় বুক ধরফড় শুরু হয়ে যায়। এমন কি দিল্লী পর্যন্ত গাড়ীর আরামদায়ক সফরেও জ্বর এসে পড়ে। তবু আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ মেওয়াতের ভয়ংকর সাইমুম এবং চরম মুর্খদের বাজে কথার 'নিশানা' হয়ে মৃত্যুকে আলিংগন করার নিয়তে এই 'জেহাদী' সফরে বের হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি। কিন্তু স্বভাবদুর্বলতা ও ভীরুতার কারণে খুবই ভয়ে ভয়ে আছি যে, না জানি কখন এ দুষ্ট নফস ভীরুতার পরিচয় দিয়ে বিপদ কষ্টের মুকাবেলা থেকে পালিয়ে ফিরে আসে। দু'আ করো জান যাওয়া পযন্ত যেন আল্লাহ পাক বিপদ কষ্ট বরদাশতের তাওফিক দেন। وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ (আর তা আল্লাহ পাকের জন্য কঠিন নয়)। কিংবা কামিয়াবির সাথে নিরাপদে যেন ফিরে আসা নছীব করেন। এ সফরকে অতি জরুরী ও ফরয মনে করে এবং স্বাস্থ্যচিন্তাকে জঘন্যতম অপরাধ মনে করে জীবনের আশা ভরসা ত্যাগ করে সফর করছি।

কলতাজপুর এলাকায় ছিলো পাহাড়ের চড়াই পথ। গরুর গাড়ীর সফর ছিলো। পথে গাড়ী উল্টে গেলো। লোকজন বেশ জখম হলেও আল্লাহ আল্লাহ করে সবাই উপরে এসে পৌঁছলো। তবে একেবারেই বিপর্যস্তদশা ছিলো সবার। জখম, রক্ত ও ধুলোবালি মিশে একেবারে একাকার। কষ্টে অনভ্যস্ত কিছু আলিমও সাথে ছিলেন। কিন্তু কষ্টের কথা কেউ মুখে আনার আগেই মাওলানা এই বলে তাদের ভাবনার দিক নির্ধারণ করে দিলেন। বন্ধুগণ! সারা জীবনে আজ একদিন মাত্র 'হেরা পর্বতের অনুরূপ চড়াই'-এর অভিজ্ঞতা তোমাদের হলো। বলো দেখি, এ অভিজ্ঞতা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কতবার এসেছে। জীবন ভরের এ বঞ্চনা ও ত্রুটির জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। মাওলানার এ মর্মস্পর্শী বক্তব্যের পর অনুযোগের কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ করে, কার সাধ্য!

মাওলানা (রহঃ) কোন কাজের প্রতিজ্ঞা করে ফেলার পর কোন প্রতিকূলতাই আর প্রতিবন্ধক হতে পারতো না। তাঁর দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে খুব সামান্য কিছুই দুনিয়াতে ছিলো। তাই হতাশা ও নিরাশার অস্তিত্ব সেখানে বড় একটা ছিলো না। যখন যে কাজের প্রয়োজন মনে হতো সাথে সাথে তার ইরাদা করে ফেলতেন। এমনও হয়েছে যে, 'নূহ' এর লোকদেরকে কোন কথা বলা জরুরী মনে হলো। রাত চারটায় নিযামুদ্দীন থেকে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। দিল্লীতে হাজী নাসীম ছাহেবের কুঠিতে গিয়ে গাড়ী নিলেন এবং শেষ রাত্রে 'নূহ' পৌঁছে সবাইকে ঘুম থেকে জাগালেন এবং ফজরের আগেই প্রয়োজনীয় কথা সেরে বাদ ফজর ফেরত রওয়ানা হলেন। কখনো বা প্রবল বৃষ্টির কারণে সড়কের উপর দিয়ে ঢল নেমেছে। আর হযরত মাওলানা মেওয়াতের কোন এলাকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছেন। লোকেরা টাংগা গাড়ী আনতে চাইলো। কিন্তু তিনি 'দরকার নেই' বলে হাঁটু পানিতেই চলা শুরু করলেন। মাওলানা মোহম্মদ মনযূর নোমানী ছাহেব অতি যথার্থ লিখেছেন-

শারীরিক দুর্বলতা তাঁর অসম্ভব রকম ছিলো ঠিকই। কিন্তু এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের পথে পরিশ্রমের এমন চূড়ান্ত করে দেখিয়েছেন তিনি যে, আমার ধারণা; জান্নাত যদি তার যাবতীয় নেয়ামত ও মোহনীয়তা এবং

জাহান্নাম যদি তার যাবতীয় আযাব ও ভয়ংকরতাসহ কারো সামনে আত্মপ্রকাশও করে আর তাকে বলে দেয়া হয় যে এটা করলে জান্নাত পাবে, না করলে জাহান্নামে যাবে তাহলে সম্ভবতঃ তার চেষ্টা পরিশ্রম মাওলানা মোহম্মদ ইলিয়াস (রহঃ)–এর (বিশেষতঃ তাঁর শেষ জীবনের) চেষ্টা পরিশ্রমের চেয়ে বেশী কিছুতেই হবে না।

তবে এই 'ফানা–ফিল্লা' অবস্থা সত্ত্বেও সাথী সংগীদের আরাম রাহাতের তিনি যথেষ্ট যত্ন নিতেন। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার চিন্তা করতেন। কাউকে খামোখা কষ্টের মুখোমুখি করতেন না। তবে মেহনত মোজাহাদার জন্য (মানসিকভাবে) তৈরী করতেন।

একবার মেঁওয়াতের এক সফরে মাওলানা তাঁর কতিপয় সফরসংগীকে কিছুদিন মেওয়াতে রেখে আসার সময় বললেন, "আপনারা মেহনত ও কষ্ট তালাশ করবেন।" পক্ষান্তরে মেওয়াতি সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনারা তাদের আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন।" পরে আবার মেহমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনাদের হিসসায় শুধু আরামই যদি জুটে তাহলে আপনারা হেরে গেলেন।" তিনি নিজেও আল্লাহর দেয়া আরামের আসবাবকে তুচ্ছজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করতেন না। বরং আল্লাহর নেয়ামত রূপে ব্যবহার করতেন। আরামের সামানপত্রের ফিকিরে যেমন থাকতেন না তেমনি হাতে আসলে অবজ্ঞাও করতেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিলো لَا يَتَكَلَّفُ غَائِبًا وَلَا يَرُدُّ مَوْجُوْدًا (যা নেই তা পেতে সচেষ্ট হতেন না এবং যা আছে তা অবজ্ঞা করতেন না।)

অনর্থক কষ্টপ্রিয়তা বা আত্মপীড়ন প্রবণতা তার স্বভাবে ছিলো না। অবশ্য দ্বীনের জন্য ত্যাগের মনোবল সমুন্নত করার জোর উৎসাহ দিতেন। বাইরে সফরে যাওয়ার সময় মেওয়াতি মুবাল্লিগদেরকে অছিয়ত করতেন, যেন তারা তাদের স্বভাবসরলতা ও কষ্টপ্রিয়তা ভুলে না যায়। এবং শহুরে লোকদের আরামপ্রিয়তা ও লৌকিকতা যেন গ্রহণ না করে। কেননা এটা তাদের বড় রোগ। তদ্রূপ সাধারণ থাকা, সাধারণ খাওয়া, মাটিতে সাধারণ শোয়া এবং কষ্ট পরিশ্রমের সাধারণ জীবন যাপনে সব সময় যেন তারা অভ্যস্ত থাকে। সহজ সরল মেওয়াতিরা শহুরে জীবনের সংস্পর্শে এসে নাগরিক আচার অভ্যাস না গ্রহণ করে ফেলে এবং নাগরিক জৌলসের হাতছানিতে না আটকা পড়ে– এজন্য

তিনি খুব ভয় ও দুশ্চিন্তায় থাকতেন।

মাওলানা বলতেন, কষ্ট হলো মানব জীবনের স্বাভাবিক বিষয়। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْ كَبَد *

নিশ্চয় মানুষকে আমি কষ্ট পরিবেষ্টিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

সুতরাং দ্বীনের কাজে কষ্ট স্বীকার না করলে দুনিয়ার অনর্থক কাজে কষ্ট করতে হবে; এখন যেমন হচ্ছে। সারা দুনিয়ার মানুষ যেখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনের কল্পিত সফলতার পিছনে পাগলা খাটুনি খেটে চলেছে সেখানে দ্বীনের মতো মূল্যবান এবং আখেরাতের মতো সুনিশ্চিত বিষয়ের জন্য সামান্য কষ্ট স্বীকার কিই বা এমন বিরাট কিছু! জনৈক মুবাল্লিগের অসুস্থতায় সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন, "যে যুগে রুটি রোজির জন্য মানুষের জান মাল চলে যাচ্ছে সেখানে দ্বীনের মেহনতে গিয়ে সামান্য জ্বর এসে পড়া তেমন বড় কিছু নয়।

এক পত্রে তিনি লেখেন–

"দুনিয়ার জীবন জীবিকার চেষ্টা মেহনতকে দ্বীন ঈমান দুরস্তকারী বিষয়ের মেহনত দ্বারা যতক্ষণ অবদমিত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'খোদায়ী গায়রত' আমাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের দৌলত দ্বারা সৌভাগ্যবান করতে পারে না।

অন্য এক চিঠিতে–

"আল্লাহর আদত ও নিয়ম সাধারণতঃ দ্বীনী মেহনত মোজাহাদার পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য মানুষ নিজেকে যত বেশী অবনমিত করে এবং দুঃখ–কষ্ট ও অপ্রীতি ভোগ করার মাধ্যমে দেহ–মন, শক্তি –বল তথা নিজের সর্ববিষয়ে হীনতা ও ভগ্নতার যত চূড়ান্তে উপনীত হয় ততই তা আল্লাহ পাকের রহমত আকর্ষণের কারণ হয়। তাই বলা হয়েছে–

اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ *

ভগ্ন–হৃদয়দের সাথে আমি আছি।

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

যারা আমার জন্য মেহনত মোজাহাদা করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ প্রদর্শন করবো।

"কোন পথের যিল্লতি ভোগ না করে সে পথের ইজ্জত লাভ করা সাধারণতঃ হয় না।"

তবে যুগ ও মানুষের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে দাওয়াতের পথে কারো এক কদম অগ্রসর হওয়া এবং সামান্য কষ্ট স্বীকার করাকেও তিনি বড় কদর করতেন এবং গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে তা অনুভব করতেন। বস্তুতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও স্বীকৃতি দানের এ উদারচিত্ততার কারণেই দুর্বলমনা ও আরামকাতর কর্মীদের মনোবলও সমুচ্চ থাকতো। ফলে হোঁচট খেয়ে খেয়ে হলেও তাদেরও পক্ষে 'পথচলা' অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছিলো। এক তাবলীগী সফরে এ অধম অসুস্থ হয়ে পড়লে এ মর্মে তিনি এক সান্ত্বনা পত্রে লিখেছিলেন–

আমার তো এ অসুস্থতায় মোবারকবাদ জানাতে ইচ্ছা হয়। কেননা এই চতুর্দশ শতাব্দীতে শুধু আল্লাহর পথে মেহনতওয়ালা এক সফর অসুস্থতার কারণ হয়েছে। কি সৌভাগ্য!

هَلْ اَنْتَ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ + وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ [১]

সাধারণভাবে তো এ অসুস্থতার মূল্য এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, দুনিয়াতে হাজারো মানুষের জ্বর হয়। আপনি একজনেরও হলো। কিন্তু এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার জ্বর সম্ভবতঃ পৃথিবীতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, দৃশ্যতঃ এর কারণ হলো এক মহান জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য কদম বাড়ানো। আমি তো বলি, জান মালের কোরবানির বিনিময়েও যদি এ পথ খুলে যায় তবে উম্মতে মোহম্মদীর অবসরহীন অতিব্যস্ত মানুষগুলোর জন্যও হক ও হিদায়াতের পূর্ণ হিসসা লাভের পথ স্থায়ীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে।

১। হিজরতের পর ছাহাবা কেরামের সাথে মিলে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ করার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পবিত্র আংগুল রক্তাক্ত হয়েছিলো। তখন তিনি বলেছিলেন, "তুমি তো রক্তাপ্লুত একটি আংগুল মাত্র। কষ্ট যা ভোগ করেছো তা আল্লাহর পথেই করেছো।

অন্য এক পত্রে–

যে ধর্মের মূল্য হিসাবে হাজারো জানের স্বতঃস্ফূর্ত কোরবানিও যথেষ্ট হতে পারে না বরং হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ও চোখের অশ্রু বর্ষণই হতে পারে যে ধর্মের আসল মূল্য; সেই ধর্মের জন্য আমাদের এই নামমাত্র 'হরকত মেহনত' আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যের তুলনায় অতিতুচ্ছ, অতিনগণ্য। কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের প্রতিও খোদায়ী মেহেরবানীর স্বততঃ প্রকাশ এবং তুচ্ছতম মেহনতের উপরও শেষ যুগের লোকদেরকে ছাহাবা কেরামের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশী দানের সুসংবাদ ও সত্য প্রতিশ্রুতি এবং لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (কোন মানুষকে আল্লাহ তার সাধ্যাতীত কাজের হুকুম করেন না) এই অভয়বাণী আমাদের 'যৎসামান্য' সম্পর্কেও মনে বড় আশাবাদ জাগ্রত করছে।

হযরত মাওলানার কথায় ও কাজে উদ্বুদ্ধকরণ ও মনোরঞ্জনের সুসমন্বয় ছিলো। যখন দাওয়াত দিতেন বা উদ্বুদ্ধ করতেন তখন তো চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বলতেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সামান্য মেহনতকেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বাগত জানাতেন এবং অশেষ কদর করতেন। তবে লক্ষ্য হিসাবে নিজের সামনে চূড়ান্ত সীমাকে রাখতেন, যেন আমল নিয়ে কেউ গর্ব করতে না পারে এবং সেটাকেই সেরা ও পূর্ণাংগ মনে না করে বসে।

সুউচ্চ মনোবল

মাওলানার জীবন ও চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ ছিলো হিম্মত ও মনোবল। তাঁর গোটা জীবন, তাঁর সকাল সন্ধ্যার উঠা–বসা, চিঠিপত্র ও বাণী বক্তব্য আমাদের কথার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ। যে কাজকে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং কাওমের উদ্দেশ্যে যে ডাক তিনি দিয়েছিলেন বিরাজমান পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ও পরিচয় ছিলো না। বরং যুগ ও সমাজের চিন্তা চেতনার স্তর থেকে বহু উর্ধ্বে ছিলো। এ কারণে নিজের আকাশ ছোঁয়া ইচ্ছা ও স্বপ্নের কথা খুব কমই তিনি বলতেন।

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ *

মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী কথা বলো।

اِسْتَعِيْنُوا عَلٰى اُمُوْرِكُمْ بِالْكِتْمَانِ

গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে নিজেদের কর্মসমূহ সুরক্ষিত করো।

এ নীতি তিনি অনুসরণ করতেন। তবু কথার ফাঁকে কখনো তার কিছুটা আভাস ফুটে উঠতো। একবার তিনি তাঁর প্রিয়পাত্র মৌলবী যহীরুল হাসান (এম, এ আলীগড়)কে– যিনি একজন দূরদর্শী আলিম ছিলেন– বললেন, মিয়া যহীরুল হাসান, আমার উদ্দেশ্য ও মর্ম কেউ হৃদয়ংগম করতে পারে না। মানুষ মনে করে এটা বুঝি নামাযের আন্দোলন। আমি হলফ করে বলতে পারি; "এটা নিছক নামায কালামের আন্দোলন নয় কিছুতেই।" একদিন অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বললেন, মিয়া যহীর! (জাগ্রত চেতনার অধিকারী) এক নতুন কাওম তৈরী করতে হবে।

হযরত মাওলানা তাঁর দ্বীনী দাওয়াতকে পরিস্থিতিউদ্ভুত কোন সাময়িক আন্দোলন মনে করতেন না। এমনকি তাঁর প্রভাব শুধুমাত্র শতাব্দী প্রসারী হবে তাতেও তাঁর উচ্চাশাপূর্ণ মন সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত ছিলো না। আল্লাহর রহমতের কাছে তিনি বরং আশা করতেন যে, তার আন্দোলন হবে দ্বীনী পুনর্জাগরণের এক চিরস্থায়ী উৎস। নীচের উদ্ধৃতিগুলো থেকেই তাঁর এ বুলন্দ হিম্মত ও উচ্চাশার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়।

অধমের নামে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন–

"আপনার 'সুপত্র' বহু আনন্দবার্তাসহ এসে মজলিসের শোভা বর্ধন করেছে। তবে কামনা করি, আল্লাহ পাক 'সংবাদগুলোকে' ফলপ্রসূ ও ঘটনাপূর্ণ করুন এবং সকল সংবাদ ও ঘটনাকে আপন কুদরত দ্বারা – যার উপর এককভাবে অন্য কোন সাহায্য ছাড়া এ সাত আসমান ও যমীন টিকে আছে – এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা এমন স্থায়িত্ব দান করুন যাতে তা সুদূর ভবিষ্যত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দু'চার শতাব্দী পরে বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো শিকড়হীন ও ভাসমান যেন না হয়। মোটকথা বুনিয়াদের মজবুতির খুব দু'আ করতে থাকুন।

মুনশী নাছরুল্লাহ ছাহেব বলেন, একবার আমি আরয করলাম যে, মানুষ আপনাকে বর্তমান কালের মুজাদ্দিদ বলে থাকে। তিনি বললেন, কে বলেছে? আমি বললাম, লোকদের মুখে মুখে চর্চা হচ্ছে। তিনি বললেন, না, আমি নই বরং আমার জামা'আত মুজাদ্দিদ।

মাওলানার আন্তরিক আকাঙক্ষা ছিলো যে, এ দাওয়াত ও আন্দোলনে এমন কোন উপাদান যেন যুক্ত না হয় যার কারণে মানুষ এটাকে তাঁর ব্যক্তিসত্তা কিংবা তাঁর সমকালের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে বসতে পারে। কেননা তাহলে পরবর্তীতে সাধারণ মুসলমানগণ একাজের মেহনত মোজাহাদায় হিম্মত ও সাহস হারিয়ে ফেলবে। এ কারণে কোন পর্যায়েই তাঁর নামে দাওয়াতের পরিচিতি হোক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন, এ কাজ মুসলমানদের সাধারণ ও সার্বজনীন দাওয়াতের প্রকৃতি ও পরিচয় লাভ করুক। তাই তিনি সকল ওলামায়ে কেরামকে তাতে শরীক হওয়ার দাওয়াত দিতেন, যাতে এ ধারণা গড়ে না উঠে যে, এটা তাঁর একার আন্দোলন। এ প্রসংগেই একবারের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি যেন, আমাদের এ আন্দোলন কারামাতনির্ভর না হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানার জনৈক সহকর্মী এর কল্যাণকর দিক ব্যাখ্যা করে বললেন, এ দু'আর হিকমত এই যে, সব যুগের মানুষ যেন এ কাজ চালানোর এবং এ পথে মেহনত মোজাহাদা করার হিম্মত পায়। কেননা কারামতনির্ভর হলে মানুষ এটাকে ব্যক্তিবিশেষ ও যুগবিশেষের বৈশিষ্ট্য মনে করে বসবে। মাওলানা তাঁর সহকর্মীর এ ব্যাখ্যা সমর্থন করলেন।

মাওলানার দৃষ্টিতে তালিম ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে কয়েকশত মানুষের ঘর থেকে বের হওয়া এবং পথে পথে ঘুরে বেড়ানো তেমন বড় কোন ব্যাপার নয়। তাঁর উচ্চাশা তো ছিলো এই যে–

"হায়, এমন একটা সময় যদি আসতো যখন কাওমের লাখ লাখ মানুষ আল্লাহর রাস্তায় ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসবে। কাওমের লাখ লাখ মানুষ (দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে) দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াবে এবং এটাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করে নিবে।

তাঁর মতে শুধু মেওয়াতের আখলাক চরিত্র ও আচার অভ্যাস পরিবর্তন হওয়াই যথেষ্ট ছিলো না। তিনি দেশের ভাষা পর্যন্ত বদলে ফেলতে চাচ্ছিলেন। সমগ্র মেওয়াতি জাতির মুখের ভাষা হবে আরবী। এই ছিলো তাঁর স্বপ্ন। এটাকে

তিনি অসম্ভবও মনে করতেন না। কেননা তার বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহর সাহায্য (এবং আল্লাহর তাওফিক) হলে মানুষের চেষ্টা সাধনার সামনে দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু নেই। সুতরাং অন্তত মাদরাসা মহলে আরবী ভাষা অবশ্যই পুনরুজ্জীবন লাভ করুক, এ ছিলো তাঁর একান্ত কামনা। অধমের নামে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন–

"আমি অপদার্থের মাথায় এমন কিছু চিন্তার উদ্ভাস হয় যা সময়ের আগে হয়ে যাবে মনে করে মুখে আনতে ইচ্ছা হয় না। তাবলীগী সফরকালে যদি তালিবে ইলমদের পারস্পরিক কথাবার্তা আরবীতে বলা কার্যকরভাবে বাধ্যতামূলক করা যায় তাহলে সে ব্যাপারেও গভীর দৃষ্টি দান করুন।

তাঁর আদেশ কার্যকর হয়েছে জেনে তিনি যারপর নাই খুশী হলেন এবং লিখলেন–

আরবী ভাষায় কথা বলার সুন্নত পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় পুলকিত হলাম। আল্লাহ পাক এ পদক্ষেপকে অন্যান্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণের ওছিলা করে দিন।

মাওলানা তাঁর এ কাজকে শুধু মাত্র হিন্দুস্তানের সীমানায় আবদ্ধ দেখতে রাজি ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর চিন্তায় এ দাওয়াতি পায়গাম ও কর্মসূচী সমগ্র বিশ্বে, বিশেষতঃ ইসলামী বিশ্বে এবং সর্বোপরি আরব বিশ্বে পৌঁছে দেয়ার পূর্নাংগ রূপরেখা ও পরিকল্পনা লালন করছিলেন। এ কাজের প্রভাব প্রতিক্রিয়া ও বরকতপূর্ণ ফলাফল সম্পর্কে অনেক বড় স্বপ্ন ও উচ্চাশা ছিলো তাঁর মনে। তাঁর বিশ্বাসের জগতে অসম্ভবের তালিকা এত দীর্ঘ ছিল না, ভীরু ও দুর্বলমনা লোকেরা যতটা কল্পনা করে থাকে তিনি মনপ্রাণ উজাড় করে চেষ্টা সাধনায় নিমগ্ন হতেন এবং পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন। আল্লাহর দয়া ও রহমত, ক্ষমতা ও কুদরত এবং মদদ ও নোছরতের সামনে কোন কিছু অসম্ভব মনে হতো না তাঁর কাছে। শায়খুল হাদীছ মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া ছাহেবকে এক পত্রে তিনি বড় আবেগ ও দরদের সাথে লিখেছিলেন–

অতিকাতরতা ও প্রত্যয়ের সাথে, আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই দিয়ে আমি আপনার কাছে আরয করছি– أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ (আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ আচরণ করে থাকি)

এ হাদীছের মর্মবাণী উপলব্ধি করুন এবং আল্লাহর কুদরতে সবকিছুই সহজ, অন্তরে এ বিশ্বাস সুস্থির করুন। অতঃপর দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন কাজ কঠিন ও অসম্ভব হওয়ার ধারণা অতিঅবশ্যই পরিত্যাগ করুন। আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহ ও যুগ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে আবর্তিত বিষয়ে আল্লাহর কুদরতের পরিবর্তে কাল ও যুগের প্রতি তাকিয়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকা এবং হিম্মত ও প্রেরণাদানকারী খোদায়ী বাণীগুলোর প্রতি ভরসা না রাখা প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞার উপযোগী নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন বিধান সমূহ বজ্রনিনাদে ঘোষণা করছে যে, তাঁর কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে এবং যা কিছু আশা করবে তাই পাবে। তাহলে কেন তোমার মতো বুদ্ধিমান মানুষ মোহম্মদী আবেগ ও জযবাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমতি দরবারে হাঁটু গেড়ে বসছ না।

بك رہاهوں جنوں میں کیا کیا

کچه تو سمجھے خدا کرے کوئی

পাগলের মতো কতো কি প্রলাপ বকে চলেছি। আল্লাহ করুন, কিছুতো বুঝুক কেউ না কেউ।

এমন পাগল, মজনু হয়েছি আমি যে, ভাবের প্রাবল্যে আসমান সমান মর্যাদার অধিকারী বুজুর্গানের ভাবমূর্তিও অনেক সময় আমার নজরে থাকে না। আশা করি ক্ষমা সুন্দর মনে কল্যাণ প্রার্থনা দ্বারা সাহায্য করবেন।

কিন্তু দেশ বিজেতাদের যে উচ্চ মনোবল ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ঐতিহাসিকদের ভাষায় 'রাজসিক' আখ্যা লাভ করে থাকে; দুঃখের বিষয় যে, এক ফকির দরবেশের ক্ষেত্রে সেটারই মর্যাদা খাটো করা হয় 'ভাবাতিশয্য' বলে।

দ্বীনী আত্মসম্মানবোধ

হযরত মাওলানার স্বভাবে দ্বীনের বিষয়ে গায়রত ও আত্মসম্মানবোধ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। আর এটাই ছিলো তাঁর দাওয়াতি কাজের অন্যতম

চালিকাশক্তি। যে দরদ ব্যথা ও যন্ত্রণাদগ্ধতা মুহূর্তের জন্যও তাঁকে সুস্থির হতে দিতো না, তার পিছনেও ছিলো এই দ্বীনী গায়রাতবোধ। দ্বীনের অব্যাহত অধঃপতন ও অবক্ষয় এবং কুফুরি ও অধর্মের প্রবল প্রতাপ তাঁর জাগ্রত, সংবেদনশীল ও গায়রতপূর্ণ স্বভাব এক লমহার জন্যও বরদাশত করতে পারছিলো না। কিন্তু আল্লাহর তাওফিক এবং সুগভীর দ্বীনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কাজের যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাস তাঁর চিন্তায় গড়ে উঠেছিলো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও ভাবাবেগের কারণে তাতে পরিবর্তন বা সংশোধনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। বরং আল্লাহ প্রদত্ত অপরিসীম সংযম ও মনের বিরাটত্ব দ্বারা অন্যান্য বিষয় এমনভাবে সয়ে যেতেন যেন সেগুলো সম্পর্কে তাঁর মনোযোগ বা জানাশোনাই নেই। কিন্তু সংযমী হৃদয়ের কানা উপচে দু'এক ফোঁটা যখন পড়ে যেতো এবং বুকের উত্তপ্ত চুল্লি থেকে দু' একটি স্ফূলিংগ যখন বিচ্ছুরিত হতো তখন নিকটজনদের অনুভব হতো যে, দ্বীনী মুহব্বত ও গায়রতের কি বিক্ষুব্ধ ঝড় বুকের পাঁজরের নীচে তিনি চাপা দিয়ে রেখে ছিলেন!

একবার আমি অধম লাল কেল্লার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত কি কখনো লাল কেল্লা পরিদর্শন করেছেন? তিনি বললেন, লাল কেল্লায় ঘুরে বেড়ানোকে আমি বেগায়রতি ও আত্মসম্মানবোধহীনতা মনে করি। তবে হাঁ, শৈশবে একবার দেখেছিলাম যখন বড়রা কেঁদে বুক ভাসিয়ে ছোটদের দেখাতেন।

অমুসলিমদের শান শওকতপূর্ণ স্থান ও কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে তিনি বলতেন, কেউ যদি কুনূতে নাযিলাহ (শত্রুর ধ্বংস কামনামূলক প্রার্থনা) না পড়ে নির্লিপ্তভাবে এ স্থানগুলো অতিক্রম করে চলে যায় তাহলে তার ঈমান লোপ পাওয়ার ভয় আছে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (ও বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস বিভাগের) বিভিন্ন পরীক্ষায় দ্বীনী মাদরাসার ছাত্রদের অংশগ্রহণে মাওলানা অন্তরে বড় ব্যথা পেতেন। তিনি বলতেন, এর দ্বারা 'নিসবত' তথা আত্মিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের সম্পর্ক আল্লাহর পরিবর্তে গায়রুল্লাহর সাথে কায়েম হয়ে যায় এবং নূর ও বরকত শেষ হয়ে যায়। মাওলানার কাছে এটা খুবই অসহনীয় ছিলো যে, আরবী ভাষা ও দ্বীনী

ইলমের ক্ষেত্রেও মুসলিম স্কলারগণ অমুসলিমদের তল্পীবাহী ও আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ মাওলানা হাফেজ আব্দুল লতিফ ছাহেবকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন--

হাফেজ ছাহেব! আমার খুবই গায়রাত বা অপমানবোধ হয় যে, মুসলমানদের আরবীজ্ঞানের পরীক্ষক হবে কাফের অমুসলমান!

হযরত মাওলানা তাঁর জনৈক প্রসিদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তিকে-- যিনি أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (কাফিরদের প্রতি রুদ্র) এর বাস্তব নমুনা ছিলেন, اَلْبُغْضُ لِلّٰهِ (আল্লাহর জন্য কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ) এর ক্ষেত্রে আদর্শ মনে করতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে বলতেন "আল্লাহর ওয়াস্তে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণের গুণ তাঁর কাছ থেকে শেখার বিষয়।

শরীয়তের কোন বিধানের সমালোচনা ও দোষচর্চা মাওলানার বরদাশতের বাইরে ছিলো। দ্বীন ও শরীয়তের এই ধরণের কাঁটাছেড়ার বিরুদ্ধে তাঁর ছিদ্দীকী ধমনীতে [১] রক্ত টগবগিয়ে উঠতো। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে কোন 'কল্যাণ চিন্তাও' নিন্দা প্রতিবাদ থেকে বিরত রাখতে পারতো না। এমনি এক ক্ষেত্রে মাযাহেরুল উলুম মাদরাসার নাযিম মাওলানা আব্দুল লতিফ ছাহেবকে মেওয়াত সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন--

মানুষ যেন তাদের বিচার আচার ও যাবতীয় কাজকর্ম শরীয়ত মুতাবিক করাকেই ইসলাম মনে করে সে বিষয়ে সর্বাধিক জোর দেয়া উচিত। অন্যথায় সে ইসলাম হবে খুবই খণ্ডিত। এমনকি শরীয়তের প্রতি অবজ্ঞার কারণে ইসলামই অন্তর হতে বিদায় হয়ে যায় এবং নিশ্চতই কুফুরির রূপ ধারণ করে।

১। যাকাত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর এই বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, أَيُنْقَصُ الدِّيْنُ وَأَنَا حَيٌّ (আমি বেঁচে থাকতে দ্বীনের কাটছাঁট হতে পারে?) মাওলানা মোহম্মদ ইলিয়াস (রহঃ) বংশসুত্রে ছিদ্দীকী ছিলেন। এ প্রসংগে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)--এর বংশধর হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ)--এর মন্তব্যও স্মরণযোগ্য। তিনি এক প্রসংগে বলেছিলেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমাদের ফারুকী রক্ত টগবগিয়ে উঠে।

بے اختیار رگ خر و قیم در حرکت می آید

এ ধরনের একটি বিষয় হলো 'পরস্পর সম্মত বিবাহ'। শুনেছি, আগে তো এটাকে হারামই মনে করা হতো। এখন মুখে হালাল স্বীকার করলেও বাস্তব অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। যেমন; নূহ-এর আটাওড় অঞ্চলে নিজস্ব সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এক দম্পতি স্থানীয় নির্যাতনের আশংকায় এলাকা ছেড়ে 'গোড়গানো' জেলায় গিয়ে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস শুরু করলো। কিন্তু আফসোস! অসভ্য ও মূর্খ কাওম রমযানুল মুবারকের শেষ শুক্রবারে বিবাহ সম্পন্নকারী পুরুষটিকে ঈদের তৃতীয় দিন শুক্রবার হাত পা ভেংগে হত্যা করলো এবং তেল ঢেলে লাশ পুড়িয়ে ছাইভস্ম করে নদীতে ভাসিয়ে দিলো। এটা অত্যন্ত জোরদারভাবে পেশ করা উচিত যে, কুফুরি, শিরক ও যিনার মতো জঘন্যতম কবীরা গোনাহকেও তেমন দোষণীয় মনে না করা অথচ আল্লাহ পাকের হালালকৃত বিষয়কে এতটা ঘৃণার চোখে দেখার শরীয়তি হুকুম কি হতে পারে? আপনি অবশ্যই বলুন, তাদের ঈমান থাকলো কোথায়? ঈমান থাকার কি উপায় হতে পারে?

এ দ্বীনী গায়রতের কারণেই শুরুতে তিনি বৃটিশ সরকারের বাধ্যতামুলক শিক্ষার প্রচণ্ড বিরোধিতাপূর্বক এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। তদ্রূপ মুসলিম ধর্মান্তরের ভয়াবহ ফিতনা সৃষ্টিকারী শুদ্ধি আন্দোলন প্রতিরোধেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে মেওয়াতের মাটিতে শুদ্ধি আন্দোলন কখনই শিকড় বসাতে পারেনি।

সুন্নতের ইত্তেবা

জীবনব্যাপী সুন্নতের পূর্ণ পাবন্দীর ব্যাপারে হযরত মাওলানার মতো যত্নশীলতা এ যুগে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর সুন্নত-প্রেম দেখে পূর্ববর্তী ইমামগণের স্মৃতি তাজা হতো। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও সুন্নতে রাসুল অনুসন্ধান ও পালন, সমাজের বুকে সুন্নতের প্রচার প্রসার এবং সাধারণ সুন্নতকেও আমলের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দান ছিলো মাওলানার স্বভাবজাত। জীবনের শেষ দিন, যা মুমিনের যিন্দেগীর ব্যস্ততম দিন হয়ে থাকে; শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবকে ডেকে বড় গুরুত্বের সাথে তিনি বললেন, আমি তোমাকে অছিয়ত করছি। হাদীছ থেকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার

অভ্যাস ও চরিত্রবিষয়ক ঘটনাবলী অনুসন্ধান করে মানুষের মাঝে তা প্রচারের কাজে যথাসম্ভব চেষ্টারত থেকো।

মৃত্যুলগ্নে অনুপস্থিত কতিপয় আপনজনের উদ্দেশ্যে হাজী আব্দুর রহমান ছাহেবের মাধ্যমে বিশেষ অছিয়ত 'বার্তা' রেখে গিয়েছিলেন। তন্মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো সুন্নতের ইত্তেবা। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী ফেকাহ বিশারদদের সুন্নত সম্পর্কিত বিভিন্ন পারিভাষিক প্রকরণ নিজস্ব ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে জিনিসের সম্পৃক্ততা ছিলো সেগুলোকে কার্যত জরুরী-ই মনে করা উচিত।

সুন্নতের ইত্তেবা ও মুহব্বতের প্রবলতা ইবাদতের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ অভ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিলো। তাই অভ্যাস ও স্বভাবগতঃ ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণে তাঁর অন্তর লালায়িত ছিলো। অন্তিম অসুস্থতার মধ্যবর্তী সময়ে দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে তিনি নামাযের জন্য মসজিদে আসতেন এবং মনেপ্রাণে চাইতেন, এ ক্ষেত্রেও যেন হুবহু ঐ সুন্নতি অবস্থা রক্ষিত হয় যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিমকালে মসজিদে আসা সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ *

(দু'জন মানুষের উপর ভর করে তাশরীফ আনলেন কিন্তু পায়ে জোর দিতে পারছিলেন না।) কখনো অন্য রকম অবস্থা হলে কষ্টবোধ হতো।

ইত্তিবায়ে সুন্নতের অতিসূক্ষ্ম ও অতিউচ্চ স্তর হলো বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনায় শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে স্বাভাবিক মানবীয় প্রতিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটানো। সাধারণ মানবীয় স্বভাবের বিচারে সুখ দুঃখের যে সব ঘটনা, তাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক ভাবেই সুখ বা দুঃখ অনুভব করতেন। শোকে শোক ও আনন্দে আনন্দ প্রকাশ- এই ছিলো তাঁর স্বাভাবিক আচরণ। অনেকে ভাবে, স্বভাবগতঃ ভাবাবেগ ও অনুভব অনুভূতির উর্ধ্বে উঠে যাওয়াই বুঝি তাছাওউফ ও আধ্যাত্মিকতার চরমোৎকর্ষ এবং দুঃখবোধ বা আনন্দবোধ ভুলে যাওয়াই বুঝি মোক্ষ লাভের পথ।

জনৈক কামিল বুজুর্গ পুত্রের মৃত্যু সংবাদে শোকানুভূতির পরিবর্তে 'যেন কিছু হয়নি' ভাব প্রকাশ করেছিলেন বলে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ) তার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইবরাহীম–এর মৃত্যুতে তাঁর পবিত্র যবান থেকে এ উক্তি শ্রুত হয়েছে–

تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاَنَا بِكَ
يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ *

চোখে অশ্রু ঝরছে, হৃদয়ে ব্যথা আছে তবে মুখ থেকে তাই বের হবে যা আমাদের রবের পছন্দ। হে ইবরাহীম তোমার বিচ্ছেদে আমরা খুবই ব্যথিত।

সম্ভবতঃ মুজাদ্দিদ ছাহেব (রহঃ)–এর এ সমালোচনা মাওলানার নজরে কখনো পড়েনি। কিন্তু এক বাচ্চার মৃত্যুতে তার আব্বাকে তিনি হুবহু একই কথা লিখেছিলেন যা সুন্নাতে রাসূলের পূর্ণ ইত্তিবা এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর পূর্ণ বোধ ও জ্ঞান থেকে উৎসারিত ছিলো। তিনি লিখেছিলেন।

ইউসুফকে লেখা আপনার পত্রে 'পুত্র শোক' না হওয়ার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কিন্তু অপছন্দনীয়। শোকের ক্ষেত্রে শোক ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমার হয়ে থাকবে। তবে তার প্রকাশও জরুরী। আপনি ভালোই জানেন যে, আল্লাহ পাক যে রকম অবস্থা পাঠান তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ ও প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়।

অনুরূপভাবে একই ব্যক্তিকে তার সন্তানের জন্ম উপলক্ষে লেখা পত্রের বক্তব্য ছিলো–

এটা আল্লাহ পাকের এক বিরাট নেয়ামত। এতে আন্তরিক আনন্দ হওয়া উচিত। আন্তরিক না হলে অন্ততঃ কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

স্বভাব প্রশান্তি ও সহনশীলতা

অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা সত্ত্বেও মাওলানা খুবই সহনশীল ও সংযমী ছিলেন। রুচি ও ইচ্ছা বিরুদ্ধ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী কিছু দেখা বা শোনা তাঁর জন্য খুবই কঠিন মোজাহাদার বিষয় ছিলো। কিন্তু ব্যাপক মানব

সংস্পর্শ ও দাওয়াতভিত্তিক বিশেষ কর্ম প্রকৃতির কারণেই বিচিত্র মানুষের বিচিত্র সব 'আচরণ ও উচ্চারণ' সহ্য করার এ সংযম সাধনা দিন ও রাতের প্রতি মুহূর্তেই তাঁকে করতে হতো। স্বভাবের বর্ধিত নাযুকতা এবং উদ্দেশ্যের প্রতি চূড়ান্ত আত্মনিবেদনের কারণে শেষ সময়ে উদ্দেশ্য পরিপন্থী কিছু শোনা তাঁর বরদাশতের বাইরে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপরও এ ধরনের সংযম মোজাহাদার মাঝেই কেটেছে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো।

'বাহ্যতঃ আলিম' এক ভদ্রলোক এক সফরের সারাটা পথ অশোভন আচরণ করে গেলো। আর মাওলানা ধৈর্য ও সংযমের প্রতিচ্ছবি হয়ে সব বরদাশত করে গেলেন। শেষ পর্যায়ে বললেন, তুমি ভেবেছো আমার রাগ এতই সস্তা যে, তোমার মত অপাত্রে তা ব্যবহার করে ফেলবো? না, কিছুতেই তা হবে না।

গালাওঠি অঞ্চলের এক তাবলীগী সফরে হযরত মাওলানা মসজিদে অবস্থান করছিলেন। জামা'আত গাশত থেকে ফেরার সময় এক যুবককে সাথে নিয়ে এলো। মাওলানা মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। জামা'আতের লোকেরা তখন আরয করলো, হযরত! এ যুবক এক ওয়াক্ত নামায তো পড়েই না বরং নামায নিয়ে উপহাস করে। যুবক ভক্তি তাযীমের পরিবর্তে মাওলানার সামনেই শব্দ করে হেসে উঠলো। মাওলানা সস্নেহে তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, আল্লাহ তোমার হাসি অব্যাহত রাখুন। এরপর তিনি অত্যন্ত সরলভাবে তাকে নামাযের উপদেশ দিলেন আর সেও সংগে সংগে স্বীকার করে নিলো এবং মসজিদে দাখেল হলো।

একবার দাওয়াতের সময় এক ব্যক্তির গায়ে তিনি হাত রাখতেই সে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলো, ফের যদি গায়ে হাত দাও তবে লাঠিপেটা করে ছাড়বো। তিনি সংগে সংগে তার পায়ে হাত রেখে বললেন, গায়ে হাত দিতে নিষেধ করেছো, পায়ে তো নিষেধ করোনি। লোকটির রাগ তখন পানি, আর সে নিজে লজ্জায় একেবারে মাটি!

এক সফরে মাওলানা গরুর গাড়ীতে সওয়ার ছিলেন। বাস টার্মিনালে পৌঁছা দরকার। সময়ও হয়ে গেছে প্রায়। কিছুলোক বাস থামাতে আগেভাগে চলে গেছে। গাড়োয়ানকে শত মিনতি করে যতই বলা হয়, বাবা জোরসে চালাও;

গাড়ী ছেড়ে যাবে ততই সে খোশ মেজাজে লশকরি চালে গাড়ী চালায়। ফলে সত্যি সত্যি গাড়ী ধরা সম্ভব হলো না। কেউ তখন গাড়োয়ানকে শক্ত কথা বলে, কেউ বা ক্রোধের আতিশয্যে স্বভাববিরুদ্ধভাবে গালমন্দ করে। কিন্তু হযরত মাওলানা শুধু এতটুকু বললেন, ভাই! তখন এদের কথাটা মেনে নিলে তোমার কি ক্ষতি হতো!

চাকুরি ক্ষেত্রে কোন উপরস্থ মুসলমান অফিসারের হাতে নিগৃহীত এক ভদ্রলোক বেকারত্বের কারণে এমনই বিপর্যস্ত ছিলেন যে, মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেছিলেন। মনের এ দুরবস্থার কারণেই একবার তিনি মাওলানার সামনে এমন অসংযত ও বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা বলতে লাগলেন, যা কোন মুসলমানের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়। কিন্তু হযরত মাওলানা বললেন, ইনি এখন মা'যুর, অক্ষম। এমন সময় দু'আ অযিফার কথা বলাও ফলদায়ক হয় না। তিনি তাকে বললেন, আপনি কয়েকদিন এখানে থাকুন এবং নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। তিনি থেকে গেলেন এবং হযরত মাওলানাও তার বেশ যত্ন আপ্যায়ন ও মনোরঞ্জন করলেন। ফলে দু'এক দিনের মধ্যেই তার সেই মানসিক অবস্থা দূর হয়ে গেলো।

যাদের আন্তরিকতা ও ভালবাসায় মাওলানার আস্থা ছিলো দাওয়াতি কাজ উপলক্ষে বিভিন্ন সময় তাদের প্রতি তিনি ভীষণ রাগও করতেন। তখন তাদেরকে জারজার হয়ে কাঁদতে দেখা যেতো। কিন্তু এ কারণে তাদের আন্তরিকতায় ভাটা পড়েনি বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। মাওলানা বলতেন, আমার আল্লাহর কাছে আমি দু'আ করেছি যে, যার উপর আমি রাগ করবো তার জন্য আমার এ রাগ যেন রহমত ও কল্যাণের কারণ হয়।

অন্যের হক ও অধিকারের প্রতি লক্ষ্য

মুসলমানদের হক ও অধিকার, বিশেষতঃ পর্যায়ক্রমে আলিম, দ্বীনদার ও অভিজাত লোকদের হক ও অধিকারের প্রতি তিনি যেমন সচেতন ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্মবোধ ও সূক্ষ্মদর্শিতা এবং যে উচ্চ চিন্তা ও সৃজনশীলতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তার প্রমাণ এ গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। স্বভাবজাত অনুভব ও অনুধাবন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত নন এমন কেউ

মাওলানার সাথে কয়েকদিনও যদি চলার সুযোগ পেয়ে থাকেন তবে তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে এই শেষ জামানায় তিনি মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ইমাম ছিলেন। তাঁর জীবনাচরণ ও বাণী-বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, অন্যের হক ও অধিকারের প্রতি সচেতনতা ও শ্রদ্ধার মাঝেই নিহিত ছিলো তাঁর তাছাওউফ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অর্ধেক রহস্য এবং এটাকেই তিনি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য মনে করতেন। এক পত্রে তিনি বলেন-

পরস্পরের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণকে সবচে' ভালকাজ বলে মনে করবে। বস্তুত হাজারটা 'হক মাসআলা' রক্ষার চেষ্টার চেয়ে নিষ্ঠার সাথে এই একটি 'হক' রক্ষা করা অধিক উত্তম এবং আল্লাহ পাকের রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের কারণ।

এ সকল বিশেষ হক ও অধিকারের প্রতি অপরিসীম যত্নশীলতার পাশাপাশি জনঅধিকার ও সাধারণ মানবিক অধিকারগুলোর প্রতিও তিনি যথেষ্ট সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যে কোন মানুষের, এমনকি অমুসলমান কাফিরের পর্যন্ত হক নষ্ট করা তিনি সহ্য করতেন না এবং ঘরে ও সফরে কোথাও সাধারণ জনঅধিকার সম্পর্কে মোটেই উদাসীন হতেন না।

রেলগাড়ীতে একবার এক সফরসংগী বিনা প্রয়োজনে সিটের অতিরিক্ত জায়গা জুড়ে বসেছিলো। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, ভাই! এটা সাধারণ জনঅধিকারের বিষয়। এখানে অন্য যাত্রীর হক রয়েছে। মাগরিবের নফল পড়ার সময় এক সফরসংগী রেলগাড়ীর ভিতরে সামনে দিয়ে যাত্রীদের চলাচল বন্ধের ব্যবস্থা করলেন। হযরত মাওলানা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, এটা জনঅধিকারের বিষয়। তুমি অন্যদেরকে চলাচলে বাধা না দিয়ে 'সুতরাহ' স্থাপন করো।

একবার বাস থামিয়ে নামায পড়া হলো। কোন কোন সাথী নফলের নিয়ত করে বসলেন। তিনি বললেন, ভাই! অন্যান্য যাত্রীদের হক বেশী। খানার দাওয়াতে কোন মেহমান 'ঝোল তরকারী' খেতে থাকলে তিনি নিষেধ করে বলতেন, ভাই! এটা 'দিয়ানাত' (ধার্মিকতা)-এর পরিপন্থী। কেননা মেজবান এর অনুমতি দেননি।

কান্ধলার সফরে একবার অত্যধিক ভিড়ের কারণে তিনি সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে গেলেন। ভাবলেন, টিকেট চেকার আসলে অতিরিক্ত টিকেট কেটে নেয়া যাবে। টিকেট চেকার এসে এমন বাজে কথাবার্তা শুরু করলো যে, মাওলানার রাগ চড়ে গেলো এবং তিনি তাকে ডাঁটলেন। টিকেট কাটার পর চেকার চলে গেলে সফরসংগী মাওলানা ইনআমুল হাসান বললেন, হযরত? তার তো বলার অধিকার ছিলো। কেননা হাদীছে আছে, إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا হকদারের কড়া কথা বলার অধিকার আছে।

হযরত মাওলানা সংগে সংগে ভুল স্বীকার করে নিলেন এবং ফেরার সময় ষ্টেশন থেকে নেমে টি, টি, আই–এর কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে মাফ চেয়ে নিলেন।

বিনয় ও সদাচার

বিনয় ও সৌজন্যমূলক আচরণ বর্তমান বাজারে দুর্লভ নয়। কিন্তু যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে, সৌজন্য ও সদাচার হতে হবে ঈমান ও ইহতিসাবের ভিত্তিতে এবং শরীয়ত ও সুন্নতের অনুগত রূপে তবে সমাজে তা অবশ্যই দুর্লভ হয়ে যায়।

আখলাক ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে হযরত মাওলানার দৃষ্টিকোণ এই ছিলো যে, যতক্ষণ তা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমের নীচে না আসবে (অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নতের অনুগত না হবে) ততক্ষণ তা আখলাক বা উত্তম চরিত্র নয়। উত্তম চরিত্রের খোলস মাত্র। কয়েকবার তিনি এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) মাল্টার বন্দী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এক দাওয়াতে আমিও শরীক ছিলাম এবং হযরতের পাশে বসা ছিলাম। মেজবান দীর্ঘসময় জনৈক ইংরেজ অফিসারের সদাচার ও উত্তম চরিত্রের বড় 'বিভোর প্রশংসা' করে চললেন। মাওলানা দীর্ঘ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে শুনে গেলেন। কিন্তু তবিয়তের উপর খুব চাপ হলো। তাই নীচু স্বরে আমাকে বললেন, কাফিরেরও কি আবার চরিত্র হতে পারে?

পর্যাপ্ত হাদীছ–জ্ঞান লাভ করার পর হযরত মাওলানার খিদমতে থাকলে পরিষ্কার বোঝা যেতো যে, উত্তম চরিত্রের কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তাঁর নজরে

ছিলো এবং প্রাত্যহিক আচার আচরণ ও কথাবার্তায় সেগুলোর কি পরিমাণ রেয়ায়েত তিনি করতেন। আমি অধম হযরত মাওলানার খিদমতে অবস্থানরত আমার মাদরাসার কতিপয় ছাত্রকে একবার লিখেছিলাম, আপনারা হাদীছ পড়েছেন। এখন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখুন; উত্তম আচরণ ও উত্তম চরিত্রবিষয়ক হাদীছগুলোর উপর আমল কিভাবে করা হয়।

জনৈক বন্ধুকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন–

মুসলমান যত নিম্নশ্রেণীরই হোক না কেন তার দিকে আজমত ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকানোর 'মশ্‌ক' করো।

এ ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা এতই প্রাগ্রসর ছিলেন যে, ইতর থেকে ইতর এবং বেআমল থেকে বেআমল মুসলমানও তাঁর চোখে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলো। পরিষ্কার বোঝা যেতো যে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই মাওলানা তাকে নিজের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর দরবারে অধিক মকবুল মনে করেন। যে কোন মুসলমানের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা ঈমান ও ইসলাম–গুণের উপর নিবদ্ধ থাকতো। ফলে তার দোষের প্রত্যক্ষ অনুভূতি তার ঈমান–গুণের প্রতি শ্রদ্ধার সামনে চাপা পড়ে যেতো। এক্ষেত্রে মাওলানার পার্থক্য অনুধাবন শক্তি এতো প্রখর ছিলো যে, অতি সহজেই তিনি একজন মানুষের ভালো ও মন্দ দিকগুলো পৃথকভাবে চিহ্নিত করে ফেলতেন এবং আপন দৃষ্টি শুধু ভালোর উপর কেন্দ্রীভূত করে তার তাযীম ও সম্মান করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের পর বললেন, আমি জানি যে, ইনি এক দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের বিরাট ক্ষতি সাধন করেছেন। সে জন্য আমিও খুব ব্যথিত। কিন্তু আমি তার ইলম সম্পর্কেও অবগত এবং সেটাকেই শুধু সম্মান করেছি।

اٰتِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ (প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করো) এবং اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ (মানুষকে তাদের নিজ নিজ স্তরে রেখে আচরণ করো।) এ নীতির উপর তাঁর পূর্ণ আমল ছিলো। তাই আলিম ও জ্ঞানী গুণীদের অশেষ সম্মান করতেন এবং

مَنْ لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا *

(যে আমাদের বড়কে সম্মান করে না এবং আমাদের ছোটকে দয়া করে না সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।)

এ হাদীছের আলোকে তিনি বড়দের ইকরামের জোর তাকিদ দিতেন। তাদের মর্যাদানুযায়ী উপযুক্ত স্থানে আসন দান করতেন। সাধারণভাবে বিছানা পাতা থাকা সত্ত্বেও তাদের বসার জন্য আলাদা চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং কোন না কোন বিশেষ সৌজন্যমূলক আচরণ অবশ্যই করতেন। তাদের সামনে তিনি এত বিনয়ী হতেন যে, অপরিচিত লোকদের পক্ষে কে আসল মানুষ তা বুঝে উঠাই মুশকিল হয়ে যেতো। বাইরে থেকে বড় বড় জামা'আত আসতো। কিন্তু মাওলানা তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও লোকজ্ঞান দ্বারা আগত লোকদের মর্যাদাগত স্তর তারতম্য খুব সহজেই অনুধাবন করে ফেলতেন। কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে সেটা তাঁর আন্দাজ হয়ে যেতো। তখন প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী যথাযোগ্য আচরণ করতেন। এমন অভিযোগ করার সুযোগ খুব কম লোকেরই হতো যে, আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি এতটা যত্নবান ও সচেতন ছিলেন যে, শেষ অসুস্থতার সময় যখন মন মস্তিষ্ক দাওয়াতি চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত এবং দেহ রোগ ব্যাধি ও ক্লেশ কষ্টে বিপর্যস্ত ছিলো; এমনকি খাদ্য ও ক্ষুধার অনুভূতিও তেমন একটা বিদ্যমান ছিলো না তখনও তিনি মানুষের প্রতি যথাযোগ্য যত্ন ইকরামের ব্যাপারে উদাসীন হননি।

হাফেজ মোহাম্মদ হোসায়ন ছাহেব একজন প্রতিবন্ধী ধরনের বুজুর্গ এবং মাওলানা গাংগোহী (রহঃ)–এর অন্যতম খাদেম ছিলেন। তিনি অসুস্থতার খবর পেয়ে নিযামুদ্দীনে এসে অবস্থান করছিলেন। প্রায় এবং প্রতিদিন হুজরায় এসে দম করে যেতেন। খাটিয়ার নড়াচড়ায় মাওলানার কষ্ট হতো। তাই নামাযের পর দম করতে আসা লোকদেরকে খাটিয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হতো। তা সত্ত্বেও উক্ত বুজুর্গ হাফিজ ছাহেবকে মাওলানা নিজের খাটিয়ায় টেনে বসাতেন। মানুষ অবাক হয়ে ভাবতো; মাওলানার পাশে খাটিয়ার উপর বসতে পারা ইনি কোন বুজুর্গ?

একবার বাইরে হাউজের পাশে দস্তরখান বিছানো হলো। হাফিজ ছাহেব দস্তরখানে একটু দূরে সাধারণ জামা'আতের সাথে বসেছিলেন। মাওলানার খাটিয়া চত্বরে পাতা ছিলো। তিনি লোক মারফত শায়খুল হাদীছের নামে বার্তা

পাঠালেন যে, হাফিজ ছাহেবকে তোমার ও মাওলানা আব্দুল কাদির ছাহেবের মাঝখানে বসাও।

আমার এক প্রিয় মুরুব্বী তাশরীফ এনেছিলেন। তিনি বড় আগ্রহের সাথে মাওলানার খিদমতে কিছু কথা আরয করার সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু ভিড়ের চাপ এবং নিজের শারীরিক দুর্বলতার কারণে সম্ভব হচ্ছিলো না। বিদায়ের প্রাক্কালে আবার তিনি তাঁর আকাঙক্ষার কথা প্রকাশ করলেন। মৌলবী ইউসুফ ছাহেবের মাধ্যমে হযরত মাওলানার সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। হযরত মাওলানা তাঁর অশেষ ইকরাম করলেন এবং তাঁর হাত নিজের শরীরে বুলিয়ে অন্তরংগতা প্রকাশ করলেন।

তারপর সাদাতগণের মর্যাদা এবং দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলতে লাগলেন। আর আমার প্রিয় মুরুব্বী কাঁদতে লাগলেন। বিদায়ের সময় ছাহেবযাদা মৌলবী ইউসুফ ছাহেবকে বললেন, আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দশটাকা তাঁর খিদমতে হাদিয়া পেশ করো।

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে মাওলানা সৈয়দ তালহা ছাহেব টোংক থেকে তাশরীফ আনলেন। মাওলানা তখন তাঁর অশেষ ইকরাম করলেন। তাঁর স্ত্রীর (আমার ফুফু মারহুমার) মৃত্যুতে মর্মস্পর্শী ভাষায় সান্ত্বনা দিলেন। খাওয়ার আলাদা যত্ন ও আয়োজন করলেন। নিজ হাতে রুটি গরম করে করে দিলেন। পরদিন ভোরে হযরত সৈয়দ (আহমদ শহীদ রহঃ) এর ব্যক্তিত্ব এবং গুণ ও চরিত্র সম্পর্কে বয়ান করলেন এবং সৈয়দ পরিবারের এক সদস্যের আগমনে অশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর মেওয়াতের এক সফর হলো। মাওলানা তালহা ছাহেব সাথে ছিলেন। সকল স্থানেই তিনি তাঁর সাথে বিশেষ অন্তরংগ আচরণ করলেন।

এই বিশেষ ইকরাম ও সৌজন্য ছাড়াও তাঁর সাধারণ আচরণও এমন ছিলো যে, প্রত্যেকেই নিজের প্রতি বিশেষ অন্তরংগতা অনুভব করতো। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন

لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُ اَنَّ اَحَدًا اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ *

(কোন সহচর এমন মনে করতো না যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে অন্য কেউ তার চেয়ে প্রিয় ছিলো।) এই হাদীছের বাস্তব নমুনা। প্রত্যেকেই আপন আপন স্মৃতি স্মরণ করে বলতো, আমার সাথে তাঁর যে অন্তরংগ আচরণ ছিলো তা সম্ভবতঃ আর কারো সাথে ছিলো না।

সফরে হযরে সর্বত্র বিশিষ্ট সাথী সংগীদের সাথে সমতাপূর্ণ আচরণের পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। নিজের জন্য কোন রকম বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করতেন না। এক সফরে শোয়ার সময় সকলের খাটিয়া এমনভাবে বিছানো হলো যে, মাওলানার খাটিয়ার পায়ের দিক অন্য এক সাথীর মাথার দিকের সাথে লাগোয়া ছিলো। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, তোমরা এতদিন ধরে সাথে থাকো অথচ এখনো তোমাদের এসব জিনিসের অনুভূতি হলো না।

এক সাথী একবার চলার সময় মাওলানার জুতা হাতে উঠিয়ে নিলেন। মাওলানা জুতা ফেরত নিয়ে তার হাতে চুমু খেলেন। মেহমানদের, বিশেষতঃ তাবলীগে আগত ওলামায়ে কেরামের প্রতি যত্ন খাতির করা ছিলো তাঁর বিশেষ কর্তব্যভুক্ত। কিন্তু শত খেদমতেও যেন মন কিছুতেই তৃপ্ত হাতো না। তিনি বলতেন, হাদীছে যেখানে সাধারণ মেহমানদের ইকরাম ও খাতির যত্নের বিশেষ তাকীদ রয়েছে সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মেহমানদের হক ও মর্যাদা কত উর্ধ্বে!

মৌলবী মুঈনুল্লাহ নদভী বলেন, রমযান মাসে আমি অসুস্থ ছিলাম। এক বাচ্চা আমার খানা নিয়ে আসছিলো। মাওলানা নফলে দাঁড়াচ্ছিলেন। বাচ্চাকে বললেন, খানা রেখে যাও। আমি নিয়ে যাবো। কিন্তু বাচ্চা বুঝলো না। তাই খানা কামরায় পৌঁছে দিলো। নামাযের পর তিনি তাশরীফ এনে বললেন, বাচ্চাটাকে বলেছিলাম যে, খানা আমি নিয়ে যাবো। কিন্তু সে না বুঝে নিজেই নিয়ে এসেছে। এরপর তিনি দীর্ঘ সময় আমার পাশে বসে আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করলেন এবং মনোরঞ্জনমূলক কথাবার্তা বলে গেলেন।

কারো প্রতি ইকরাম ও বিশেষ সৌজন্য প্রকাশের পন্থাও ছিলো তাঁর অতি সূক্ষ্ম ও আকর্ষণীয়। ফলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মনে ভিন্ন অনুভূতি ও অনুযোগ সৃষ্টির অবকাশ হতো না।

একবার এক পেয়ালা চা হাতে করে দু'তালায় উঠে এলেন, বার তের

জনের নদভী–ছাত্র–জামা'আত ছিলো। অথচ চায়ের পেয়ালা ছিলো মাত্র একটা। তিনি বললেন, ভাই! আপনারা জামা'আতের একজনকে নির্বাচন করুন। এ পেয়ালা আমি তার হাতে দিবো। ছাত্ররা আমার দিকে ইংগিত করলো আর তিনিও পেয়ালা আগে বাড়িয়ে দিলেন।

লৌখনোতে শুভাগমনের সময় ষ্টেশন থেকে রওয়ানা হয়ে কায়ছারবাগে এক সবুজ ভূমিতে কিছু নফল পড়ে দু'আ করেছিলেন। নামাযের জন্য একটা রুমাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। জামাআতের অন্যান্য সাথীরা নিকটেই দাঁড়ানো ছিলো। জনাব হাফিজ ফখরুদ্দীন ছাহেবকে মাওলানা রুমালের উপর বসালেন। এরপর বললেন, ভাই! লৌখনোওয়ালাদেরও একজন প্রতিনিধি থাকা উচিত। জামা'আতে একমাত্র আমিই ছিলাম লৌখনোর মানুষ। সুতরাং ইংগিত আমার দিকেই ছিলো। আমি এতো এতো সম্মানিত লোকের উপস্থিতিতে বিশিষ্ট স্থানে বসতে দ্বিধা করছিলাম দেখে সাথে সাথে তিনি বললেন, এটা হযরত সাহারানপুরী (রহঃ)–এর রুমাল। আপনি বরকতের জন্য বসুন। ফলে আমার বসার হিম্মত হলো এবং হুকুম পালনার্থে বসে পড়লাম।

কোরায়শী ছাহেব এবং তাঁর পার্টনার মালিক ছাহেবের পীড়াপীড়ির কারণে অভ্যাসের বিরুদ্ধে এক সফরে হযরত মাওলানা দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেছিলেন। পরে তিনি বলতেন, এতে আমার খুব মানসিক কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু তারা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত কষ্ট তো হয়নি? আরাম হয়েছে তো? তিনি বলতেন, আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, যদি কষ্টের কথা বলি তবে তাদের আফসোস হবে আর যদি আরামের কথা বলি তাহলে অবাস্তব কথা হবে। তাই বললাম, আমার বসায় কি আপনাদের শান্তি হয়েছে। তারা বললেন, অবশ্যই হয়েছে। আমি বললাম, ব্যস, আপনাদের শান্তিতেই আমার শান্তি।

মাওলানার বিনয়ের অবস্থা ছিলো এই যে, প্রকৃত অর্থেই নিজেকে তিনি কোন মর্যাদার উপযুক্ত মনে করতেন না। এক শীর্ষস্থানীয় আলিম ও শায়খ হওয়ার কিংবা এত বিরাট এক জামা'আতের নিরংকুশ আনুগত্যের অধিকারী নেতা হওয়ার বিন্দুমাত্র অনুভূতিও তার অন্তরে ছিলো না।

এক পত্রে আমি অধমকে একবার তিনি লিখেছিলেন–

যদি পরামর্শ কবুল করেন তাহলে আন্তরিক আকাঙক্ষা এই যে, মামুলি নামুটুকু ছাড়া এ অপদার্থের জন্য অতিরিক্ত কোন শব্দপ্রয়োগ যেন না করা হয়। কেননা এটা মর্যাদাপূর্ণ শব্দের অমর্যাদা ছাড়া কিছু নয়।

স্বভাবের এ রূপ ও প্রকৃতি তাঁর লেখা চিঠিপত্র থেকেও পরিস্ফুট হয়। শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহম্মদ যাকারিয়া ছ্হেব বয়সে ছোট, আত্মীয়তা সূত্রে ভাতিজা ও আত্মিক সূত্রে ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দেখুন এক পত্রে তাঁকে কিভাবে সম্বোধন করেছেন।

আপনার 'সুপত্র' আমার আনন্দ লাভ ও সম্মান লাভের কারণ হয়েছে। জনাবের শুভাগমনের বিষয়ে আমার অশেষ আগ্রহ। আপনার কথামতে যদি আমি 'হযরত' হয়ে থাকি তবে তো আপনি হলেন 'হযরত–জনক'। কেননা আপনার সদয় দৃষ্টি আকৃষ্ট না হলে আমার মতো অধম অপদার্থকে কেই বা জিজ্ঞাসা করতো। হযরত (রহঃ)–এর পরে আপনিই সর্বপ্রথম দয়া ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে শায়খজীও আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন। এসবই হচ্ছে আপনাদের দান ও অবদান।

আপনার শুভাগমনের যেমন ব্যাকুল আগ্রহ পোষণ করি তেমনি ভীষণ আশংকাও বোধ করি যে, সামনে আসলে আমার কদর্যতা ও হীনতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তবে আগ্রহ এ জন্য যে, আপনাদের মতো 'মহাত্মা'দের সংস্পর্শ ও সাহচর্য দ্বারা হয়ত নিজেরও কিছু সংশোধন হয়ে যাবে।

অন্য এক চিঠিতে শায়খুল হাদীছ ছাহেবকে লিখেছেন–

রমযানুল মুবারকের 'চিত্ত তন্ময়তা' এবং এ পবিত্র মাসে নূর ও বরকতের প্রাচুর্যধারা জিন্দাদিল প্রেমিকদের জন্য মোবারক হোক। আল্লাহ পাক 'জনাব'কে অধিক তাওফিক দান করুন এবং পূর্ণ রিযা ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য করুন এবং উত্তরোত্তর সান্নিধ্য ও নৈকট্য দ্বারা আপনার হৃদয়কে সুসিক্ত রাখুন। আমাদের মতো দুর্বলদের অবস্থা আর জিজ্ঞাসা করো না। শুধু এই কামনা করি; তোমাদের মতো ধাবমান যুবকদের দু'আ ও হিম্মতের বরকতে আল্লাহ পাক এই দুর্বল ও মিসকিনেরও যেন বেড়া পার করে দেন।

چوبا حبیب نشینی و بابده پیمائ + بیاد آر حریفان باده پیمارا

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত, নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকেননি। বরং নফসের শাসন ও নেগরানির ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থেকেছেন। ভক্ত অনুরাগীদের যতই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, 'নিজ' সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আত্মশাসন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে। অন্তর্দর্শী ওলামায়ে হকের খিদমতে তাঁর প্রতি সংশোধনের সজাগ দৃষ্টি রাখার সকাতর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলতেন, আমার মধ্যে অহংকার বা আত্মতুষ্টির লেশ মাত্র যদি ধরা পড়ে তাহলে আমাকে সতর্ক করুন।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব এবং মাযাহেরুল উলুম মাদরাসার নাযিম মাওলানা হাফেজ আব্দুল লতিফ ছাহেবকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হযরত শায়খুল হাদীছ এবং হযরত মুহতারাম জনাব নাযিম ছাহেব (দামাত বারাকাতুকুম)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আশা করি কুশলেই আছেন। রামযানপূর্ব সময়ে অন্তরে একটা বিষয়ের খুবই গুরুত্ব ছিলো। কিন্তু নিজের মানবীয় ও ঈমানী দুর্বলতার কারণে তা একবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা এই যে, আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে বর্তমানে কাজের উত্তরোত্তর উন্নতি ও জনপ্রিয়তার এত ব্যাপকতা দেখে নিজের ব্যাপারে আমি খুবই শংকাগ্রস্ত। কে জানে কখন এ দুষ্ট নফস অহংকার ও আত্মতুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি আপনাদের মতো হক্কানী আলিমের কঠোর শাসন ও নেগরানির ভীষণ মুখাপেক্ষী। আপনারাও আমাকে আপনাদের সার্বক্ষণিক নেগরানির মোহতাজ মনে করবেন। কাজের কল্যাণকর বিষয়ে দৃঢ় থাকার এবং অকল্যাণকর বিষয় পরিহার করার জন্য আমাকে কঠোরভাবে তাকীদ করবেন। (২২শে রমযান ৬২ হিজরী, মোতাবিক ২৩শে সেপ্টেম্বর ৪৩ইং)

(দারুল মুছান্নিফীন আজমগড়ের গবেষণাপত্র معارف নভেম্বর ১৯৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত) হযরত মাওলানা সম্পর্কিত এক 'জীবন্তিকায়' মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী লিখেছেন–

লৌখনো অবস্থানকালে একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে বৈকালিক চা–চক্র

ছিলো। কাছে মসজিদ না থাকায় ঘরেই বা–জামা'আত আছরের নামায পড়ার ইন্তিজাম হলো। তিনি নিজেই আযান দিলেন এবং আমাকে নামায পড়াতে বললেন। আমি ওযর পেশ করলে তিনি নিজেই নামায পড়ালেন। নামাযের পর মুক্তাদিদের দিকে ফিরে বললেন, ভাই সকল! আমি এক মুছীবতে গ্রেফতার আছি। দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। এ দাওয়াতি কাজ শুরু করার পর থেকে আমার প্রতি মানুষের ভক্তি ভালবাসা শুরু হয়েছে। তাই আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমাকে না আবার আত্মতুষ্টিতে পেয়ে বসে। আমিও না আবার নিজেকে বুজুর্গ মনে করে বসি। আল্লাহর কাছে আমার সর্বক্ষণের দু'আ এই যে, এ পরীক্ষা থেকে আমাকে যেন তিনি নিরাপদে বের করে আনেন। আপনারাও এ দু'আ করুন।

জনৈক শুভার্থী একবার একটি 'কালীন' হাদিয়া পেশ করলো। এই মূল্যবান কালীন মাওলানার তবিয়তের জন্য অশ্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এ বিষয়ে তখন তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কোমল বক্তব্য রাখলেন। এরপর শহরের এক বড় আলিমের খিদমতে এই বলে তা হাদিয়া করে দিলেন যে, আমাকে আলিম মনে করে এ হাদিয়া পেশ করা হয়েছে। এখন আমি যাকে আলিম মনে করি তার খিদমতে এটাকে পৌঁছে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে চাই।

'হটো–সরো' ধরনের চাল হযরত মাওলানার খুবই ঘৃণিত ছিলো। তিনি বলতেন, 'হটো–সরো' হলো ফেরআউন ও হামানের নীতি। অনাড়ম্বর ও সহজ সরল চলা ফেরা ছিলো তার আন্তরিক পছন্দ। লোক সরিয়ে পথ করে নেওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। মেওয়াতের বিভিন্ন সফরে ও জলসায়, সমাবেশে মাওলানাই যখন হাজার হাজার মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতেন তখনও তাঁর কড়া দৃষ্টি থাকতো যাতে বিশেষ ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ আরোপিত না হয়। এমনকি অন্তিম অসুস্থতার নাযুক সময়েও এটা তার পছন্দ ছিলো না।

একেবারে শেষ দিকে যখন দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড় ও স্বাস্থ্যগত নাযুকতার কারণে মোছাফাহা করা নিষেধ ছিলো তখন একদিন এক অপরিচিত ব্যক্তি মজলিসের সকলের কাঁধ ডিংগিয়ে মোছাফাহার উদ্দেশ্যে আগে বাড়লো। এক মেওয়াতি খাদেম হাত বাড়িয়ে তাকে বাঁধা দিলো। তখন সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে আলিম ওলামা ও মোল্লা মৌলবীদের গালমন্দ করতে করতে ফিরে চললো।

হযরত মাওলানা মেওয়াতি খাদেমকে ইংগিতে কাছে ডেকে খুব তিরস্কার করে বললেন, মুসলমানের অন্তরে দুঃখ দেয়া আল্লাহর কাছে খুবই নিন্দনীয়। যাও মাফ চেয়ে তাকে খুশী করে ফিরিয়ে আনো। বেচারা মেওয়াতি তাই করলো। আমি অধমও মসজিদের বাইরে এ অবাক দৃশ্য দেখলাম। লোকটি যাচ্ছে তাই বলে গালমন্দ করে চলেছে আর বেচারা মেওয়াতি হাত জোড় করে শুধু বলছে আপনাকে দুঃখ দিয়েছি। হয় শাস্তি দিন, নয় আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন।

হৃদয়ের উদারতা

ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন থেকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন বিভিন্ন সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আছে। সকলেই এটাকে নিজস্ব বৃত্তে এমন সীমাবদ্ধ মনে করে বসে আছে যে, এর বাইরে দ্বীন ও ইলমের অস্তিত্ব কল্পনা করতেও তারা রাজি নয়। ভিন্ন মহলের কারো ইলম ও তাকওয়ার স্বীকৃতি দান অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সান্নিধ্যে এসে ঐ ধরনের চিত্তপ্রসন্নতাও লাভ হয় না যা দ্বীনদার ও সমমনা লোকদের মাঝে হওয়া উচিত।

এ ফাটল ও দূরত্ব বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, অনেকের কাছে একই মহলের ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তার দুই ব্যক্তির সাথে যুগপৎ ভক্তি ভালবাসার সম্পর্ক রক্ষা করা অসম্ভব মনে হতে লাগলো এবং এক হৃদয়ে তাদের উভয়কে একত্র করা দুই বিপরীতধর্মী বস্তুকে একত্র করার চেয়েও কঠিন মনে হতে লাগলো। এর ফল এই দাঁড়ালো যে, ভাব বিনিময় ও দ্বীনী ফায়দা গ্রহণের পরিধি ক্রমেই সংকোচিত হয়ে আসতে লাগলো। দ্বীনদার ও হকপন্থী লোকদের মাঝে অপরিচয় ও দূরত্বের এক দুর্লংঘনীয় প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেলো।

হযরত মাওলানাকে আল্লাহ পাক উদার হৃদয়ের বড় নেয়ামত দান করেছিলেন। এমন বিশাল ব্যাপ্তি ছিলো এই 'ছোট্ট' মানুষটির হৃদয়ে সেখানে যাবতীয় মতভিন্নতা ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও হকপন্থী সকল জামা'আত ও হালকার জন্য যুগপৎ সমান অবকাশ ছিলো। স্ব–স্ব ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা হিসাবে প্রত্যেকের জন্যই তাঁর হৃদয়ে ছিলো আলাদা স্থান। আরব কবির ভাষায়–

لِكُلِّ اَمْرِئٍ شِعْبٌ مِّنَ الْقَلْبِ فَارِغٌ + وَ مَوْضَعُ نَجْوٰى لَا يُرَامُ اِطِّلَاعُهَا

প্রতিজনের জন্যই হৃদয়ের গভীরে রয়েছে গোপন প্রকোষ্ঠ। একজনের অভিসার অন্য জন আঁচ পর্যন্ত করতে পারে না।

হযরত মাওলানার মতে মুসলিম উম্মাহর কোন শ্রেণী ও সদস্যই গুণ, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত নয়। প্রত্যেক শ্রেণীর বা জামা'আতেরই রয়েছে কোন না কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্য যা অন্যদের মাঝে নেই। সুতরাং পারস্পরিক গুণগ্রাহিতার মাধ্যমে প্রত্যেকেরই উচিত অপর শ্রেণীর গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো। মাওলানা তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে উম্মতের সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠীর নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্মিলিতভাবে কাজে লাগাতে চাইতেন। আর এ বিষয়ে আল্লাহ পাক তাঁকে এমন এক বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, অতি সহজে ও অতি সুচারু রূপেই তিনি তা করতে পারতেন। বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তি বা শ্রেণীকে আল্লাহ পাক বিশেষ কোন স্বভাবযোগ্যতা ও প্রতিভা কিংবা দ্বীন ও দ্বীনী মেহনতের প্রতি সহজাত অন্তরংগতা দান করেছিলেন তাদেরকে দ্বীনী কাজে যুক্ত করা এবং দ্বীনের উন্নতি অগ্রগতির সোপান হিসাবে তাদের এই সহজাত গুণ ও যোগ্যতাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

জনৈক মুবাল্লিগ সম্পর্কে এক বুজুর্গকে পরামর্শ দিয়ে মাওলানা লিখেছেন–

তালীম ও তাবলীগ উভয় ক্ষেত্রে সাদাতগণকে দ্বীনী কাজে মনোযোগী করার প্রচেষ্টা গ্রহণে তাকে উদ্যোগী করুন। আর এটা উপলব্ধি করুন এবং স্মরণ রাখুন যে, যোগ্যতায় যারা যত উর্ধ্বে তাদের মূল কেন্দ্রে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে নাযুকতা ও জটিলতাও তত অধিক।

একদিন আমি আরয করলাম, হযরত! নদওয়ার লোকেরা সবসময় দ্বীনী মহলের দিকে প্রীতি ও সম্প্রীতির হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু প্রতিউত্তরে তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত কখনই এগিয়ে আসেনি। বরং সর্বদা অপরিচয়ের দৃষ্টিতেই তাদেরকে দেখা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, আপনি আমাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে আপন করে নিয়েছেন। আমার কথায় মাওলানার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, কি বলছেন আপনি! আপনার জামা'আত

তো দ্বীনের জামা'আত। আমি তো আলীগড়ীদেরকেও ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতী নই। তাদের প্রতিও দূরত্ব ও অনন্তরংগতার আচরণ ঠিক নয়।

মাওলানার এ উদার চিন্তারই সুফল হিসাবে তাবলীগী দাওয়াতের এ কাফেলায় মাযাহেরুল উলুম সাহারানপুর, দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, জামেয়া মিল্লিয়া এবং তাদের পাশাপাশি কলেজ ভার্সিটির ছাত্র–শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার মুসলমানগণ আজ একাত্মভাবে অবস্থান করছে। সবাই সবার আপন। কারো প্রতি নেই কারো অপরিচয়বোধ। মাওলানা প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলাদা মূল্যায়ন করতেন। কারো ধার্মিকতার, কারো কুশলতার, কারো বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার; এভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতার প্রশংসা করতেন। তবে তাঁর মতে সকল স্বভাবজাত যোগ্যতাই দ্বীনী কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। অন্যত্র প্রতিভার অপচয় হতে দেখলে বড় ব্যথিত হতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ পাক যাদেরকে উত্তম মন–মানস, সতেজ মনোবল ও দুর্দমনীয় উদ্যম দান করেছেন দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বীনই হলো তাদের মনোযোগের অধিক হকদার। বস্তুতঃ তাদের মনোযোগ ও আত্মনিয়োগ দ্বারা দ্বীনের কাজ অত্যন্ত সাবলীল গতিতে ও পূর্ণ শক্তিতে অগ্রসর হতে পারে।

একজন দ্বীনদার, বিচক্ষণ ও সফল ব্যবসায়ীকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

আপনার মতো সকল বন্ধু ও শ্রদ্ধেয়গণের কাছে আমি এ প্রত্যাশাই করি যে, আপনারা আমার সাহায্যকারী ও মদদগার হবেন। বরং এমন পৌরুষদীপ্ত সাহস নিয়ে এ কাজে শামিল হবেন যেন আপনারাই হলেন এর মূলপ্রাণ। কেননা আপনাদের সাহস ও মনোবল, আপনাদের স্বভাব ও শক্তি এবং আপনাদের দেমাগ ও চিন্তা অবশ্যই একটি জীবন্ত আন্দোলনকে বহন করার যোগ্যতা ধারণ করে। আর 'জীবন্ত' কাজের জন্য 'জীবন্ত' মানুষই তো যোগ্য। উম্মতের সকল শ্রেণী, গোষ্ঠী ও জামা'আত সম্পর্কে এ–ই ছিলো মাওলানার চিন্তাধারা।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বিভিন্ন রূহানী সিলসিলা এবং পীর মাশায়েখের অনুসারী ভক্ত মুরীদদের ক্ষেত্রেও তাঁর চিত্ত–ঔদার্যের একই অবস্থা ছিলো। কোন সিলসিলার কোন শায়খের অনুসারীরা এ কাজের প্রতি

মনোযোগী হলে তিনি অশেষ খুশী হতেন এবং তাদের খুব ইকরাম করতেন। কোন এক সময় আমি মুজাদ্দেদী তারীকার এবং হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব (রহঃ)–এর সিলসিলার একদল অনুসারীকে মাওলানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাদের পেয়ে তিনি খুবই পুলকিত হলেন এবং অশেষ ইকরাম করে বললেন, আমি তো শৈশব থেকেই আপন বুজুর্গানের মুখে শুনে আসছি যে, বর্তমান যুগে দু'জন কুতুব ছিলেন। পশ্চিমে হযরত গংগোহী (রহঃ) এবং পূর্বে হযরত মাওলানা ফযলে রহমান। তিনি আরো বললেন, আমার বড় আকাঙক্ষা এই যে, মাওলানার অনুসারী ও ভক্ত মুরীদান এ কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হবেন। একবার মাওলানা ফযলে রহমান ছাহেব (রহঃ)–এর সিলসিলাভুক্ত এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব (যিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁর দ্বীনী ও ইলমী যোগ্যতার উপর পার্থিব শান শওকতের আচ্ছাদন পড়ে ছিলো।) তাঁর সম্পর্কে বললেন, "আমি তাকে আল্লাহওয়ালা মনে করি। অতঃপর এ কাজে তাঁকে মনোযোগী করার জন্য বারবার তিনি আমাকে তাকিদ দিলেন।

প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট সমসাময়িকদের সম্পর্কে যখন কোন মন্তব্য করতেন তখন তার উচ্চমার্গীয় বৈদগ্ধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতো।

এই চিত্ত–ঔদার্য ও উদার দৃষ্টির কারণেই এমন এমন লোকদের থেকে তিনি কাজ নিতে পেরেছিলেন এবং দ্বীনী মহলের সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাদের সম্পর্কে এটাই ছিলো সাধারণ সিদ্ধান্ত যে, এ কাজের সাথে তাদের কোন মুনাসাবাত নেই এবং দ্বীনের নিকট সান্নিধ্যে আসা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। প্রায়শঃ এমন মজার দৃশ্য দেখা যেতো যে, যাদের সম্পর্কে দ্বীনী কাজের অনুপযুক্ত বলে রায় দেয়া হতো অল্প দিনের ব্যবধানে তারাই বড় কাজের মানুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করতো। সবার কাছে একই পর্যায়ের এবং একই পরিমাণের কাজ ও মেহনত তিনি দাবী করতেন না। বরং প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থা ও যোগ্যতা হিসাবে দ্বীনী নোছরতের কাজে নিযুক্ত করতেন এবং তার সামান্য কাজেও অতটুকুই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যতটা করতেন

অন্যদের অসাধারণ মেহনত ও খেদমতের ক্ষেত্রে। মুক্ত মনে, উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার কাজের স্বীকৃতি দিতেন এবং উচ্চ মূল্যায়নের মাধ্যমে তাকে উৎসাহ দিতেন এবং কাজে আরো সক্রিয় হতে সাহস যোগাতেন।

এমন এক যুগে যখন দুনিয়াতে স্থৈর্য ও অবিচলতার চেয়ে দুর্লভ কোন গুণ নেই, সে সময় মাওলানা তাঁর স্থৈর্য ও অবিচলতা দ্বারা পূর্বসূরী মহান আকাবিরগণের গৌরবময় স্মৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। ছোট ছোট সুন্নতের ব্যাপারেও তিনি এমন অবিচল ও নিষ্ঠাবান ছিলেন যা এ যুগের মানুষ ফরয ওয়াজিবের ক্ষেত্রেও যদি প্রদর্শন করে তবে তা হবে কৃতজ্ঞতার বিষয়।

অন্তিম অসুস্থতার নাযুক সময়কালটা হচ্ছে তাঁর সারা জীবনের অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অবিচলতার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ। অসুস্থতার পূর্ণ ছয় মাস (যখন শরীর স্বাস্থ্য ছিলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্থ এবং দুর্বলতা ছিলো এতো বেশী যে, ঠোঁটে কান রেখেও আওয়াজ শোনা মুশকিল ছিলো তখনও নামায ও জামা'আতের এমন ইহতিমাম ছিলো যে, অসুস্থতার সমগ্র সময়কালে সম্ভবতঃ কোন নামাযই জামা'আত ছাড়া পড়েননি। শেষ এশার নামাযের মধ্যে ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু তারপরেও হুজরায় ছোট জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেছেন। ওয়াফাতের প্রায় দু' মাস পূর্ব থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যেতো যে, নিজের শক্তিতে উঠাবসার সামর্থ্যটুকুও ছিলো না। দু'জন মানুষ ধরে এনে জামা'আতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতো। এরপর ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলামাত্র এমন শক্তি এসে যেতো যে, রুকু সিজদা ও ফজরের নামাযের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কেয়াম পূর্ণ স্থৈর্য ও প্রশান্তির সাথে আদায় করতেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের সালাম ফেরানোর সংগে সংগে যেন সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে যেতো। ফলে নিজে থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারতেন না। আগের মতো আবার দু'জন মানুষের সাহায্যে স্বস্থানে ফিরে আসতেন। নফল ও সুন্নতের ক্ষেত্রে একজন খাদেম রুকু সিজদা করিয়ে দিতো। কিন্তু বিতিরের নিয়ত করার পর একক ভাবেই রুকু সিজদা করতেন, কারো সাহায্য কবুল করতেন না। দাঁড়ানোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ মাযুর হয়ে যাওয়ার পর বসে জামা'আতের সাথে নামায পড়তেন। চিকিৎসক ও ওলামায়ে কেরামের শক্ত নিষেধ না থাকলে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সাহস ছিলো তাঁর। কেউ বাধা না

দিলে অবশ্যই তিনি তা করতেন। বসা নামাযেও যখন ভীষণ ক্লান্তি ও দুর্বলতা হতে লাগলো তখন শুয়ে শুয়ে নামায পড়া আরম্ভ করলেন। খাটিয়া কাতারের সাথে লাগিয়ে দেয়া হতো আর তিনি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতেন। তবে সারা জীবনের মতো অযু মেসওয়াকের একই রকম গুরুত্ব ছিলো। তখনও আদাব মুস্তাহাব ও মাসনূন দু'আ যিকিরসহ অযু করতেন। ওলামা ও মেওয়াতিদের এক জামা'আত এ খিদমতের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। তারা পূর্ণ ইহতিমামের সাথে মাওলানাকে অযু করাতেন। পানি ব্যবহার যখন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো তখন ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া ও চিকি-ৎসকদের তাকিদের ভিত্তিতে তায়াম্মুম শুরু করলেন। তবে সহজতাবিমুখ বা সহজিয়া মনোভাবের তাতে কোন দখল ছিলো না। বরং যথাস্থানে আল্লাহ প্রদত্ত রোখসতের উপর আমল করাও আযীমত বা শীর্ষস্তরীয় আমলের অন্তর্ভুক্ত এবং তা প্রত্যাখ্যান করা নেয়ামতের প্রতি অবহেলার শামিল– এ মনোভাব নিয়ে তিনি তায়াম্মুম করতেন।

সফর–হযর সর্বাবস্থায় আযান, ইকামত ও জামা'আতের পূর্ণ ইহতিমাম ছিলো। এ সময়কালে রেল, বাস ও গাড়ীতে বারবার তাঁর সফরসংগী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কখনো আযান, ইকামাত ও জামা'আত ছাড়া নামায হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। রেলগাড়ীতে যত ভিড়ই হোক তিনি আযান দিতেন, ইকামত বলতেন এবং জামা'আতের সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন।

আযান শোনামাত্র মানুষ জায়গা করে দিতো। আর মাওলানা তার সফর সংগীদেরকে নিয়ম মতো দাঁড় করিয়ে নামায আদায় করতেন।

একবার আমি এক সফর থেকে ফেরার পর দেখা হতেই হযরত মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন, নামায পড়েছেন? আরয করলাম, আমি তো পড়েছি। কিন্তু রেলগাড়ীতে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে আমার সফরসংগীর পড়া হয়নি। এখন পড়ছেন। তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং প্রসংগক্রমে বললেন, যখন থেকে একাজে লেগেছি (প্রায় বিশবছর) তখন থেকে রেলগাড়ীতে কোন নামায জামা'আত ছাড়া পড়িনি। এমনকি আল্লাহ পাক আপন অনুগ্রহে তারাবীহও পড়িয়েছেন। যদিও কখনো কখনো তারাবীহ মাত্র দু'রাকাত পড়ার সুযোগ

হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি তরক হয়নি।

'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের' ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা বিশেষ কিছু মূলনীতি ও পর্যায়ক্রম–এর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী কাজের ক্ষেত্রে কোন প্রকার রেয়ায়েত ও শৈথিল্য মোটেই বরদাশত করতেন না। فَإِذَا تَعَدَّى الْحَقَّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ (যখন হকবিরোধী কোন কিছু হতো তখন কোন কিছু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধকে নিবৃত্ত করতে পারতো না)। এ হাদীছের উপর ছিলো তাঁর পূর্ণ আমল।

এমন অবিচল ও নিরাপোস ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তখন তিনি ঘটাতেন এবং তাকওয়া ও ধার্মিকতার এমন নমুনা পেশ করতেন যা ছিলো তাঁর মহান পূর্ববর্তী আকাবির, মাশায়েখ ও ওলামায়ে হকের জীবন বৈশিষ্ট্য।

৫৭ হিজরীর শেষ হজ্বে করাচীতে দুই জাহাজের মাঝে প্রতিযোগিতা বেঁধে গেলো। একটি জাহাজের কর্তৃপক্ষ তখন টিকেটের মূল্য হ্রাস করে পঞ্চান্ন টাকা নির্ধারণ করলো। এ জাহাজের যাত্রীদেরকে মহিলা ডাক্তার টিকা দিচ্ছিলো। মাওলানা সক্রোধে বললেন, হারামে লিপ্ত হয়ে ফরয আদায় করতে চলেছো! আমি তো নামাহরাম স্ত্রীলোকের হাতে টিকা লাগাতে পারি না। সকলে অনুরোধ করলো যে, টিকা লাগিয়ে তাড়াতাড়ি জাহাজে আসন গ্রহণ না করলে ৫৫ টাকার টিকেট ১৮২ টাকা হয়ে যাবে। কিন্তু মাওলানা তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে বললেন, যা হয় হোক। মোটকথা, মাওলানা অস্বীকার করার ফলে কাফেলা থেমে গেলো। ফোনের পর ফোন করা হলো। ডাক্তার গজরাতে গজরাতে এসে বললেন, কোথায় সেই পীর সাহেব যিনি লেডি ডাক্তারের হাতে টিকা লাগাতে চান না। মাওলানা ও তাঁর সফরসংগীরা পুরুষ ডাক্তারের হাতেই টিকা লাগালেন এবং টিকেটও পঞ্চান্ন টাকায় পাওয়া গেলো। মাওলানা বললেন, আজ পর্যন্ত কোন নামাহরাম স্ত্রী লোক আমার শরীর স্পর্শ করেনি। শুধু একবার অসুস্থ এক স্ত্রী লোককে দেখতে গিয়েছিলাম। মৃত্যু যন্ত্রণার মতো অবস্থা ছিলো। সে আমার হাতে হাত রাখতে চাইলো; আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। তখন আংগুলের অগ্রভাগের ছোঁয়া লেগেছিলো মাত্র।[১]

১। হজ্জের সফরসংগী মৌলবী নূর মোহম্মদ ছাহেবের সূত্রে।

দু'আ ও মুনাজাত নিমগ্নতা

সমর্পিত চিত্তে আল্লাহর দরবারে আহাজারি, রোনাজারি ও দু'আ মুনাজাতই ছিলো হযরত মাওলানার যিন্দেগীর সঞ্জীবনী শক্তি। তাঁর মতে তাঁর দাওয়াতি আন্দোলনের এটাই ছিলো মূল প্রাণ। একবার তিনি বললেন, আমাদের এ আন্দোলনের সঠিক তারতীব এই যে, এখানে দিল ও হৃদয়ের ভূমিকাই হবে প্রধান। (অর্থাৎ আল্লাহর সামনে বিনয় কাতরতা প্রকাশ করা, তাঁর সাহায্যের উপর পরিপূর্ণ ভরসা করা, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে তাঁরই সমীপে আত্মনিবেদন করা– এগুলোই হবে আসল কাজ।) এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে অংগ প্রত্যংগের আমল (অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয় সমূহের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে দৌড়ঝাঁপ ও চেষ্টা মেহনত করা)। তৃতীয় পর্যায়ে হলো মুখের কাজ। (অর্থাৎ বয়ান বক্তৃতার পরিমাণ হবে সবচে' কম। এর চেয়ে বেশী পরিমাণে হবে চেষ্টা তদবীর আর সবচে' বেশী পরিমাণে হবে দিলের কাজ। অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে আহাজারি ও রোনাজারি

এ মূলনীতির উপরই ছিলো মাওলানার আমল। অন্যদেরকেও তিনি একই আদেশ উপদেশ দিতেন। এক পত্রে অধমকে তিনি লিখেছিলেন–

একথা সব সময় যেন দৃষ্টিপথে থাকে, কখনো যেন ভুলে যাওয়া না হয় যে, শুধু দু'আর 'প্রাণশক্তি' বৃদ্ধি করাই হলো দ্বীনের প্রতিটি জিনিসের আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং এ বিষয়ে সর্বক্ষণ সর্বাত্মক মেহনত চালাতে হবে। অংগ প্রত্যংগ কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় হৃদয় যদি দৃঢ়ভাবে দু'আ মুনাজাতে নিমগ্ন থাকা বরদাশত করতে পারে-তাহলে তাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আর তা সম্ভব না হলে ফরজ নামায পরবর্তী সময়গুলো, শেষ রাতের নির্জন মুহূর্তগুলো এবং তাবলীগী সফরের অবসর সময়গুলো দু'আ মুনাজাত দ্বারা আবাদ করুন।

আম্বিয়ায়ে কেরামের নিয়াবত ও প্রতিনিধিত্বমূলক এই সুমহান ও সংবেদনশীল দায়িত্বের কারণে মাওলানা তবিয়তের উপর অত্যন্ত গুরুভার অনুভব করতেন। তাই তিনি কাজ ও দায়িত্বের হিফাজত ও কামিয়াবির জন্য জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহওয়ালাদের খিদমতে ব্যাকুল চিত্তে দু'আর

আবেদন জানাতেন এবং এটাকেই তিনি সবচে' কার্যকর তদবীর মনে করতেন। শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবকে লিখেছেন–

শাবান মাসের প্রত্যেক জুমায় মেওয়াত যাওয়া হয়েছে। আমার মাথায় যে চিন্তা এসেছে তা আমার অবস্থান ও যোগ্যতার বহু উর্ধ্বে। এর বাস্তবায়ন তো দূরের কথা বোধ ও বুদ্ধির নাগালে আনাও সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমার তবিয়ত কিন্তু এ ব্যাপারে চেষ্টা তদবীর ও চিন্তা ফিকির হতে বিরত থাকছে না। সুতরাং প্রকৃতভাবে এ কাজ অতি সাধ্যাতীত ও অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণে এবং অতি নাযুক ও সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে, সর্বোপরি দ্বীনের প্রচার প্রসার ও উন্নতি অগ্রগতির একমাত্র উপায় হওয়ার কারণে আপনাদের মতো 'মহান'দের উদ্যম, মনোযোগ ও দু'আ লাভের অধিক হকদার। তাই সামগ্রিক দু'আ মুনাজাত দ্বারা আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আপনার তরফে যেন কার্পণ্য না হয়। আল্লাহর দরবারে যে কোন প্রার্থিত বিষয় লাভ করা কঠিন নয়। আপনি শুধু সাহস ও হিম্মত এবং একাগ্রতা ও আত্মনিবেদনের সাথে যথাসম্ভব ত্রুটিহীনভাবে দু'আ করে যান। আমার দিলের আকাঙক্ষা এই যে, কমপক্ষে আমার দিল দেমাগ, চিন্তা ভাবনা, সময় ও শক্তি এ কাজ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে যেন মুক্ত থাকে। যাক, বেশী আর কি লিখবো; খোলাসা কথা এই যে, আপনিও দু'আ দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন। সকল বুজুর্গানের খিদমতেও একই প্রার্থনা। তাঁদের দ্বারা দু'আ করানো এবং তাঁদের উদ্যম ও মনোযোগ আকৃষ্ট করার ব্যাপারে আপনি মাধ্যম ও সুপারিশকারী হিসাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

হযরত শায়খের নামেই অন্য এক পত্রে তিনি লিখেছেন,

আমার প্রিয়! দাওয়াত ও তাবলীগের গুরু দায়িত্বভারে নিজেকে ভারাক্রান্ত মনে করে অনন্যোপায় অবস্থায় আপনার খিদমতে দু'আর ভিখারী হয়ে এ চিঠি লিখছি–

আমার প্রিয়! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার সার্বিক উদ্যম, অনুপ্রেরণা ও অংশগ্রহণ এ কাজের অগ্রগতির কারণ। আল্লাহ পাক দাওয়াত ও তাবলীগের নামে অশেষ উপকারী, ইসলামের মূলনীতি কেন্দ্রিক ও সহজ পালনীয় যে সুমহান রূপরেখা এ অধমকে দান করেছেন, এ বিরাট নেয়ামতের

যথাযোগ্য কদর করা এবং সকৃতজ্ঞচিত্তে তার খিদমত করার ব্যাপারে নিজের অযোগ্যতা ও দুর্বলতা অনুভব করে খুবই শংকিত আছি, যেন নেয়ামতের বেকদরি ও অমর্যাদা না হয়ে যায়। সেই সাথে আপনার সৎসাহসের কথা স্বীকার করাও জরুরী মনে করছি যে, অধম বান্দার জীবনে বর্তমান তাবলীগের মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আপনার ছোহবত ও সংস্পর্শের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাকে আপনার শোকর আদায়ের তাওফিক দান করুন। আল্লাহর যদি মঞ্জুর হয়– যেমন তার আভাস আলামত দেখা যাচ্ছে– তাহলে এই তাবলীগী কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ আপনার লেখা ও ফয়য–বরকত শুধু হিন্দুস্তানকেই নয়, গোটা আরব আজমকেই আপ্লুত করবে। আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এ কাজে দু'আ দ্বারা অবশ্যই আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমিও দু'আ করছি।

তৃতীয় এক পত্রে হযরত শায়খকে তিনি লিখেছেন, বর্তমান নাযুক সময়ে মানুষের অন্তর থেকে নির্বাসিত, কদর ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত এবং সকলের চোখের অবজ্ঞার পাত্র এ দ্বীনের কোন আওয়াজ কারো কানে প্রবেশের এবং কারো অন্তরে বিন্দু পরিমাণ রেখাপাতের আশা পোষণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; যেমন অসম্ভব অবয়বহীন বাতাসকে হাতের তালুতে বন্দী করা। দ্বীনের প্রয়োজন যতই অপরিহার্য হোক বর্তমানে তার অসম্ভবতাও সমান্তরালে দেখা যাচ্ছে। অর্থহীন চিন্তা ভাবনা ও খেয়াল খুশিতে জীবন কাটিয়ে দেয়া খুব পছন্দীয় ও আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। অথচ সামান্য থেকে সামান্য সময় পূর্ববর্তী আকাবিরগণের তরীকায় কাটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও হাজারো অসুবিধা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সেই সাথে নিজের ভিতরে আবেগ ও হিম্মতের দুর্বলতা, নিজের অক্ষমতা এবং আকল ও বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন পদক্ষেপ গ্রহণেও আমাকে নিরুৎসাহিত করছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের সুমহান আদেশ ও ফরমানের সত্যতা এবং তাঁর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির গুরুত্বের অনুভূতি বসে থাকতেও দিচ্ছে না। দু' দিকের এ টানা পড়েনে দুর্বল তবিয়ত নিস্তেজ ও দিশেহারা হয়ে থাকে। বুঝে উঠতে পারি না যে, এ নাযুক ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে। আমার এ পত্র লেখার উদ্দেশ্য এই যে, আপনার মতো জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী, উদ্যমী ও সাহসী মানুষগণ অবস্থার নাযুকতা হিসাবে নিজ নিজ সাধ্যপরিমাণ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনয়কাতরতা ও রোনাজারির

হাত তুলে দু'আয় রত থাকুন এবং অন্যান্য বন্ধুদেরকেও বলুন যে, এ কাজ বর্তমান যুগে আমাদের মত লোকদের সাধ্য ও সামর্থ্যের বহু উর্ধ্বে। আবার ছেড়ে দেয়া কিংবা অবহেলা করাও ভয়াবহ বিপদের কারণ। অথচ কদম উঠানোরও শক্তি নেই। সুতরাং আল্লাহই বড় সহায়।

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে (আর মাওলানার দৃষ্টিতে প্রতিটি তাবলীগী ক্ষেত্রই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো) নিজেও দু'আ মুনাজাতে আত্মনিয়োগ করতেন। আবার দু'আর উপযুক্ত লোকদেরকেও বড় ব্যাকুলতার সাথে দু'আ মুনাজাতের তাকীদ করতেন।

৩৯ সনের বিশে জানুয়ারী শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবকে তিনি লিখছেন–

এ শুক্রবারে উভয় প্রান্তের মেওয়াতিদের মাঝে বিশেষভাবে তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে পাহাড়গঞ্জের জামা'আতগুলোর উদ্যোগে জলসা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ এই যে, জলসার প্রথম রাত্রে মাওলানা হুসাইন আহমদ ছাহেবকে মুবাল্লিগ সাব্যস্ত করা হলো। আল্লাহ জানেন এ উদ্দেশ্যে তাঁর শুভাগমন প্রথম ও অভূতপূর্ব হওয়ার কারণে কেন জানি আমার দিলে গভীর প্রভাব ফেলছে। এ কারণেই ভিখারী সেজে আপনার দরবারে মিনতি করছি, এ জলসার বক্তা ও শ্রোতা সকলের জন্য বিনয়কাতরতার সাথে আল্লাহর দরবারে দু'আয় মগ্ন থাকুন, যেন হৃদয়ের অখণ্ড প্রশান্তি ও অটলতার সাথে একাজে জমে থাকার, চূড়ান্তরূপে জমে থাকার তাওফিক হয় এবং কাজের প্রচার প্রসার হয়। একাজের জন্য আপনি আপনার পূর্ণ হিম্মত ও উদ্যম ব্যয় করুন। এছাড়া যাকে আপনার ভালো মনে হয় এবং সুযোগ হয় তাকেও কাজের কামিয়াবির জন্য দু'আ ও মেহনতে লাগিয়ে রাখুন। এছাড়া কাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও সুপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন বাহ্যিক ব্যবস্থা ও তদবীর আপনার চিন্তায় এসে থাকলে সে আলোকেও চেষ্টা করুন।

হযরত মাওলানা খুব দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার ভাব নিয়ে দু'আ করতেন। দু'আরত অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেমন একটা আত্মসমাহিত ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। তখন তাঁর হৃদয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব ও ভাবনা উদ্ভাসিত হতো এবং দরদভেজা শব্দের সাহায্যে তাঁর প্রকাশ

ঘটতো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে বিশেষতঃ মেওয়াতের সফরগুলোতে বড় ভাবপূর্ণ দু'আ করতেন। সাধারণতঃ সেটাই আলাদা এক বয়ান হয়ে যেতো। মন ভরে তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন। চাওয়ার সময় নিজের দিক থেকে কম চাইতেন না। "চেয়ে নাও আল্লাহর কাছ থেকে" বয়ানের মাঝে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিসৃত এ ছোট্ট কথাটা এখনো যেন অনেকের কানে বাজে।

সাধারণভাবে সব সময় (এবং বিশেষভাবে দাওয়াতি কাজের সময়) মাছনূন দু'আগুলোর মধ্যে এ সকল দু'আ তাঁর মুখে চালু থাকতো।

اَللّٰهُمَّ اِن قُلُوْبَنَا وَ نَوَاصِيْنَا وَ جَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاِذَا فَعَلْتَ
ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَ اهْدِنَا اِلٰى سَوَآءِ السَّبِيْلِ *

হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়, আমাদের কপালের ঝুটি এবং আমাদের যাবতীয় অংগ প্রত্যংগ সবকিছু তো আপনারই হাতে। সেগুলোর কোন কিছুই তো আমাদের নিয়ন্ত্রণে দেননি। এমনই যখন করেছেন তখন আপনিই আমাদের অভিভাবক হয়ে যান এবং আমাদেরকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করুন।

اَللّٰهُمَّ اصْنَعْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَ لَا تَصْنَعْ بِنَا مَا نَحْنُ اَهْلُهٗ

হে আল্লাহ! আমাদের সাথে আপনি সেই আচরণ করুন যা আপনার উপযুক্ত। সে আচরণ নয় যা আমাদের উপযুক্ত।

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَّ اَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ *

হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেন সেটাই সহজ। আর আপনি তো যখন ইচ্ছা করেন কঠিনকেও সহজ করে দেন। সহনশীল ও দয়াশীল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

নিম্নোক্ত দু'আটি তো কিছুক্ষণ পর পর সব সময়ই মুখে জারী থাকতো।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهٗ وَ لَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ

طَرْفَةَ عَيْنٍ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ تَكِلْنِيْ اِلٰى ضَعْفٍ وَّ عَوْرَةٍ وَّ ذَنْبٍ
وَّ خَطِيْئَةٍ اَنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ *

হে চিরঞ্জীব! হে চির ব্যবস্থাপক! তোমার রহমতের কাছেই আমাদের ফরিয়াদ। আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। মুহূর্তের জন্য আমাকে আমার নফসের হাওয়ালা করো না। কেননা তুমি যদি আমাকে আমার নফসের হাওয়ালা কর তাহলে দুর্বলতা, কলংক, পাপ ও অপরাধের হাওয়ালা করবে। তুমি ছাড়া কেউ পাপ মোচন করতে পারে না।

তাবলীগী সফরের সময় সফরের যাবতীয় মাছনূন দু'আ ও যিকিরের পাবন্দি করতেন এবং বেশী বেশী যিকির করতেন। কিছু লোককে স্বতন্ত্রভাবে দু'আ ও সুরা ইয়াসীন খতমে নিযুক্ত করতেন। তখন অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্ততা এবং আল্লাহর সমীপে আত্মনিবেদনের অপার্থিব একটা ভাব ও অবস্থা বিরাজ করতো, যেন তিনি জিহাদের সফরে আছেন আর অবস্থাটা যেন এই–

যখন তোমরা কোন শত্রুদলের মুখোমুখি হও তখন অটল থাকবে এবং বেশী বেশী যিকির করবে, তবেই সফলকাম হবে।

আল্লাহর সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক, আল্লাহর প্রতি সমর্পিতচিত্ততা এবং আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরতার ফল এই ছিলো যে, সকল বিষয়ে আল্লাহরই উপর পরিপূর্ণ ভরসা হতো এবং বড় থেকে বড় ও কঠিন থেকে কঠিন কাজের ক্ষেত্রেও নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিলো যে, তা হতে পারে। একদিন তিনি তার এক প্রিয় সহকর্মীকে বললেন, উম্মতের সংশোধনের ক্ষেত্রে এই মক্তব মাদরাসার মেহনতের উপরই যদি তোমার ভরসা হয় তাহলে মেওয়াতে এক হাজার মক্তবের রূপরেখা তৈরী করো এবং নিজ জিম্মাদারীতে এ কাজ আগে বাড়াও। তুমি এ কাজের জন্য তৈয়ার হলে তোমার সম্মতি পাওয়ার দুদিনের মধ্যে এক হাজার মক্তবের এক বছরের পুরো ব্যয় (ছয় লাখ টাকা) তোমার হাতে তুলে দিবো। তবে শর্ত এই যে, আমি আমার সময় ও চিন্তা একাজে মোটেই ব্যয় করবো না। সমস্ত যিম্মাদারী তোমাকেই শামাল দিতে হবে। আমি এখনকার মতই আমার আসল কাজে লেগে থাকবো। এরপর তিনি

বললেন, তুমি জানো যে, আমার কাছে ছয় টাকাও হয়ত এখন নেই। কিন্তু আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, যখন আল্লাহর দ্বীনের কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে যাবে তখন প্রয়োজনীয় অর্থ আল্লাহ পাক একদিনেই ব্যবস্থা করে দিবেন।

একদিন চাঁদা দিতে আগ্রহী জনৈক ব্যক্তিকে তিনি পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতার সাথে বললেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের কাজ করি তাহলে আল্লাহ পাক এ ভবনকে (নিযামুদ্দীন মাদরাসার ছাত্রাবাসের দিকে ইংগিত করে) সোনা চাঁদি দ্বারা বানিয়ে দিবেন।

সফরের ক্লান্তিতে যতই তিনি ভেংগে পড়ুন না কেন, নফল নামাযে দাঁড়ালে দেহ মন হঠাৎ করেই সজীব সতেজ হয়ে উঠতো। তিনি বলতেন, নামাযে আমার ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়। প্রায়ই এমন ঘটেছে যে, পাহাড় ভেংগে চূড়ায় উঠেছেন। সংগী সাথীরা নিস্তেজ হয়ে বিশ্রামের জন্য ঢলে পড়েছে। অথচ মাওলানা নিয়ত বেঁধে নফল শুরু করে দিয়েছেন। সারা রাতের ঘুম জাগা এবং সারা দিনের ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষটিকে মাগরিবের পরে দেখুন; কেমন স্থির ও নিবিষ্ট চিত্তে আওয়াবীন পড়ছেন। এমন সতেজভাবে কয়েক পারা করে কোরআন তিলাওয়াত করে চলেছেন যেন একেবারে তাজাদম মানুষ তিনি।

অষ্টম অধ্যায়

মাওলানার দাওয়াতের চিন্তাগত পটভূমি, মূলনীতি এবং ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ

উম্মতের ঈমান–একীনের অধঃপতনের অনুভূতি

যে পবিত্র ধর্মীয় পরিবেশে মাওলানা মোহাম্মদ ইলয়াস (রহঃ)–এর জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে তার বিশেষ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আবহ ও পরিমণ্ডলের কারণে এ কথা অনুভব করা কষ্টকরই ছিলো যে, ঈমান–একীনের দৌলত খুব দ্রুত মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং দ্বীনের কদর ও তলব থেকে মুসলমানদের দিল দেখতে দেখতে খালি হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু ঐ পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে শুধু বিশিষ্ট দ্বীনদার লোকদের সংস্পর্শেই থাকা হতো যাদের অন্তরে রয়েছে দ্বীনের তলব ও তড়প এবং চোখে মুখে রয়েছে দ্বীনের চিন্তা ফিকিরের ছাপ সেহেতু সাধারণ মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান ধর্মবিমুখতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধহীনতা, এমনকি ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্যবোধ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভব না থাকাটা অস্বাভাবিক ছিলো না। ঐ পরিবেশে থেকে বরং এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো যে, মুসলমানদের যিন্দেগী মক্কী দাওয়াত ও তাবলীগের স্তর পার হয়ে গেছে এবং দ্বীনের প্রাথমিক চেষ্টা মেহনতের পর্যায় অতিক্রম করে ফেলেছে। এখন শুধু মাদানী যিন্দেগীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। সুতরাং ঐ পরিবেশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় দ্বীনী মক্তব–মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, হাদীছ কোরআনের প্রচার প্রসার, লেখনী চালনা ও গ্রন্থ রচনা, বিদআত প্রতিরোধ, ফতোয়া জারি, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাহাছ বিতর্কে যোগদান এবং আধ্যাত্মিক তারবিয়াত ও সংশোধন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ ছাড়া অন্য কোন অভিমুখে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হওয়া খুবই মুশকিল ছিলো। ঐ পরিবেশের মানুষের চিন্তা ও কাজের প্রকৃতি এরকম ছিলো যেন, জমিন তো চাষোপযোগী হয়েই আছে। এখন শুধু বীজ বপন ও চারা

রোপণ করাই বাকি। ঐ পরিবেশ পরিমণ্ডলের বিচারে এ ধরনের চিন্তা ভুল বা অমূলকও ছিলো না। কেননা ঐ সীমিত পরিসরে বুজুর্গানে দ্বীনের বহু শতাব্দীর চেষ্টা মেহনতের বরকতে জমিন অবশ্যই উর্বর হয়ে উঠেছিলো এবং দ্বীনের বাগিচাও সবুজ সজীব ছিলো।

এই বিশেষ পরিবেশ পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক দাবী এই ছিলো যে, মাওলানা মোহাম্মদ ইলয়াস (রহঃ)ও দ্বীনী খিদমতের উপরোক্ত শাখাগুলোর কোন একটিতে আত্মনিয়োগ করবেন এবং আল্লাহর দেয়া যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তাতে যথাযথ পূর্ণতা ও বিরল কৃতিত্ব অর্জন করবেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের এ জটিল সময়ে আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষভাবে পথ প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর অর্ন্তদৃষ্টির সামনে এ সত্য উদ্ভাসিত করে দিলেন যে, যে পূঁজি ও সম্পদের ভরসায় এতো সব উদ্যোগ আয়োজন, এতো সব জমা খরচ সে সম্পদই আজ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যে মাটিতে শিকড় বিছিয়ে দ্বীনের এ বিরাট বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে সে মাটিই গোড়া থেকে সরে যাচ্ছে। দ্বীনের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসগুলোই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সে দুর্বলতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মাওলানার সারগর্ভ ভাষায়–

"মূল আকীদাগুলোর মূল বা শিকড়ে সেই প্রাণশক্তি অবশিষ্ট ছিলো না যা শাখা আকীদাগুলোকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাতে পারে।" অবস্থা তো এই যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মোহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের রিসালাতের একীন ও বিশ্বাস দুর্বল থেকে দুর্বলতর এবং আখেরাতের গুরুত্ব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কালামের ধার ও ভার কমে যাচ্ছে। দ্বীন ও শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উঠে যাচ্ছে। ছাওয়াব ও বিনিময় লাভের আগ্রহ (তথা ঈমান ও ইহতিসাব) ক্রমশঃ দিল থেকে মুছে যাচ্ছে।

জীবনের মোড় পরিবর্তন

এ বোধ ও প্রত্যয় এত উজ্জ্বল ও দৃপ্তভাবে হযরত মাওলানার অন্তরে জাগ্রত হলো যে, তাঁর জীবনের মোড় এবং কর্মচিন্তার গতিমুখ একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেলো। মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হলো কর্মে ও কর্মপদ্ধতিতে। তাঁর সারা জীবনের সংগ্রাম সাধনা এবং দাওয়াত ও আন্দোলনের বুনিয়াদ ছিলো মূলতঃ এ

বাস্তব উপলব্ধি যে, মুসলমানদের দ্বীনের বুনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং তা পূর্ণ মজবুত করাই হলো সময়ের আসল দাবী। এ চিন্তাধারাই ছিলো তাঁর সকল সংগ্রাম সাধনার কেন্দ্রবিন্দু, যা সবদিক থেকে তাঁর মনোযোগ ও আকর্ষণ সরিয়ে এই একটি মাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছিলো।

মাওলানা হোসায়ন আহমদ মদনী (রহঃ)–কে লেখা এক পত্রে তিনি তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এভাবে তুলে ধরেছেন–

নামায, রোযা, কোরআন, ধর্মপালন, সুন্নতের পাবন্দী ইত্যাদির নাম মুখে উচ্চারণ করলে মুসলিম জাহানে অবজ্ঞা ও উপহাসের চূড়ান্ত করে ছাড়া হয়। এ সকল বিষয়ের মর্যাদা ও মহিমা পুর্নঃ প্রতিষ্ঠার দাওয়াতই হলো এই তাবলীগী মেহনতের মূল লক্ষ্য। ইসলামী জাহানের পরিবেশকে অবজ্ঞা ও অমর্যাদা থেকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার স্তরে উত্তোরণের প্রচেষ্টাই হলো এ কাজের বুনিয়াদ।

মুসলমানদের মাঝে দ্বীনের কদর ও তলবের অনুপস্থিতি

হযরত মাওলানা খুব ভালোভাবেই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের ঈমান একীনই যেখানে অবনতিশীল, দ্বীনের আযমত ও মর্যাদাবোধই যেখানে অন্তর থেকে বিলুপ্তপ্রায়। দ্বীনের প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো থেকেই সাধারণ মুসলমান যেখানে বঞ্চিত হয়ে চলেছে; সেখানে দ্বীনের উচ্চস্তরীয় বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কিছুটা অকালচেষ্টাই বটে। কেননা হৃদয়ের মাটিতে দ্বীনের শিকড় মজবুত হয়ে যাওয়ার পরই হলো এগুলোর উপযুক্ত ক্ষেত্র। আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মন–মানস ও চিন্তা–প্রবণতার ক্রমোস্ফীত ঢলের গতিমুখ তিনি ধরে ফেলেছিলেন এবং যথার্থই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দ্বীনী মারকাজ গড়ে তোলা তো দূরের কথা, এমতাবস্থায় পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলোর অস্তিত্বও শংকামুক্ত নয়। কেননা যে সকল ধমনী দ্বারা ধর্মীয় কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে জীবন–শোণিত সঞ্চালিত হতো উম্মতের দেহাভ্যন্তরে সেগুলো ক্রমশঃ শুষ্ক ও সংকুচিত হয়ে আসছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি এবং সেগুলোকে রক্ষার গুরুত্ববোধ এবং সেখানে কর্মরতদের দ্বীনী খেদমত ও অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির মানসিকতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দ্বীনী মাদরাসার সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক শায়খ হাজী রশীদ আহমদ ছাহেবের নামে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন,

এখন থেকে পনের বছর আগে নিজের ক্ষুদ্র দৃষ্টি আর আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা 'ধর্মপ্রাণ'দের মন মানস ও চিন্তার গতিমুখ আঁচ করতে পেরেছিলাম এবং এটা বুঝে নিয়েছিলাম যে, মক্তব- মাদরাসার বর্তমান গতিশীলতা এবং মানুষের আগ্রহ অনুরাগ (যার উপর নির্ভর করে মক্তব মাদরাসার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ কাজ করে যাচ্ছেন এবং চাঁদাদাতাগণ চাঁদা দিচ্ছেন) তা অচীরেই শেষ হয়ে যাবে এবং সামনে তাদের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

দ্বীনী মাদরাসা সমূহের মূল কেন্দ্রগুলোতে আপন স্বভাবসংবেদনশীলতা ও ঈমানী প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি এটাও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ক্রমবর্ধমান দুনিয়ামুখিতা এবং ঈমান ও ছাওয়াবের আগ্রহহীনতার কারণে দ্বীনী ইলম চর্চা তালিবে ইলমদের জন্য শুধু অনুপকারীই নয় বরং তাদের জন্য বিপদ ও 'বিপক্ষ প্রমাণ' হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের অশ্রদ্ধা ও বেকদরীর কারণে দ্বীনী ইলম সমূহ বিলুপ্ত হতে বসেছে এবং তাদের জন্য আসমানী গজবের কারণ হয়ে চলেছে। এমতাবস্থায় মক্তব মাদরাসার কার্যকারিতা এবং দ্বীনী ইলমের কল্যাণ প্রভাব দুনিয়া থেকে দিন দিন উঠে যাচ্ছে।

একই চিঠিতে তিনি লিখেছেন-

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে সকল কল্যাণ-উদ্দেশ্য ইলম চর্চার পিছনে সক্রিয় থাকে বর্তমানে সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণে ইলম নিষ্ফল হয়ে চলেছে। এখন আর ইলম দ্বারা ঐ সকল কল্যাণ-উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না যেগুলোর কারণে ইলমের মর্যাদা ও তলব ছিলো। এ দু'টি বিষয় লক্ষ করে আমি বর্তমান কর্মপদ্ধতিতে আত্মনিয়োগ করেছি।

মুসলমানদের কল্যাণের জন্য মাদরাসার অস্তিত্বকে মাওলানা অপরিহার্য মনে করতেন এবং মুসলমানদের মাথার উপর এ রহমত-ছায়া উঠে যাওয়াকে বিপদ-মুছীবত ও আযাব-গযবের কারণ মনে করতেন। অথচ মানুষের উদাসীনতা, অবজ্ঞা ও বেকদরীর কারণে বিপুল সংখ্যক মক্তব মাদরাসা মেওয়াত অঞ্চলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। একই হাজী ছাহেবকে এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

মানুষের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করতে আপনি পূর্ণোদ্যমে কাজ করুন যে, শত শত মাদরাসা অচল বা বন্ধ হয়ে যাওয়া বর্তমান যামানার লোকদের জন্য অতীব বিপদ ও জওয়াবদেহির আশংকা সৃষ্টি করছে। কোরআন দুনিয়া থেকে মিটতে থাকবে অথচ তা রক্ষার জন্য আমাদের সম্পদের সামান্য অংশও ব্যয় হবে না এবং আমাদের অন্তরে কোন ব্যথাও অনুভূত হবে না এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক।

তবে মাওলানা মনে করতেন যে, আজকের দ্বীনী মাদরাসাগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদেরই অবদান এবং তাদেরই তৈরী ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আসল দ্বীনী দাওয়াত ও মেহনত মোজাহাদার বরকতে মুসলমানদের অন্তরে দ্বীনের যে তলব ও কদর পয়দা হয়েছিলো তারই ফলে দ্বীনদার মুসলমানগণ আগামী প্রজন্মের হাতে দ্বীনকে তুলে দেয়া এবং দুনিয়াতে কায়েম ও জিন্দা রাখার জন্য দেশব্যাপী মক্তব মাদরাসার জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং সৌভাগ্য মনে করে সেগুলোর খিদমতে আত্মনিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই প্রাচীন উৎস থেকে উৎসারিত জযবা উদ্দীপনার যে ক্ষীণ ধারা মুসলমানদের প্রায় বিশুষ্ক হৃদয় ভূমিতে এখনো মরা নদীর মতো বয়ে চলেছে তারই কল্যাণে দেশের মক্তব মাদরাসাগুলো এখনো সচল সজীব রয়েছে এবং দ্বীন শিক্ষার্থী ও ত'লিবে ইলমদের আগমন কিছুটা হলেও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত ও দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, ধর্মানুরাগ ও দ্বীনী জযবার এ অমূল্য সম্পদ বৃদ্ধি লাভের পরিবর্তে দিন দিন মারাত্মক ভাবেই হ্রাস পেয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য যে, এ সুরতেহাল দ্বীন ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যত অস্তিত্বের জন্য খুবই আশংকাজনক। কেননা যে সম্পদ ভাণ্ডারে সঞ্চয় বৃদ্ধি না পায়, বরাবর ঘাটতি লেগে থাকে (সে ঘাটতি প্রতিদিন ফোঁটা ফোঁটা করে হলেও) সমুদ্র পরিমাণ সম্পদও একদিন না একদিন শুকিয়ে যায়।

অনুভূতি ও আত্মচাহিদার দাওয়াত

মাওলানা মোহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) পরিপূর্ণ ও গভীর উপলব্ধির সাথে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বর্তমান সময়ের সর্বাগ্রাধিকারযোগ্য ও অপরিহার্য প্রয়োজন হলো মুসলমানদের অন্তরে দ্বীনী তলব ও আত্মচাহিদা সৃষ্টি করা এবং ইসলামী পরিচয়-সচেতনতা তথা মুসলমানত্বের অনুভূতি জাগ্রত করা এবং এ

কথার পূর্ণ বোধ ও উপলব্ধি দান করা যে, শিক্ষা করা ছাড়া দ্বীন আসে না আর দুনিয়ার যাবতীয় হুনর হিকমত ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চেয়ে দ্বীন শিক্ষা অনেক বেশী জরুরী। এ অনুভূতি ও আত্মচাহিদা যদি জাগ্রত হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য স্তর ও পর্যায়গুলো নিজে নিজেই পার হয়ে যাবে। অনুভূতিশূন্যতা ও চাহিদাহীনতাই হলো বর্তমান মুসলিম সমাজের সাধারণ ব্যাধি। ভ্রান্তিবশতঃ মানুষ মনে করে বসেছে যে, ঈমান তো রয়েছেই। তাই ঈমানের পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ গোড়া থেকে ঈমান জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তাই রয়ে গেছে।

তালীম ও তাবলীগ এবং সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম কল্যাণ–যুগের তুলনায় বিরাট গুণগত পরিবর্তন এই হয়েছে যে, দাওয়াতি ও ইছলাহী মেহনত পিপাসু লোকদের পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা ও সংশোধন লাভের পিপাসা ও চাহিদা যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য তো পূর্ণ আয়োজন ও ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু রোগ ব্যাধির অনুভূতিই যাদের নেই এবং অন্তরে চাহিদা ও পিপাসাই যাদের মরে গেছে দাওয়াতি মেহনতের মনোযোগ তাদের দিক থেকে সম্পূর্ণ সরে গেছে। অথচ প্রয়োজন ছিলো তাদের মাঝে চাহিদা ও পিপাসা জাগ্রত করার দাওয়াত ও চেষ্টা মেহনত চালিয়ে যাওয়া। আম্বিয়া কেরামের আবির্ভাবকালে সারা বিশ্ব এমন বিমুখ ও চাহিদাহীন অবস্থায় থাকে যে, লাভ ক্ষতির কোন পরোয়া নেই, জীবন–মৃত্যুর কোন অনুভূতি নেই। আম্বিয়া কেরাম তাদের মাঝে তলব ও জযবা এবং চাহিদা ও পিপাসা সৃষ্টি করেন এবং কর্মীপুরুষ তৈরী করে নেন। শীতল অনুভূতিতে উষ্ণতা আনা এবং মৃত হৃদয়ে অনন্ত পিপাসা ও চাহিদা জাগিয়ে তোলাই হলো আসল দাওয়াত ও তাবলীগ।

কর্ম পদ্ধতি

দ্বীনের এ তলব ও জযবা এবং চাহিদা ও পিপাসা সৃষ্টি করার উপায় কি? ইসলামের বুনিয়াদী তালীম ও মৌল শিক্ষা বিতরণের পদ্ধতি কি? এ প্রশ্নের সরল সোজা জবাব এই যে, ইসলামের প্রথম কথা তথ্য কালিমায়ে তাইয়িবাই হলো আল্লাহর 'রজ্জু'র সেই প্রান্তভাগ যা প্রত্যেক মুসলমানের হাতে ধরা আছে। এ রজ্জু ধরেই একজন মুসলমানকে আপনি পূর্ণ দ্বীনের পথে টেনে আনতে

পারেন। কোন ওজর আপত্তিই তখন সে করতে পারে না। একজন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত এ কালিমা বিশ্বাস করে এবং এর দাবী স্বীকার করে ততক্ষণ তাকে দ্বীনের পথে টেনে আনার সুযোগ থাকে। সুতরাং আল্লাহ না করুন, এ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগেই তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

আজকের এ বিশাল বিস্তৃত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুসলিম জনপদে দ্বীনের চেতনা ও অনুভূতি এবং চাহিদা ও পিপাসা সৃষ্টি করার জন্য কালিমায়ে তাইয়িবাই হলো একমাত্র পথ। কালিমা–ই–তাইয়িবার যোগসূত্র ধরেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে এবং কালিমার আবেদন দ্বারাই তাকে সম্বোধন করতে হবে। কালিমা ভুলে গিয়ে থাকলে স্মরণ করাতে হবে। অশুদ্ধ হলে শুদ্ধ করে দিতে হবে। কালিমার অর্থ ও মর্ম বলে দিতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে, এই কালিমার মাধ্যমে আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের এবং রাসূলের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর যে সুস্পষ্ট ঘোষণা সে দিয়েছে তার দাবী কি? এভাবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম আহকাম মেনে চলার পথে টেনে আনতে হবে। এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম ও সর্ব সাধারণ হুকুম হলো নামায। বস্তুতঃ আল্লাহ তাতে এমন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, মানুষের মাঝে সমগ্র দ্বীনের উপর চলার শক্তি ও সক্ষমতা এর দ্বারা এসে যায়। কালিমা–ই–তাইয়িবা দ্বারা বান্দেগী ও আনুগত্যের যে স্বীকৃতি ঘোষণা করা হয়েছিলো, নামায হলো তার সর্বপ্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। এরপর আল্লাহর পথে আগুয়ান এ ব্যক্তির উন্নততর ও দৃঢ়তর ঈমানী তরক্কির জন্য তাকে আল্লাহর সাথে ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী করতে হবে এবং আল্লাহকে অধিক থেকে অধিক স্মরণ করার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। সেই সাথে তার চিন্তায় একথাও বদ্ধমূল করতে হবে যে, আদর্শ মুসলমানের জীবন যাপনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি এবং তাঁর হুকুম আহকাম জানার প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়ার কোন বিদ্যা ও শিল্প যথেষ্ট সময় ব্যয় করে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং দ্বীনও মেহনত ও তলব ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। বিনা মেহনতেই দ্বীন এসে গেছে বলে ধরে নেয়া মারাত্মক ভুল। বরং তার জন্য নিজের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সময় বের করা জরুরী।

এ কাজ এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত যে 'কতিপয়' ব্যক্তি বা 'কতিপয়' দল এর

জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপক মেহনত ও মোজাহাদার প্রয়োজন রয়েছে। মাওলানা মোহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) এর ভাষায়– কোটি মানুষের জন্য লক্ষ মানুষ যদি না দাঁড়ায় তাহলে কিভাবে কাজ হবে! অথচ না জানা মানুষ যত কোটি জানা মানুষ কিন্তু তত লক্ষ নয়।

মাওলানার মতে এ কাজের জন্য ইসলামী বিশ্বে এক ব্যাপক ও স্থায়ী আলোড়ন ও আন্দোলনের প্রয়োজন এই আলোড়ন ও আন্দোলনই হলো মুসলিম জীবনের আসল ও স্বাভাবিক অবস্থা। পক্ষান্তরে স্থিরতা, স্থবিরতা ও পার্থিব ব্যস্ততা হলো সাময়িক বা আরোপিত অবস্থা। দ্বীনের কল্যাণের জন্য এই আলোড়ন ও আন্দোলনের উপর মুসলিম উম্মতের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে পৃথিবীর বুকে তাদের অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য এবং আত্মপ্রকাশের সার্থকতা।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ *

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণেব জন্য যারা উথিত। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎ কাজের নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।

অন্যথায় দুনিয়ার যিন্দেগীর স্থির প্রশান্তি ও আত্মনিমগ্নতা, ব্যবসা বাণিজ্যের মহাকর্মব্যস্ততা এবং শহরের উদ্যাম জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তখন এমন কোন শূন্যতা বিরাজমান ছিলো না যা পূরণের জন্য এক নতুন উম্মতের প্রয়োজন হতে পারে।

এই জামা'আতকেন্দ্রিক জীবন ও জীবনের আসল কাজ যখন থেকে মুসলিম উম্মাহ ছেড়ে দিয়েছে কিংবা গৌণ ও পার্শ্ব বিষয়ের মর্যাদায় নামিয়ে এনেছে তখন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে এবং যখন থেকে তাদের জীবনে স্থিরতা ও নিস্তরংগতা এবং শান্তিপূর্ণ ও কর্মব্যস্ত শহুরে জীবনের যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাকাপোক্ত আসন করে নিয়েছে তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাদের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্ব ও আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য যার প্রথম প্রকাশ হলো খেলাফতে রাশেদার বিলুপ্তি। মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) বলেন, (আর ইতিহাসও তাঁর প্রতিটি কথা ও প্রতিটি দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে।)।

আমরা দ্বীনী দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জামা'আত নিয়ে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অথচ এটাই ছিলো আমাদের জীবনের মৌলিক কাজ। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দাওয়াত নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে যেতেন এবং যিনিই তাঁর হাতে হাত রেখে বাই'আত হতেন তিনিও একই উদ্দেশ্যের মজনু হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। মক্কী জীবনে মুসলমানদের সংখ্যা যখন হাতগুণতি ছিলো তখনও প্রতিটি মানুষ মুসলমান হওয়ামাত্র নিজস্বভাবে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অন্যের সামনে হক ও সত্যের বাণী পেশ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হতেন। মদীনায় মুসলমানদের সামাজিক ও তামাদ্দুনিক জীবনের গোড়াপত্তন হয়েছিলো। সেখানে পৌঁছামাত্র হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারদিকে বিভিন্ন জামা'আত পাঠানো শুরু করলেন এবং যারাই জীবনের পথে অগ্রসর হলেন তারা সামরিক জীবনের পথেই অগ্রসর হলেন। স্থির ও প্রশান্ত জীবন তাদেরই শুধু জুটেছিলো যারা 'চলমান' লোকদের চলাফেরার কজে উপায় উপকরণ যোগাতো এবং সহায়কের ভূমিকা পালন করতো। মোটকথা, দ্বীনের জন্য চলমান অবস্থায় চেষ্টা মেহনতে নিরত থাকাই ছিলো আসল। এটা হাতছাড়া হওয়ার পরই খেলাফত হাতছাড়া হয়ে গেলো।

কর্মসূচী

এ দাওয়াতি কাজের জন্য মুসলমানদের জামা'আত যখন সচল হয়ে উঠবে এবং চলাফেরা শুরু করবে তখন তাদের কর্মসূচী ও কর্মবিন্যাস কি হবে এবং কি কি বিষয়ের দাওয়াত পেশ করা হবে? এর উত্তর মাওলানার লেখাতেই দেখুন–

আসল দাওয়াত শুধু দু'টি বিষয়ের হবে। বাকি সবকাজ হবে রূপায়ন ও তাশকীলমূলক। বিষয় দু'টির একটি হলো শারীরিক অন্যটি হলো আত্মিক। দেহ ও শরীরের সাথে সম্পর্কিত বিষয় এই যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন তার প্রচার প্রসারের জন্য সকল দেশে ও সকল ভূখণ্ডে বিভিন্ন জামা'আত বানিয়ে 'চলাফেরার' সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করা এবং সেটাকে উন্নতি ও স্থায়িত্ব দান করা। আত্মিক বিষয় হলো আবেগ ও

জযবার তাবলীগ করা। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে জান কোরবান করার মনোভাব জাগ্রত করা। আত্মনিবেদনের এ আবেগ ও জযবার কথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতে–

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

আপনার রবের কসম! এরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না এরা নিজেদের ঝগড়া বিবাদে আপনাকে বিচারক নিয়োগ করে এবং আপনার বিচারে মনোকষ্ট অনুভব না করে পরিপূর্ণভাবে তা মেনে নেয়।

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ *

আর আমি জ্বিন ও ইনসানকে আমার ইবাদত করার জন্যই শুধু সৃষ্টি করেছি।

আয়াত দু'টির সারমর্ম এই যে, আল্লাহর কথা ও আদেশের সামনে জান-প্রাণ মূল্যহীন হয়ে যাবে এবং নফস একান্ত অনুগত হয়ে যাবে।

জামা'আতে বের হওয়ার সময় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত বিষয়গুলোর মধ্যে যা যতবেশী গুরুত্বপূর্ণ তাতে সেই পরিমাণ মেহনত করা কর্তব্য। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমরা (ইসলামের মূল বুনিয়াদ ও প্রথম বিশ্বাস) কালিমার সাথে পর্যন্ত অপরিচিত হয়ে পড়েছি। এজন্য সর্বপ্রথম এই কালিমা-ই-তাইয়েবারই তাবলীগ করতে হবে। কেননা কালিমাই হলো খোদার খোদায়িত্বের স্বীকৃতি ঘোষণা। অর্থাৎ এ কথা স্বীকার ও ঘোষণা করা যে, আল্লাহর হুকুমে জান দেয়া ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আমাদের আর কোন কাজ নেই।

২। কালিমার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থ শিক্ষার পর নামাযের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ঠিক করা এবং নিজেদের নামাযকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো বানানোর চেষ্টায় লেগে যাওয়া কর্তব্য।

৩। (সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশ-এ) তিন সময় 'নিজ নিজ অবস্থার উপযোগী' ইলম ও যিকিরে আত্মনিয়োগ করা।

৪। মানুষের মাঝে এ জিনিসগুলোর প্রচার প্রসারের জন্য আসল মোহম্মদী দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে ঘর থেকে বের হওয়া এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর প্রচলন করা কর্তব্য।

৫। এই চলাফেরার ক্ষেত্রে নিয়ত রাখবে আপন চরিত্র গঠনের মশক করার এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের (সে কর্তব্য খালিকের সাথে সম্পর্কিত হোক কিংবা মাখলুকের সাথে)। কেননা প্রত্যেককে নিজের আমল সম্পর্কেই শুধু জিজ্ঞাসা করা হবে।

৬। তাছহীহে নিয়ত, বা নিয়ত ছহী ও বিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক শাস্তি বা পুরস্কারের যে ওয়াদা করেছেন সে অনুযায়ী ঐ আমল সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে সুন্দর করার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া।

এ যামানার এক বড় ফেতনা যা হাজারো খারাবি ও ফাসাদের গোড়া এবং যা মুসলমানকে মুসলমানের গুণাবলী থেকে বঞ্চিত করেছে এবং ইসলামকে মুসলমানদের সামগ্রিক গুণ ও যোগ্যতার সুফল থেকে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছে তা হলো মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা এং মুসলমানের প্রতি মুসলমানের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা। প্রত্যেক মুসলমান যেন 'স্বীকৃত সত্য' রূপেই এটা ধরে নিয়েছে যে, তার ব্যক্তিসত্তাই হচ্ছে যাবতীয় গুণ ও সৌন্দর্যের আধার আর অন্য মুসলমানের ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে যাবতীয় দোষ মন্দের ভাগাড়। সুতরাং সে নিজে হচ্ছে সম্মানীয় আর অন্য সকলে হচ্ছে নিন্দনীয়। এ মানসিকতা ও আচরণই হচ্ছে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে উদ্ভূত সমস্ত ফেতনা ফাসাদের মূল কারণ, যা উম্মতকে পেরেশান ও দিশেহারা করে ফেলেছে।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে উম্মতের প্রতি এটা এক বিরাট গায়বী মদদ যে, এ বিষয়ে হযরত মাওলানাকে তিনি বিশেষ উপলব্ধি ও তাওফিক দান করেছিলেন। তাই ইকরামুল মুসলিম দাওয়াতি আন্দোলনের অন্যতম উছূল ও মূলনীতিরূপে গৃহীত হয়েছিলো।

আন্দোলনের গঠন ও প্রকৃতিগত কারণেই সর্বস্তরের মুসলমানের সাথে এতো বেশী মুখোমুখি ও মাখামাখি হতে হয় এবং এতো কঠিন কঠিন

পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, যদি উপরোক্ত উছূল ও মূলনীতির পাবন্দী এবং সে অনুযায়ী চিন্তাগত ও চরিত্রগত তারবিয়াত না হতো তাহলে এ থেকে হাজারো ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারতো। খোদ মাওলানার ভাষায়–

"যে ফেতনা কয়েক শতাব্দী পরে আসতো আন্দোলন পরিচালনায় বে–উছূলী এবং কাজের তরীকা ভংগ হলে সেগুলো কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক দিনেই আমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।"

'নিজেকে সকল গুণের আধার এবং অন্যকে সকল দোষের ভাণ্ডার' মনে করার যে ভ্রান্ত মানসিকতা আজ আমাদের মাঝে শিকড় গেড়ে বসেছে সেটাকে মাওলানা (রহঃ) এভাবে সংশোধন করলেন যে, "নিজের দোষ ও অযোগ্যতার উপর নজর রাখবো আর অন্যের গুণ ও যোগ্যতা খুঁজে বের করে তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবো। তার কিছু দোষ যদি নযরে এসেও যায় তবে সেগুলো আড়াল করবো এবং তার গুণাবলী দ্বারা দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করবো।" এ ধরনের চিন্তা ও মানসিকতাই হলো সমস্ত ফেতনা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় এবং সমস্ত ব্যধির একমাত্র চিকিৎসা। এক পত্রে তিনি লিখেছেন–

দোষ ও গুণের মিশ্রণ ছাড়া কোন মানুষ এবং কোন মুসলমানের অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তি মাত্রেরই চরিত্র–সত্তায় নিঃসন্দেহে কিছু গুণ ও কিছু দোষ–দু'টোরই সমাবেশ ঘটে থাকে। দোষ–ক্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখা এবং গুণ ও যোগ্যতার কদর সমাদর করার মানসিকতা যদি আমাদের মুসলমানদের মধ্যে গড়ে উঠে তাহলে এমনিতেই বহু ফেতনা খারাবির নিরসন হবে এবং বহু কল্যাণ ও পুণ্যের শুভ উদ্বোধন হবে। কিন্তু (আফসোসের বিষয় এই যে,) আমাদের আচরণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

মাওলানা (রহঃ) শুধু চিন্তা ও তত্ত্বগতভাবে নয় বাস্তবে ও কর্ম ক্ষেত্রেও (এবং স্বভাবতঃই সর্বপ্রথম নিজের আমল দ্বারা) এ মূলনীতির সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। মেওয়াতি ও তাবলীগী লোকদের অন্তরে তিনি কালিমার এমন আযমত ও কালিমাওয়ালার এমন ইজ্জত বসিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইকরামুল মুসলিমীন তাদের জীবন ও চরিত্রের এবং স্বভাব ও মেযাজের অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয়েছিলো। মাওলানা (রহঃ) তাদেরকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করে

তুলেছিলেন যে, যে কোন ফাসেক মুসলমানের সাথে আচরণের সময়, এমনকি ঠিক দাওয়াত পেশ করার মুহূর্তেও তাদের দৃষ্টি যেন ঈমানের সেই অগ্নিস্ফুলিংগের প্রতি নিবদ্ধ থাকে যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে ছাইচাপা পড়ে আছে; যা সামান্য মেহনতের বরকতে যে কোন মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে পূর্ণ শক্তিতে।তাই একজন উম্মতি হওয়ার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একজন মুসলমানের যে 'সম্পর্ক' বিদ্যমান রয়েছে তা যেন তাদের অন্তরে সদা জাগরূক থাকে।

মনে হয়, মাওলানা (রহঃ) তাদেরকে যেন এমন এক 'অণুবীক্ষণ' দান করেছিলেন যা দ্বারা ঈমানের ক্ষুদ্র 'কণা'ও বহু গুণ বড় আকারে তারা দেখতে পেতো।

দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মসূচীতে এই একটি মাত্র মূলনীতি সংযোজনের বরকতে এমন বহু ফেতনা ও অনিষ্ট হতে তা পূর্ণ নিরাপদ হয়ে গেলো যা প্রতিপক্ষ মহলে এবং নতুন নতুন শহর ও জনপদে যাতায়াত ও বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে দেখা দিতে পারতো।

যিকিরের পাবন্দী, ইলম চর্চায় আত্মনিয়োগ, অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার, আমীরের ইতা'আত এবং জামা'আতবদ্ধ ব্যবস্থায় কাজ করার কঠোর তাকীদের কারণে এমন অন্য সকল ফিতনা ও খারাবী থেকেও এ দাওয়াত নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে গেছে যা সাধারণ অবস্থায় অন্যের 'সংশোধন ও তাবলীগ' করার ক্ষেত্রে দেখা দিয়ে থাকে।

দ্বীনী কাজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা

হযরত মাওলানা (রহঃ)–এর মতে দ্বীনের ভিত্তিভূমি হলো ঈমান এবং শরীয়তের মৌল বিধান ও মূলনীতি সমূহ। আর মুসলমানদের মাঝে সেগুলোর সুপ্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক প্রচলনের উদ্দেশ্যে (উপরে বর্ণিত পন্থা ও পদ্ধতি অনুসারে) দাওয়াত ও তাবলীগের নামে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো এবং মেহনত মোজাহাদা করা মূলতঃ জমিন সমতল, উপযোগী ও সিঞ্চিত করার সমতুল্য। পক্ষান্তরে অন্যান্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও শাখা প্রশাখা এবং ইসলামী যিন্দেগীর অন্যান্য ক্ষেত্র বাগবাগিচার সমতুল্য যা উপযোগী ও জলসিঞ্চিত ভূমিতে সবুজ

সজীব ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠতে পারে। জমিন যত উপযোগী ও উর্বর হবে এবং যত্ন, পরিচর্যা ও মেহনত যে পরিমাণ হবে বাগানও ততবেশী সবুজ সজীব ও ফলবতী হবে। এজন্য সর্বাগ্রে সর্বাধিক প্রয়োজন হলো জমিন উপযোগী করে তোলা।

মেওয়াতের কতিপয় দ্বীনদার ব্যক্তির নামে লেখা এক পত্রে এ হাকীকত ও বাস্তব সত্যকে হযরত মাওলানা সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন।

বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় যত বিষয় আছে সেগুলোকে বহাল রাখার জন্য (সঠিক নিয়ম–উছুলের সাথে দেশে দেশে ঘুরে চেষ্টা মেহনতের মাধ্যমে) তাবলীগ করা জমিনকে উপযোগী করে তোলার সমতুল্য কিংবা বৃষ্টি সমতুল্য। অন্য বিষয়গুলো হলো দ্বীনের এ উর্বর ভূমির উপর গড়ে উঠা উদ্যান ও বাগানের পরিচর্যা সমতুল্য। বাগান কত রকমের হতে পারে। খেজুর বাগান, আংগুর বাগান, আনার বাগান, আপেল বাগান, কলা বাগান আরো কত কিছুর বাগান; কিন্তু কোন বাগানই দু'টি 'চূড়ান্ত মেহনত' ছাড়া হতে পারে না। প্রথমতঃ জমিন সমতল ও উপযোগী করা। দ্বিতীয়তঃ বাগানের পরিচর্যা ও যত্ন করা। বস্তুতঃ জমিন সমতল ও উপযোগী করার মেহনত ছাড়া কিংবা পরবর্তীতে বাগানের আলাদা পরিচর্যা ও যত্ন ছাড়া কোন ভাবেই বাগান তৈরী হতে পারে না। তদ্রূপ দাওয়াত ও তাবলীগ বিষয়ক চেষ্টা মেহনত হলো দ্বীনের সমতল ও উপযোগী ভূমি। আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও শাখা প্রশাখা হলো উদ্যান ও বাগান। এখনো পর্যন্ত দ্বীনের ভিত্তিভূমি এতো অসমতল ও অনুপযোগী হয়ে আছে যে, কোন বাগানই তাতে তৈরী হতে পারে না।

হযরত মাওলানা (রহঃ)–এর মতে জমিন ঠিক না করে এবং বুনিয়াদ মজবুত করার আগে পরবর্তী বিষয়গুলোতে ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং তাতে শক্তি ও উদ্যম ব্যয় করা এবং তা থেকে ভালো ফলাফল আশা করা ছিলো আমাদের মারাত্মক ভুল। এ চিন্তাকে এক চিঠিতে তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন–

যে কাওমের অধঃপতন لا اله الا الله এর শব্দ পরিচয় থেকেও নীচে নেমে গেছে সে কাওম বুনিয়াদ ঠিক না করে চূড়ান্ত স্তর ঠিক করার উপযুক্ত কিভাবে হতে পারে? 'শুরু' ঠিক না হয়ে তো 'শেষ' ঠিক হতে পারে না। এ জন্য মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত পর্যায়ের চিন্তা ভাবনা আমি বিলকুল ছেড়ে দিয়েছি।

বুনিয়াদ ও প্রাথমিক স্তর সংশোধনের পর যাত্রা শুরু হলে নিজস্ব গতিতেই চূড়ান্ত পর্যায়ে উপণীত হওয়া যাবে। পক্ষান্তরে বুনিয়াদ কাঁচা ও বক্র রেখে চূড়ান্ত পর্যায়ের সংশোধনচিন্তা প্রবৃত্তিপরায়ণতা ছাড়া আর কিছু নয়।

মেওয়াতে এক সময় কিছু মতভেদপূর্ণ বিষয়ে বির্তকের সূত্রপাত হয়েছিলো। মানুষও সোৎসাহে তাতে যোগ দিতো। এ উপলক্ষে এক পত্রে মেওয়াতিদেরকে মাওলানা হিদায়েত দিলেন–

গোটা এলাকার সমস্ত জামে মসজিদ ও অন্যান্য সমাবেশস্থলে গুরুত্বের সাথে এ বক্তব্য প্রচার করা হোক যে, যে কাওম ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় কালিমা, নামায সম্পর্কেই এখনো পূর্ণ অবগত নয় তাদের সংশোধন প্রয়াসে বুনিয়াদের পরিবর্তে উচ্চস্তরীয় বিষয়ে লিপ্ত হওয়া তো মারাত্মক ভ্রান্তি। কেননা সঠিক বুনিয়াদ ছাড়া তো উপরের স্তর ঠিক হতে পারে না।

ঈমানী আন্দোলন

এ কারণেই মাওলানা তাঁর দাওয়াতি মেহনতকে (যা মুসলমানদের মধ্যে ঈমানী জাগরণ ও দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয়ের প্রচলন উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিলো) ঈমানী আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করতেন এবং দ্বীন ও ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমনই জরুরী মনে করতেন যে, এজন্য জান মালের যে কোন কোরবানী তাঁর কাছে 'সামান্য' ছিলো। এক পত্রে তিনি বলেন–

আমাদের এই ঈমানী আন্দোলন যার সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা দুনিয়া স্বীকার করে নিয়েছে আমার চিন্তায় তা বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় এই যে, প্রতিটি মানুষ 'লক্ষপ্রাণ' বিসর্জন দেয়ার মনোভাব নিয়ে তৈয়ার হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের এ বিষয়টি হচ্ছে অন্য কথায়– এক বিশেষ পন্থায় ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের এক অতি আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য ফরয, যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য। আর নিঃসন্দেহে এটা অন্যান্য প্রচলিত পন্থার তুলনায় আসল নববী তরীকার অধিকতর নিকটবর্তী ও সদৃশ।

উদাসীন ও নিস্পৃহদের প্রতি দাওয়াত

ঈমান ও আরকানের সাথে সম্পর্কই হলো দ্বীনের ভিত্তিভূমি, যার উপর গড়ে উঠে দ্বীনের বাগ বাগিচা ও প্রাসাদ অট্টালিকা। তদ্রূপ দ্বীনের তলব ও চাহিদা এবং কদর ও মর্যাদাবোধই হলো সেই মহামূল্যবান পূঁজি ও মূলধন যা সকল লাভ মুনাফা ও উন্নতি অগ্রগতির উৎস। এ বোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মাওলানা (রহঃ) তাঁর সমস্ত মনোযোগ ও কর্মস্পৃহা দ্বীনের সকল অমৌল ও সম্পূরক বিষয় থেকে সরিয়ে শেষ পর্যন্ত এই মৌলিক ও বুনিয়াদী কাজে নিবদ্ধ করে ফেললেন এবং তাতেই পূর্ণ একাগ্র ও আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়লেন। দ্বীনের অন্যান্য শাখার পূর্ণ সত্যতা ও কল্যাণ প্রসুতা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না এবং সংশ্লিষ্টদের প্রতি তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধাবোধেরও কোন কমতি ছিলো না; বরং তাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দু'আ ও সহানুভূতি ছিলো। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের জন্য তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিলো এই যে, এখন শুধু মাত্র এই একটি কাজেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখবেন এবং তাঁর ভাষায় "নিজের দরদ ব্যথার সম্পদ, চিন্তা-ফিকিরের সম্পদ এবং আল্লাহর দেয়া শক্তি সামর্থ্য এছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করবেন না।" অন্তিম অসুস্থতাকালেই একদিন মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহঃ)-কে তিনি বলেছিলেন-

শাহ ছাহেব! শুরুতে আমি মাদরাসায় পড়িয়েছি। তখন বেশ ছাত্র সমাগম হলো। ভালো ভালো প্রতিভাবান তালিবে ইলম প্রচুর সংখ্যায় আসতে লাগলো। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, তাদের উপর আমার মেহনত ও পরিশ্রম ব্যয়ের ফল এছাড়া আর কি হবে যে, আমার কাছে পড়ার পর তারাও আলিম মৌলবীই হবে এবং গতানুগতিক কাজেই নিয়োজিত হবে। কেউ 'তিব্বিয়া' পড়ে হেকিম হবে। কেউ 'সরকারী পরীক্ষা' দিয়ে সরকারী চাকুরীর ধান্ধা করবে আর ভালো যারা তারা কোন মাদরাসায় বসে সারা জীবন তালীমের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে। এর বেশী আর কিছু হবে না। এসব চিন্তা করে মাদরাসায় পড়ানো থেকে আমার মন উঠে গেলো।

এরপর এমন একটা সময় আসলো যখন আমার হযরত আমাকে 'ইজাযত' (ও খিলাফত) দান করলেন। তখন 'আত্মসংশোধন প্রত্যাশীদেরকে যিকিরের উপদেশ দিতে লাগলাম। এদিকে আমার মনোযোগ বেশী নিবদ্ধ হলো। আল্লাহর

কি শান! আগত লোকদের মাঝে এত তাড়াতাড়ি বিভিন্ন 'হাল ও ভাব'-এর উদয় শুরু হলো এবং এত দ্রুত তাদের আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হলো যে, আমি নিজেই হতবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, শেষ পর্যন্ত এ সবের ফলাফল কি দাঁড়াবে! বেশীর চেয়ে বেশী এই তো হবে যে, উচ্চ ভাবের অধিকারী ও যিকির ইবাদতে নিমগ্ন কিছু মানুষ পয়দা হবে। আর তাদের সুনাম সুখ্যাতি শুনে মানুষ মামলার দু'আ, ব্যবসায়ের তদবীর আর সন্তান লাভের তাবিয পাওয়ার আশায় ভিড় জমাবে। আরো বেশী কিছু হলে তাদের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মে কিছু সাধক পুরুষ জন্ম নেবেন এবং তাদের দ্বারা যিকির শোগল ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা অব্যাহত থাকবে। এসব ভেবে সেদিক থেকেও আমার মনোযোগ সরে গেলো এবং আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপণীত হলাম যে, আমার ভিতরে বা বাহিরে যে সকল শক্তি আল্লাহ আমাকে দান করেছেন সেগুলোকে হুবহু নববী তরীকায় ব্যয় করাই হলো আসল কর্তব্য। আর সেই নববী কাজ হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদেরকে, বিশেষতঃ গাফেল ও বিমুখ বান্দাদেরকে আল্লাহর পথে ডেকে আনা এবং আল্লাহর দ্বীনের উন্নতি অগ্রগতির জন্য জানমাল তুচ্ছ করার মনোভাব চালু করা। ব্যস, এটাই হলো আমাদের আন্দোলন এবং এ কথাটাই আমরা সবাই বলে থাকি। এ কাজ যদি প্রত্যাশা মতো হতে থাকে তাহলে বর্তমানের চেয়ে হাজার গুণ বেশী মাদরাসা ও খানকা কায়েম হয়ে যাবে। বরং প্রতিটি মুসলমানই জীবন্ত মাদরাসা ও জীবন্ত খানকা হয়ে যাবে। এভাবে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত নেয়ামত যথাযোগ্য ব্যাপক ও সার্বজনীন রূপে বন্টিত হবে।

শেষ দিকে কখনো কখনো তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ)-এর 'মকতুবাত' এ উদ্ধৃত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহঃ)-এর এ উক্তিটি নকল করতেন-

اگر من شیخی کنم هیچ شیخ درعالم مرید نیابر امامرا کار دیگر فرموده اند

و آن ترویج شریعت دتائید ملت است *

আমি যদি পীর মুরীদী শুরু করি তাহলে দুনিয়াতে কোন পীর মুরীদ খুঁজে পাবে না। কিন্তু আমার প্রতি তো অন্য এক কাজের আদেশ হয়েছে। আর তা

হলো শরীয়তের প্রচলন ঘটানো এবং দ্বীনকে শক্তি যোগানো।

এর বিশদ ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাদ্দিদ ছাহেব বলেন–

لا جرم بصحبت سلاطین می رفتند و بتصرف خودایسان را منقاد می ساختند

وبتوسل ایشان ترویج شر یعیت می فرمودند *

সুতরাং তিনি বাদশাহদের সান্নিধ্যে যেতেন এবং আপন আধ্যাত্মিক প্রভাবে তাদেরকে অনুগত বানাতেন এবং তাদের মাধ্যমে শরীয়তের বাস্তবায়ন ঘটাতেন।

এ কাজের জন্য হযরত মাওলানা (রহঃ) নিজেকে এতটা একাগ্র ও নিমগ্ন করে নিয়েছিলেন যে, কেউ অন্য কিছুর ফরমায়েশ করলে বা অন্য দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাইলে অপারগতা প্রকাশ করতেন। জনৈক অন্তরংগ বন্ধুর তাবিজ–এর ফরমায়েশ বড় হেকমতপূর্ণ ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে উল্টো তাকে তাবলীগের দাওয়াত দিয়ে তিনি লিখেছিলেন–

ভাই! আল্লাহ্ তোমাকে সুখে রাখুন। ঝাড়ফুঁক আমি শিখিনি। তাবিজতুমারও জানা নেই। তবে তুমি যদি দ্বীনের উপর মজবুত থাকার উদ্দেশ্যে আমার কাছ থেকে তাবলীগ শিক্ষা করো তাহলে সেটা হবে অধিক কল্যাণকর। এ কাজ তোমার দুনিয়ার জীবনকেও সহজ সরল করবে। আবার মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনকেও সজীব রাখবে। আমি তো ভাই তাবলীগেই নিমগ্ন থাকতে চাই। জানা অবশ্য নেই এটাও।

একই বিষয়ে অন্য এক আবদারকারীকে তিনি লিখেছিলেন–

তাবিজতুমার কিছুই আমার জানা নেই। আমার কাছে তো তাবলীগই হচ্ছে সব দরদের মলম, সব ব্যথার উপশম। দ্বীনের অগ্রগতিতে আল্লাহ রাজী খুশী হন এবং মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযা শীতল হয় সুতরাং এ পথেই আল্লাহ পাক আপনা থেকেই সবকিছু শুধরে দেবেন। সব সমস্যার সমাধান করবেন।

তৃতীয় এক পত্রে--

বন্ধু আমার! আমি 'আমিল' নই। তাবিজতুমার সম্পর্কেও জ্ঞাত নই।

ঝাড়ফুঁকের সাথেও পরিচিত নই। মসজিদের ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর পড়ে থাকা এক অজ্ঞ ও অজ্ঞাত মানুষ। আল্লাহর ফজলে, তাঁর দয়া ও রহমতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন দুরস্ত ও সংশোধন করার মেহনতে নিয়োজিত আছি। যারা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মহান নেয়ামত থেকে ফায়দা হাছিলের চেষ্টায় ব্রতী আল্লাহ আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। ব্যস, এই একটি বিষয়েই লেগে আছি। আপনার কিংবা আপনার বন্ধুদের যদি এ জিনিসের প্রয়োজন হয় তাহলে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। হয়ত কিছু নাগালে পেয়ে যাবেন। হয়ত কিছু ভাগ্যে জুটে যাবে।

দ্বীনের মূল ও গোড়ায় লক্ষ রাখার প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা (রহঃ) এ কথা পূর্ণ উপলব্ধির সাথে বুঝতে পেরেছিলেন যে, দ্বীনের জড় ও শিকড় শুকিয়ে যাওয়ার কারণেই তার শাখা প্রশাখা ও ফুল পাতা নির্জীব হয়ে পড়ছে। দ্বীনের আরকান আহকাম দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণেই নফল ইবাদতের সজীব রূপ ও তরতাজা অবস্থা বিদায় নিচ্ছে। আমলের নূর ও বরকত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে। দু'আ মুনাজাত ও যিকির অযিফার শক্তি ও প্রভাব ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। এ বাস্তব সত্যের চিত্র এক পত্রে তিনি এভাবে তুলে ধরেছেন–

জনাব, এই যে যিকির অযিফা, আল্লাহর দরবারে এই যে দ'আ মুনাজাত এবং দ্বীনী লাইনের এই যে কাজকর্ম; প্রকৃত পক্ষে এগুলো ঈমানেরই বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ও ফুল পাতা। যে গাছ গোড়া থেকেই শুকিয়ে যায় তার শাখা প্রশাখা ও ফুল পাতায় সজীবতা কিভাবে আসতে পারে? তাই এ অধম বান্দার মতে বর্তমান অবস্থায় না কোন দু'আ কাজে আসতে পারে। না কোন আমল ও অযিফা ফলদায়ক হতে পারে, আর না কারো উদ্যম ও আত্মনিমগ্নতা উপকারে আসতে পারে। হাদীছ শরীফে আছে, যখন দ্বীনের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা অর্থাৎ আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আমল বর্জিত হবে তখন দু'আ ও আহাজারিতে যারা রাত কাটিয়ে দেয় তাদের দু'আ কবুল হবে না। রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। খোলার কোন উপায় থাকবে না। ইসলামের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় লেগে থাকা ছাড়া মুসলমানের উন্নতি লাভ কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। মুমিনের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান এবং করুণা ও অনুগ্রহ

প্রকাশের ইচ্ছা আল্লাহ পাক তখনই শুধু করেন যখন তারা ইসলামের উন্নতি সাধনের চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত থাকে।

দ্বীনের ক্রমবর্ধমান অবনতি, ভারতবর্ষে ইসলামের অস্তিত্ব সংকট, আকায়েদ ও আরকানের দুর্বলতা ও রুগ্নদশা এবং মুসলমানদের অব্যাহত ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতা হযরত মাওলানা (রহঃ)-এর প্রখর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন অতিসংবেদনশীল মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিলো যে, সারা জীবন সে ব্যথায় তিনি অস্থির ছিলেন, যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। উম্মতের এ দুর্গতির কারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারকে যে ব্যথা লাগছে তা মাওলানা (রহঃ) নিজ হৃদয়ে স্থুলভাবেই যেন অনুভব করতেন। ফলে এক নিরন্তর মর্মজ্বালায় তিনি ভুগতেন। একটা যন্ত্রণাকাতরতা সর্বক্ষণ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন-

আমার এ কার্যক্রম জীবন্ত ও সচল হওয়া ছাড়া জনাবে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহকে আমি 'বেচায়ন' দেখতে পাচ্ছি। আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি যে, আমার এ তাবলীগী আন্দোলন ও জাগরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে দ্বীনের পুনরুজ্জীবন এবং সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদের বিপদ মুছীবত থেকে মুক্তির উপায়। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কিছু গায়বী নুছরত ও মদদের সুস্পষ্ট আলামত যেমন নযরে আসছে, তেমনি অতি উত্তম সফলতার সোনালী সম্ভাবনাও জাগ্রত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যারা প্রতিযোগিতামূলক অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তাদের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল প্রকাশ আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিযোগিতায় আগুয়ানদের সংখ্যা খুবই কম।

মাওলানা (রহঃ) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীন দরদী হওয়া জরুরী মনে করতেন। তার দৃষ্টিতে দ্বীনের উন্নতি অগ্রগতির ব্যাপারে অবহেলাকারী এবং নিছক দুনিয়াদারিতে নিমগ্ন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ থেকে দূরত্ব এবং আখেরাতে লজ্জাজনক অপদস্থতার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। বন্ধুদেরকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন-

এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, যে ব্যক্তি ইসলাম মিটে যাওয়ার ব্যথা যন্ত্রণা বুকে না নিয়েই মারা যাবে তার মৃত্যু হবে নিকৃষ্টতম মৃত্যু। দ্বীনের উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কে উদাসীন এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগবিলাসে মত্ত যারা, কেয়ামতের দিন তারা চরম অপদস্থ অবস্থায় উথিত হবে।

আমার বন্ধুগণ! দ্বীনের চেষ্টা মেহনতে নিয়োজিত মানুষ মৃত্যুর সময় সজীব ও তরতাজা থাকবে এবং মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উজ্জ্বল মুখে হাজির হতে পারবে। পক্ষান্তরে দ্বীনে মোহম্মদী সম্পর্কে গাফেল উদাসীন ব্যক্তির এমন কলংকিত চেহারা হবে যে, মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হওয়ার উপযুক্ত থাকবে না এবং তার মৃত্যু হবে খুবই খারাপ মৃত্যু। দ্বীনের জন্য মেহনত হচ্ছে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদ ব্যথার উপশম। এমন মহান সত্তার দরদ ব্যথার উপশমের চেষ্টা না করা বড়ই মুর্খতা, বড়ই জুলুমের কথা।

দ্বীনের উন্নতি তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার মেহনত মোজাহাদায় নিয়োজিত হওয়া এবং উপযুক্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেয়ামতে মহাপুরস্কার লাভের বিরাট বিরাট প্রত্যাশা হযরত মাওলানা (রহঃ)-এর অন্তরে বিদ্যমান ছিলো। এ সম্পর্কে বড় মনোরম বহু দৃশ্য তিনি দেখতে পেতেন। মেওয়াতের এক জলসা উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন-

জলসার কামিয়াবি ও সফলতার জন্য মেহনতকারীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের দুঃখজনক দৃশ্যকে আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার মজলিসে রূপান্তরের যে মেহনত তোমরা করছো ইনশাআল্লাহ কেয়ামতের দিন সেই মহাসমাবেশে যেখানে পূর্ববর্তী, পরবর্তী সকল জ্বিন, ইনসান, নবী রাসূল ও ফিরেশতাদের জামা'আত উপস্থিত থাকবেন সেখানে তোমাদের এ মহান কীর্তি সর্বসমক্ষে আলোচিত হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দ্বীনের সুখ্যাতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করার তাওফীক দান করুন।

ক্ষমতা লাভের রাজনীতির পূর্বে দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীনের যাবতীয় কাজের মধ্যে হযরত মাওলানা (রহঃ) ঈমান ও আরকানের মেহনত মোজাহাদা এবং দাওয়াত ও তাবলীগকেই অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁর মতে এই দাওয়াত ও মেহনতের মাধ্যমেই সমগ্র দ্বীনকে গ্রহণ করার এবং পূর্ণাংগ শরীয়তের উপর আমল করার সামর্থ্য অর্জিত হয়। তদ্রূপ ইবাদতের বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতা দ্বারা আখলাক ও চরিত্র এবং মুআমালা ও জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা আসে এবং হুকুমত ও রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ পূর্ণ মেহনত মোজাহাদার মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াতের সফলতা দ্বারা ইসলামী রাজনীতির পরিবেশ তৈরী হয়। দাওয়াতের উপর যে রাজনীতির বুনিয়াদ নয় সে রাজনীতি ভিত্তিহীন ও নড়বড়ে ইমারাত তুল্য। তাতে যে কোন মুহূর্তে নেমে আসতে পারে সর্বনাশা ধ্বস।

রাজনীতি বলতে এখানে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি শক্তি ও ক্ষমতাবলে এবং আইন শৃংখলার মাধ্যমে কোন কাজ করানো। পক্ষান্তরে দাওয়াতের অর্থ হলো শুধু তারগীব ও ফাযায়েলের মাধ্যমে কোন জিনিসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টি করা।

মাওলানা (রহঃ)–এর চিন্তায় ইসলামী ইতিহাসের যে সারনির্যাস বিদ্যমান ছিলো তার ভিত্তিতে তিনি এক স্বতন্ত্র চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কয়েক শতাব্দী ধরে উম্মত রাজনৈতিক যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ্যহারা হয়ে আছে। সুতরাং এখন একটা দীর্ঘ সময় পরিপূর্ণ ধৈর্যের সাথে দাওয়াতের উছূল ও তরীকা মোতাবেক কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন, যাতে মুসলমানদের মধ্যে প্রবৃত্তি ও স্বার্থের আকর্ষণ উপেক্ষা করে নিয়ম শৃঙখলা ও আইন কানুনের অধীনে কাজ করার মনোভাব ও যোগ্যতা তৈরী হয়। প্রাথমিক রাজনীতির জন্যও বিরাট পরিমাণ দাওয়াতি প্রস্তুতি প্রয়োজন। দাওয়াতি পর্যায়ে যতবেশী তাড়াহুড়া হবে এবং যে পরিমাণ দুর্বলতা থেকে যাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ খুঁত ও শূন্যতা থেকে যাবে। তেমন রাজনীতি হয়ত অস্তিত্বের মুখই দেখতে পাবে না কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও তার ধ্বংস অবস্যম্ভাবী।

বাস্তব ঘটনাও তাই। খেলাফতে রাশেদার যে শক্তি ও সংহতি এবং

মুসলমানদের সুশৃঙ্খলা ও আনুগত্য রক্ষার যে যোগ্যতা আমরা দেখতে পাই তা ছিলো সেই সুদীর্ঘ দাওয়াতি মেহনতের ফল ও ফসল যা নবুওয়তের প্রথম বছর থেকে শুরু হয়ে খেলাফতে রাশেদা পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে যে সামষ্টিক দুর্বলতা ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছিলো তা ছিলো দাওয়াতের প্রতি অব্যাহত উদাসীনতারই কুফল, যা বনু উমাইয়া ও আব্বাসী খেলাফতকালে উম্মতের মাঝে দেখা দিয়েছিলো।

হযরত হাসান (রাঃ) হযরত হোসায়ন (রাঃ)–কে যে মহামূল্যবান অছিয়ত করেছিলেন তা মাওলানা (রহঃ) প্রায়ই উল্লেখ করতেন। হযরত হাসান (রাঃ) বলেছিলেন, এখন থেকে উম্মতের কাজ দাওয়াতের তরীকায় হবে।

মাওলানা (রহঃ) এমন কোন দল বা জামা'আতে অংশগ্রহণ না করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যেখানে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় নিছক আইন কানুন, প্রশাসনিক কাঠামো ও উর্ধ্বতন–অধস্তন নীতির ভিত্তিতে। কেননা তাঁর মতে বর্তমান অনৈক্য, অস্থিতিশীলতা ও খারাবির মূল কারণ হলো দাওয়াতের ভিত্তিভূমি তৈরীর আগে রাজনীতি শুরু করার এ ভুল কর্মনীতি এবং পশ্চিমা রাজনীতি ও সংগঠনের ভিত্তিতে দ্বীনী কাজ আঞ্জাম দানের চেষ্টা।

পরিবেশের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

যে পবিত্র পরিবেশে হযরত মাওলানা (রহঃ) এতদিন প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সেখানকার দ্বীনী গায়রাত ও ধর্মানুরাগ এবং সুন্নত ও শরীয়ত রক্ষার জযবা ছিলো এমনই প্রবল যে, যে কোন অন্যায় ও অধর্মকে জিন্দা থাকার মুহূর্ত সুযোগ দেয়া এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কল্যাণকর্মের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অপেক্ষা ও বিলম্বের কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। আর সত্য কথা এই যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনমনীয়তা, অবিচলতা ও আপোষহীন মনোভাবের কল্যাণেই হযরত মাওলানার পরিচিত সেই দ্বীনী পরিমণ্ডলে অসংখ্য নেকী ও পূণ্যের সুপ্রচলন ছিলো এবং অসংখ্য অন্যায় ও অধর্ম দাফন হয়েছিলো। বুজুর্গানে দ্বীনের মেহনত মোজাহাদা এবং ত্যাগ ও কোরবানীর বরকতে বহু মুরদা সুন্নত জিন্দা হয়েছিলো। فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَاءِ (আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।)

এই দ্বীনী আত্মসম্মানবোধ ও সুন্নতপ্রেম ছিলো হযরত মাওলানার একান্ত স্বভাবজাত, যা অনুকূল পরিবেশে অধিক পরিপুষ্ট ও সবল হয়েছে মাত্র।

কিন্তু আল্লাহ পাক এ পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের সম্পূর্ণ বিপরীতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে এ সত্য উদ্ভাসিত করেছিলেন যে, প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আলাদা সংগ্রাম সাধনা করা অন্যায় ও অধর্মের মূলোৎপাটনের সঠিক পন্থা নয়। কেননা এভাবে হয়ত সারা জীবনেও একটি মাত্র অন্যায় কর্ম নির্মূল করা সম্ভব হয় না। হলেও তার সুফল স্থানীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে। কখনো আবার নতুন 'অন্যায়' এর জন্ম হয়। অথচ দুনিয়াতে এখনই এতো অসংখ্য অন্যায় কর্ম রয়েছে যে, সারা জীবন ব্যয় করেও সেগুলো সব নির্মূল করা সম্ভব নয়।

হযরত মাওলানার মতে বর্তমান অবস্থায় অন্যায় নির্মূলের সঠিক পন্থা হলো সরাসরি অন্যায়ের বিরোধিতায় লিপ্ত না হয়ে ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করা এবং ন্যায় ও নেকীর বহুল প্রচলনের পিছনে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।

মাওলানা (রহঃ) স্থানীয় পর্যায়ের খণ্ডিত সংস্কার ও সংশোধন প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলতেন, দূর থেকে পরিবেশ পরিবর্তন এবং পুণ্যের প্রসার ঘটাতে ঘটাতে অগ্রসর হও। অন্যায় ও অর্ধম কোন রকম বাদ প্রতিবাদ ছাড়াই স্বস্থানে দুর্বল ও নির্জীব হয়ে যাবে এবং এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পুণ্যের যত প্রসার ঘটবে পাপ ততই সংকুচিত ও বিলুপ্ত হতে থাকবে।

হযরত মাওলানার বিশেষ দীক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক বিশুদ্ধস্বভাব মেওয়াতি একবার আমাকে এক চমকপ্রদ উদাহরণ শোনালেন। বললেন, একদিন আমি ঠাণ্ডা পানি স্প্রে করছিলাম। (আবহাওয়া শীতল করার উদ্দেশ্যে) চারদিকে স্প্রে করলাম। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সে জায়গাটা শুকনোই থেকে গেলো। কিন্তু দেখা গেলো চারদিক থেকে শীতল বাতাস আসার কারণে শুকনো জায়গাটা আপনাতেই শীতল হয়ে গেলো, তখন এ সত্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, যদি আমি দাঁড়ানোর স্থানটি শুধু ভিজাতাম আর চারপাশটা শুকনো থেকে যেতো তাহলে সে জায়গাটাও ঠান্ডা হতো না। এ থেকেই মাওলানার উছূল ও মূলনীতি আমার পুরোপুরি বুঝে এসে গেলো।

দ্বীনী পরিবেশ ও দ্বীনী প্রভাব বঞ্চিত একটি গ্রামে দ্বীনের প্রভাব ও দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একই কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে এক পত্রে হযরত মাওলানা (রহঃ) লিখেছেন–

তারা যখন দাওয়াতের না–কদরি করছে তখন তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা ঠিক নয়। বরং তাদের আশেপাশে দু'চার ক্রোশ দূরের বস্তিগুলোতে গিয়ে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য লোকদের অবস্থা যাচাই করে দেখো এবং তাদেরকে জামা'আত নিয়ে সেখানে যাওয়ার তাকীদ করো এবং এই ব্যাপক ও আম মেহনতের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে থাকো। এভাবে তাদের মাঝে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা ফলপ্রসূ হবে। নচেৎ পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। মানুষ সব সময় পরিবেশের প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। এটাই আমাদের তাবলীগী মেহনতের মূলকথা। মানুষ সব সময় তার চারপাশের পরিবেশ ও চলতি হাওয়া দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। পরিবেশের বিরুদ্ধে কাউকে স্থির করে রাখা সম্ভব নয়। এজন্য সাধারণ পরিবেশ ও আম হাওয়া পরিবর্তনের পিছনেই সিংহভাগ চেষ্টা নিয়োজিত রাখা উচিত।

মাওলানা (রহঃ) আরো মনে করতেন যে, দ্বীনের মৌলিক ও বুনিয়াদি মেহনত এবং দ্বীনের সর্বসম্মত বিষয়গুলোর দাওয়াত ও প্রচার প্রসারই হলো এ যামানার সমস্ত ফেতনা ও ব্যাধির আসল চিকিৎসা এবং সুন্নতের পুনরুজ্জীবন এবং সকল প্রকার দ্বীনী কল্যাণ ও বরকতের প্রসার লাভের একমাত্র পথ। তাঁর মতে সঠিক কর্মবিন্যাস এই যে, মুসলমানের পুরো যিন্দেগীকে দ্বীন ও ঈমানের ছায়াতলে আনার চেষ্টা করা হবে যাতে জীবনের গতিধারা নিজে নিজেই সঠিক খাতে প্রবাহিত হয়ে যায়। জনৈক বন্ধুকে এক পত্রে তিনি বলেন–

নিজের কর্মোদ্যম ও কর্মশক্তিকে আসল দ্বীনের জন্য সমুন্নত ও গতিশীল রাখো। তাহলে হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহ এতো প্রফুল্ল হবেন যে, আমাদের কল্পনাও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এবং আল্লাহ চাহে তো এমন সুস্পষ্ট উন্নতি দেখতে পাবে যে, কোন শক্তিই এখন তা অনুভব করতে পারে না।

অন্য এক পত্রে বলেন–

আমার বন্ধুগণ! এ পথে মেহনত করলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজারো সুন্নত জিন্দা হবে এবং প্রতিটি সুন্নতের জন্য শত শহীদের ছাওয়াব লাভ হবে। তোমরাই চিন্তা করে দেখো যে, একজন শহীদের দরজা ও মর্তবা কত বড়!

সম্ভবতঃ কর্মজীবী ও পেশাজীবী মুসলমানদের দ্বীনী সংশোধন ও উন্নতির প্রয়াসী ও প্রত্যাশী ছিলেন, এমন এক বন্ধুকে তিনি লেখেন–

অধমের দৃষ্টিতে যে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য আপনাকে ডেকেছিলাম এবং নিজেও সচেষ্ট আছি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দুনিয়ার সকল মুসলমানের জীবনে শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা–বাণিজ্য সহ যাবতীয় কাজকর্মকে দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত করা। তাবলীগের আলিফ বা (অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর) শুরু হয় ইবাদাত দ্বারা। আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ ছাড়া সামাজিক জীবনে ইসলামী আহকামের পাবন্দী হতে পারে না। সুতরাং নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রাণ লোকদের পরিকল্পনা হওয়া উচিত, দুনিয়াতে তাবলীগের ক, খ তথা ইবাদাতের প্রচার প্রসারের মেহনত শুরু করার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। পারস্পরিক আচার ব্যবহার ও সামাজিক জীবনের সংশোধনের মাধ্যমেই পূর্ণাংগ রাজনীতিতে উত্তরণ হতে পারে। তাছাড়া কোন বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার অর্থ 'দ্বীনী দরদ ব্যথা' রূপী আপন মূল্যবান সম্পদকে শয়তানের হাওয়ালা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی

کین راہ کہ می روی بتر کستان است

হে বেদুঈন আমার ভয় হয় যে, তুমি কাবা ঘরে পৌঁছতে পারবে না। কেননা যে পথ তুমি ধরেছো তা তুর্কিস্তানের পথ; কাবামুখী পথ নয়।

ইলম ও যিকিরের সার্বজনীন চর্চা

এ আন্দোলনের মূলনীতিমালায় ইলম ও যিকির শব্দটি বারবার এসেছে। মাওলানা (রহঃ) মুসলমানদেরকে এ দু'টি জিনিসের ব্যাপক দাওয়াত দিতেন। তবে তাঁর গবেষণালব্ধ পরিভাষায় ইলম ও যিকিরের রয়েছে বিশেষ অর্থ। তাই

শব্দ দু'টির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা তাঁর সংস্কারবাদী দাওয়াতী আন্দোলনের এটা হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ভারতবর্ষে এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বে সুদীর্ঘকাল থেকে ইলম ও যিকিরের বিশেষ দু'টি পরিভাষা ও দু'টি সুপরিচিত পন্থা প্রচলিত রয়েছে। যিকিরের জন্য রয়েছে নির্ধারিত অযিফা ও দু'আ দুরূদ এবং ইলমের জন্য রয়েছে মাদরাসার কয়েক বছর মেয়াদী পাঠ্যসূচীর এক বিশেষ ব্যবস্থা। যিকির ও ইলম হাছিলের উপায় ও পন্থা ধীরে ধীরে এই দু'টি বৃত্তে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে গেলো যে, এর বাইরে তৃতীয় কোন পথে ইলম ও যিকির হাছিল হওয়াকে প্রায় অসম্ভব মনে করা হতে লাগলো।

হযরত মাওলানার দাওয়াত ও আন্দোলনের বৈপ্লবিক ও সংস্কারবাদী চিন্তাধারার অন্যতম উপাদান এই যে, এ দু'টি ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নিঃসন্দেহে অতীব প্রয়োজনীয় এবং অশেষ কল্যাণ ও বরকতের উৎস। কিন্তু এটা হচ্ছে ইলম ও যিকিরের বিশেষ উচ্চস্তর। যার সাহায্যে উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উদ্যমী ও সাহসী ছাত্ররাই শুধু উচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে। কিন্তু তা উম্মতের জন্য সাধারণ ও সার্বজনীন পথ হতে পারে না এবং এ পথে সংসার নিগড়ে আবদ্ধ ও সর্বদা কর্মব্যস্ত উম্মতের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ অল্প সময়ে ইলম ও যিকিরের কল্যাণ, উপকারিতা ও উদ্দেশ্য হাছিল করতে পারে না বরং সাধারণ উম্মতের জন্য ইলম ও যিকির হাছিলের আসল ও স্বভাবসম্মত পন্থা সেটাই যা প্রথম কল্যাণ শতাব্দীতে ছিলো।

মাওলানা (রহঃ) প্রথম কল্যাণ–শতাব্দীর মুসলমানদের জীবন পদ্ধতি অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি ছাহাবা কেরামের আখলাক, চরিত্র ও জীবনচরিত আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। তাঁদের হালাত ও ঘটনাবলী অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনতেন। ছাহাবা–চরিত্রের গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়ের উপর যেমন গভীর দৃষ্টি তাঁর ছিলো আজ পর্যন্ত এর কোন নজির চোখে পড়েনি। তাঁর দরদপূর্ণ চাহিদা ও আসল স্বপ্ন এটাই ছিলো যে, ছাহাবাওয়ালা জীবন পদ্ধতি এবং ইলম ও যিকির হাছিলের ছাহাবাওয়ালা তরীকা কিভাবে যিন্দা করা যায়। যিকির সম্পর্কে হযরত মাওলানা (রহঃ) বলতেন, গাফলত ও

উদাসীনতা তো হারাম। তবে যিকির মুখের শব্দোচ্চারণের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে যে সকল আহকাম ও বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, চিন্তা মনোযোগের সাথে কাজকর্মগুলো সেই আহকাম ও বিধান মুতাবেক আঞ্জাম দেয়াও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে মানুষের গোটা জীবন ও সমাজক্ষেত্র যিকিরের রূপ ধারণ করতে পারে। তারপর এ ক্ষেত্রে 'ঈমান ও ইহতিসাব' এর গুণকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাজ এবং আসল কাজ। কেননা মুসলমানদের মধ্যে আমল ইবাদাতের অতটা কমতি নেই যতটা কমতি রয়েছে ঈমান ও ইহতিসাবের। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে শুধুমাত্র তাঁর কাছে প্রতিদান লাভের নিয়তে আমল করার মনোভাবের বড়ই অভাব।[১]

হযরত মাওলানার দৃষ্টিতে দ্বীনী মেহনত মোজাহাদার সাথে মৌখিক যিকিরও যুক্ত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ছাহাবা কেরামের যিন্দেগীর গঠন ও নমুনাও এ রূপ ছিলো যে, দ্বীনের উন্নতির জন্য পরিচালিত মেহনত মোজাহাদা এবং দাওয়াত ও জেহাদের সাথে যিকিরেরও পাবন্দী তাঁরা করতেন। এখনো এ তরীকাই অনুসৃত হওয়া উচিত। এক পত্রে তিনি বলেন–

আল্লাহ পাকের পূর্ণ নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের সবচে' সহজ ও কার্যকর মাধ্যম মনে করে যিকিরে মশগুল হোন এবং সিজদাবনত হয়ে সদা দু'আয় মগ্ন থাকুন। এভাবে সার্বক্ষণিক দু'আ যিকিরে মশগুল থেকে এ কাজ করতে থাকুন এবং অন্যদেরকে এভাবে কাজ করার তালিম দিতে থাকুন। অধিক দু'আ যিকিরই হলো এ কাজের মূল প্রাণ। একজন বিশিষ্ট কর্মীর উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন–

তোমার নির্জন মুহূর্তগুলোকে যিকির দ্বারা এবং সমাগম মুহূর্তগুলোকে অন্তরে আল্লাহর নিরংকুশ বড়ত্বের বিশ্বাস পোষণ করে ইখলাছের সাথে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত দ্বারা আবাদ ও মশগুল রাখো। নিজেকে ক্লান্ত শ্রান্তবদন করে রেখো না। হাসিখুশী, প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল মানুষ আল্লাহর অতি

১। আমাদের অধিকাংশ আমলই বরবাদ হয়ে যায় 'রিয়ার কারণে'। রিয়া অর্থ, মানুষকে সন্তুষ্ট করা ও মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করা।

প্রিয়। তদ্রূপ আখেরাতের ক্ষেত্রে চিন্তাক্লিষ্টতা আল্লাহর খুব পছন্দ। চিন্তাক্লিষ্টতাই ছিলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অবস্থা।

অন্য এক পত্রে তিনি বলেন–

প্রত্যেক ওয়াক্তের নিজস্ব মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণিত ফাযায়েল জেনে বিশ্বাস করে আমল করাই হলো এর তরীকা। হাদীছে প্রত্যেক ওয়াক্তের আলাদা আলাদা ফযিলত বর্ণিত আছে। তদ্রূপ প্রত্যেক ওয়াক্তের রয়েছে আলাদা বরকত ও নূর। আমাদের মতো আম লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায আদায় করার সময় এই দরখাস্ত করে নেবো যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের যে সমস্ত আনওয়ার ও বারাকাত রয়েছে আল্লাহ যেন সেগুলোর হিসসা আমাদের দান করেন। ইলম সম্পর্কেও হযরত মাওলানার চিন্তা গবেষণা এই ছিলো যে, দ্বীনের ইলম ও শিক্ষণ ব্যবস্থাকে কিতাবের পাতায় ও মাদরাসার সীমানায় আবদ্ধ করাটা হলো পরবর্তী যুগের তরীকা যা প্রকৃতপক্ষে উম্মতের বিরাট অংশকে দ্বীনী ইলমের মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করারই নামান্তর। এ বিশেষ পদ্ধতিতে উম্মতের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশই শুধু ইলম হাছিল করার সুযোগ পাবে। আর সেটাও হবে বাস্তব জীবনে প্রতিফলনবিহীন তত্ত্বগত ও চিন্তাগত ইলম। পক্ষান্তরে দ্বীন শেখা ও শেখানোর স্বাভাবিক ও সার্বজনীন তরীকা, যার দ্বারা লক্ষ মানুষ বিশেষ সাজসরঞ্জাম ছাড়া সামান্য সময়ে দ্বীনের ইলম শুধু নয় বরং স্বয়ং দ্বীনও হাছিল করতে পারে, সেটা হলো সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ লাভ এবং আপন পরিবেশ থেকে বের হয়ে একসাথে আমল ও মেহনতে অংশগ্রহণ। কোন ভাষা ও সংস্কৃতি যেমন সংশ্লিষ্ট মানুষের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য দ্বারাই শুধু আয়ত্ব করা যায় এবং সেটাই ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার স্বভাবপদ্ধতি তদ্রূপ দ্বীনের বিশুদ্ধ ইলমও দ্বীনদারের সংস্পর্শ, সান্নিধ্য, উঠাবসা ও মেলামেশা দ্বারাই হাছিল হতে পারে এবং এটাই হলো দ্বীনের ইলম হাছিল করার স্বভাবপন্থা। কেননা দ্বীনী ইলমের এমন অনেক বিষয় আছে যা কলমের নাগালের বাইরে। দ্বীন একটি সচল, গতিশীল ও জীবন্ত বিষয়। আর কিতাব হলো নিষ্প্রাণ লেখা ও রেখার সমষ্টি। 'নিষ্প্রাণ' কিছু থেকে 'সপ্রাণ' কিছু লাভ হওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। দ্বীনের কিছু অংশের সম্পর্ক হলো অংগ প্রত্যংগের সাথে। সেগুলো অংগ প্রত্যংগের সঞ্চালন দ্বারাই

হাছিল হবে। কিছু অংশের সম্পর্ক হলো হৃদয়ের সাথে। সেগুলো হৃদয় থেকে হৃদয়েই 'পরিবাহিত' হতে পারে। আর কিছু অংশের সম্পর্ক হলো চিন্তা ও মস্তিষ্কের সাথে। সেগুলো অবশ্য কিতাব থেকে হাছিল হতে পারে। এ সুক্ষ্ম বিষয়টা একবার তিনি এভাবে বয়ান করেছেন--

মানুষের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগের স্বতন্ত্র ও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। চোখ দিয়ে আমরা দেখার কাজ করি। চোখ এ দায়িত্ব পালনে প্রকৃতিগতভাবে বাধ্য। তার দ্বারা শ্রবণের কাজ নেয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ বহিঃপরিবেশ সম্পর্কে অনুভব করা হলো হৃদয়ের কাজ। মস্তিষ্কের কাজ হলো হৃদয়ের অনুভবকে বিন্যস্ত করণ। মস্তিষ্ক হলো হৃদয়ের অনুগত। আর হৃদয়ের অনুভব আসে পরিবেশ থেকে। মস্তিষ্কের বিন্যস্তকরণেরই নাম হলো ইলম। মস্তিষ্ক তখনই নির্ভুলভাবে বিন্যস্তকরণে সক্ষম হবে, অর্থাৎ ইলম হাছিল করতে পারবে যখন হৃদয় সঠিকভাবে অনুভব করবে। আর এ অনুভব জড় ও নিষ্প্রাণ কিতাব থেকে অর্জিত হতে পারে না। এটা তো হবে আমলের মাধ্যমে। আমি এ কথা বলি না যে, মাদরাসা গুলো বন্ধ করে দেয়া হোক। আমার কথা শুধু এই যে মাদরাসার তালীম হলো উচ্চস্তরের সম্পূরক ও পূর্ণতাদায়ক। প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য এটা উপযোগী নয়।

ইলম ও তালীম সম্পর্কে এ এমন এক সারগর্ভ, জ্ঞানপূর্ণ ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য যাকে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা গবেষণার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করা ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য। মাওলানার দাওয়াতের এই তালীম ও শিক্ষাবিষয়ক অংশটুকু এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক এক চিন্তাধারা, যা থেকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ইলম চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিশেষ উপকৃত হতে পারতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মাওলানার দাওয়াত ও চিন্তা ফিকিরের এ অংশটিকেই বোঝার সবচে' কম চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ দিকেই সবচে' কম মনোযোগ আরোপ করা হয়েছে।

ইলমের উন্নতির জন্য মাওলানার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় শর্ত ছিলো এই–

মনে রেখো, কোন আলিম ইলমের ক্ষেত্রে ততক্ষণ উন্নতি করতে পারে না যতক্ষন না সে যা কিছু শিখেছে তা ঐ সব লোকের কাছে পৌঁছায়; যারা তার চেয়ে কম জানে বিশেষতঃ যারা (অজ্ঞতার কারণে) কুফুরির সীমায় পৌঁছে

গেছে। আমার এ বক্তব্য হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে লব্ধ।

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

যে অনুগ্রহ করবে না সে অনুগৃহীত হবে না।

কুফুরের সীমায় যারা উপণীত তাদের পর্যন্ত ইলম পৌঁছানোই হলো ইলমের আসল পূর্ণাংগতা এবং আমাদের আসল কর্তব্য। আর মুর্খ জাহিল মুসলমানদের পর্যন্ত ইলম পৌঁছানো হলো তাদের রোগের আসল ইলাজ।

এ সত্য হযরত মাওলানা (রহঃ) অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিগত যুগের প্রতিটি সময়পর্বের যেমন আলাদা আলাদা ব্যাধি ও ফিতনা ছিলো। তেমনি এ যুগের বিশেষ ফিতনা ও ব্যাধি হলো দুনিয়ার প্রতি প্রবল আসক্তি ও নিমগ্নতা এবং আপন ধর্মীয় অবস্থার উপর সন্তুষ্টি ও নির্লিপ্ততা। বস্তুতঃ দুনিয়ার মহাকর্মব্যস্ততা আমাদের জীবনে আজ মুহূর্তেরও অবকাশ রাখেনি। এ রকমারি ব্যস্ততা ও বিচিত্র সম্পর্কই হচ্ছে এ যুগের ارباب من دون الله বা নতুন উপাস্য দেবতা যা অন্য কিছুতে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক এবং অন্য কিছুর প্রভাব গ্রহণ করুক তা বরদাশত করতে রাজি নয়। তাই মাওলানা (রহঃ) অত্যন্ত জোরদারভাবে এ দাওয়াত পেশ করলেন যে, দ্বীন শিক্ষা করার জন্য এবং দ্বীনের প্রভাব গ্রহণের জন্য (সাময়িকভাবে) আপন পরিবেশ থেকে আলাদা হয়ে ঐ সকল নতুন উপাস্য দেবতার খপ্পর থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা দুনিয়ার রকমারি 'ব্যস্ততা ও সম্পর্ক' হৃদয়ের সাথে এমনভাবে সেঁটে গেছে যে, দ্বীন, ঈমান ও কালিমার হাকীকত এবং আমলের প্রভাব হৃদয়ে প্রবেশের জন্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন বাতায়ন পথও খোলা পায় না। বরং হৃদয়ের বহিরাবরণের সাথে সংঘর্ষিত হয়েই তা ফেরত আসে।

মাওলানার মতে সকল শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষা করার জন্য এবং নিজেদের জীবনে দ্বীনদারি আনার জন্য, এমনকি দ্বীনদার ও আলিমদেরও বর্তমান স্তর থেকে উন্নতি লাভের জন্য নিজ নিজ ব্যস্ততা থেকে কিছু সময় বের করা এবং সেই সময়টুকুর জন্য নিজেকে ফারেগ করে নেওয়া খুবই জরুরী।

মাওলানার মতে ইলমে দ্বীন হাছিল করা এবং দ্বীনের সাথে সম্পর্ক করা মুসলমানদের যিন্দেগীর অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ছাড়া মুসলমানদের জীবন তার আসল ও স্বাভাবিক রূপাকৃতি লাভ করতে পারে না। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন অবস্থায় শুধু 'উপার্জন ও ভোজন' মুসলমানের জীবন হতে পারে না। তদ্রূপ দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ থেকেও তা একেবারে খালি হতে পারে না। তার জীবনে দাওয়াত ও তাবলীগের এবং দ্বীনের জন্য সক্রিয় মেহনত মোজাহাদার কিছু না কিছু হিসসা অবশ্যই থাকতে হবে।

ছাহাবা কেরামের জীবনে ইলম, যিকির, তাবলীগ ও দ্বীনের খিদমত এবং জীবন-জীবিকার মেহনত এ চারটি জিনিসের সাধারণভাবে একত্র সমাবেশ ছিলো। বর্তমানে মুসলমানদের জীবনে প্রথম তিনটির স্থানও চতুর্থটি দখল করে নিয়েছে এবং জীবনের পূর্ণ ব্যাপ্তিকে এমনভাবে বেষ্টন করে নিয়েছে যে, সেখানে অন্য কিছুর কোন অবকাশ আর নেই।

তবে বর্তমান অবস্থা ও সুরতেহালের সংশোধনের পথ ও পন্থা কিন্তু এটা নয় যে, সেই হারানো গুণগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য জীবনের সকল কর্মকোলাহল ত্যাগ করার এবং জীবনসর্বস্ব সঁপে দেয়ার দাওয়াত দেয়া হবে। বরং ছাহাবা কেরামের জীবন পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাই হবে সঠিক কর্মপন্থা। কেননা এটাই সহজতম ও সর্বোত্তম পথ এবং দ্বীন ও শরীয়তের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ পন্থা। অর্থাৎ যাবতীয় দায়দায়িত্ব ও কর্মব্যস্ততা সম্পূর্ণ বর্জণে বাধ্য না করে বরং জীবনের কোলাহল ও ব্যস্ততার মাঝে দ্বীনের জন্য 'সময়' বের করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং সে সময়টুকুর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং তা থেকে যথাসম্ভব ঐ সকল ফলাফল অর্জনে পূর্ণ সচেষ্ট হতে হবে যা দ্বীনী তালীমের আসল উদ্দেশ্য।

এর উপায় এই যে, পুরো সময়টা দ্বীনদার ও দ্বীনসন্ধানী লোকদের সান্নিধ্যে কাটাবে। কিছু শিখবে, কিছু শেখাবে। দ্বীনী পরিবেশ পরিমণ্ডলে চোখ, কান ও অন্যান্য অনুভব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনকে পূর্ণাংগ রূপে গ্রহণ করবে। দ্বীনের পূর্ণ রূপ এবং দ্বীনদারদের সকাল সন্ধ্যার বাস্তব জীবন এমনভাবে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করবে যেমন কোন পর্যটক নতুন শহরের সবকিছু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বিপুল ঔৎসুক্য নিয়ে অবলোকন করে থাকে। সেই সাথে এর

পূর্ণ 'সুপ্রভাব' নিজের মাঝে এমনভাবে শোষণ করে নিতে তৎপর থাকবে যেমন জলবায়ুর সাহায্যে কোন্ 'ভূমির' প্রভাব গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেখানে দ্বীনের কোন খণ্ডাংশের অধ্যয়ন যেন না হয়। বরং সকল অংশের পূর্ণাংগ অধ্যয়ন যেন হয় সেদিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সুতরাং ইবাদত ও ফরয বন্দেগীর হুকুম আহকাম ও আদব যেমন শিক্ষা করবে তেমনি সামাজিক জীবনাচার তথা আখলাক ও চরিত্র, কথার্বাতা ও আচার আচরণ, সেবা ও খেদমত এবং সান্নিধ্য ও সাহচর্যের ইসলামী তরীকা ও বিধান এবং শোয়া, খাওয়া ও উঠা-বসার আদব ও মাসায়েলও পূর্ণ গুরুত্বের সাথে শিখবে। শেখার সাথে পালনও করবে। সর্বোপরি দ্বীনের আবেগ ও জযবা এবং রূহ ও প্রাণও অর্জন করতে সচেষ্ট হবে।

এ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হলো, একই উদ্দেশ্যে সমবেত দ্বীনদার ও আলিমদের সংস্পর্শে কিংবা কমপক্ষে দ্বীন ও ইলম পিপাসুদের সাহচর্যে সময় কাটানো এবং ছেড়ে আসা পরিবেশের ধরাছোঁয়া ও চিন্তা কল্পনা থেকে যথাসম্ভব নিজেকে মুক্ত রাখা। এখানে এ পরিবেশে এতটা সময় অবশ্যই কাটাবে যাতে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল পর্যায়ের সকল অবস্থা তার সামনে এসে যায় এবং সে সম্পর্কে শরীয়তের আদব ও আহকাম যথাসময়ে যথাক্ষেত্রে হাতে কলমে শিখে নেয়া সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কাজ এই যে, এ সময় ফাযায়েল ও মাসায়েল নিয়মিত আলোচনা করবে। ফাযায়েল হলো দ্বীনী যিন্দেগীর রূহ ও প্রাণশক্তি। আর মাসায়েল হলো তার বিধান কাঠামো। দু'টোই জরুরী ও অপরিহার্য। তবে প্রাণ ও দেহের মাঝে যে পার্থক্য ও সম্পর্ক ঐ দুইয়ের মাঝেও সেই পার্থক্য ও সম্পর্ক।

তদ্রূপ ছাহাবা কেরামের যিন্দেগীর যে সকল হালাত ও ঘটনা দ্বীনী জযবা ও স্পৃহা সৃষ্টি করে এবং তাঁদের পুণ্যজীবন ও মহান আদর্শ অনুসরণের আগ্রহ জাগ্রত করে সেগুলোও নিয়মিত আলোচনা করবে।

হযরত মাওলানা (রহঃ) তাঁর তাবলীগী সফরগুলোতে এ সকল বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙক্ষা ছিলো, দ্বীন শিক্ষার এই যে সাধারণ রাস্তা যার মাধ্যমে মাদরাসার বিপুল ব্যয় ও বিপুল

আয়োজন ছাড়াই উম্মতের লক্ষ লক্ষ কর্মব্যস্ত মানুষ জরুরী দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের সর্বোত্তম ফলাফল [১] হাছিল করতে পারে সে রাস্তা যেন সকল শ্রেণীর সকল মানুষের জন্য খুলে যায় এবং তার আম রেওয়াজ শুরু হয়ে যায়। এক পত্রে তিনি বলেন–

যদি এই জীবন পদ্ধতির সুপ্রচলন শুরু হয়ে যায় এবং কিছু প্রাণ বির্সজন দিয়েও যদি এ পথ খুলে যায় তাহলে জীবনের কর্মকোলাহলে আবদ্ধ উম্মতে মোহম্মদীর অতিব্যস্ত লোকদের জন্য হিদায়াতের পূর্ণ হিস্সা লাভের রুদ্ধ পথ স্থায়ী ভাবে পুনরুদ্ধার হবে।

অন্য এক পত্রে তিনি বলেন–

মাদরাসায় যেভাবে দ্বীন ও ইলম শিক্ষা করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করা হয় তেমনিভাবে অত্যন্ত দৃঢ় চিত্ততার সাথে এ পদ্ধতিতে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য নিজেদের পক্ষ হতে সময় ফারেগ করার প্রচলন শুরু করুন এবং অন্যদেরকেও দাওয়াত দিন। এজন্য উদ্যম ও সাহস অতুচ্ছ ও অটুট রাখার অশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

বাস্তব সত্য এই যে, বর্তমান ব্যস্তযুগে–যা সম্ভবতঃ কর্মকোলাহল ও কর্মনিগ্নতার বিচারে মানবেতিহাসের বিশিষ্টতম যুগ– দ্বীন শিক্ষার এর চে' সার্বজনীন ও বাস্তবানুগ আর কোন উপায় ও পন্থা আমাদের নজরে পড়ে না। আপনিই বলুন না, এর চে' সহজ উপায় আর কি হতে পারে যে, একজন মানুষ নিয়মিতভাবে কিছুদিন পরপর নিজের কর্মব্যস্ততা থেকে সময় বের করে নিজেকে সম্পূর্ণ অবসর করে দ্বীনী সমাবেশে, দ্বীনী পরিবেশে কোন তাবলীগী কাফেলার সাহচর্যে অবস্থান করবে এবং সেখানে নির্দিষ্ট উছূল ও নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষণ, শিক্ষাদান এবং যিকির ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করবে?

বস্তুতঃ এ ধরণের তাবলীগী সফরে দ্বীন শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন, ও আত্মসংশোধনের ক্ষেত্রে যে বরকত ও কল্যাণ লাভ হয় এবং হৃদয় ও

১। যেগুলো মাদরাসার পরিবেশেও এখন হাছিল হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

মস্তিষ্কে এর যে শুভ প্রভাব পড়ে তা লেখায় প্রকাশ করা মুশকিল। অনুভব ও আবেগ তো কোন লেখায় ফুটে উঠতে পারে না মোটেই।

আত্মত্যাগ, সাথী সংগীদের সেবা ও খেদমত, অন্যের হক আদায়, সামাজিক সদাচার, দল পরিচালনা ও অন্যান্য সেবামূলক দায়িত্ব পালন, দায়িত্ববোধ, কর্মসচেতনতা এবং বিভিন্ন স্বভাব ও মনমেযাজের মানুষের সাথে সহাবস্থানের সহনশীল মানসিকতা ইত্যাদি হচ্ছে ইসলামী যিন্দেগীর এমন সব ভুলে যাওয়া অধ্যায় যার আহকাম ও বিধান আমরা শুধু কোরআন, হাদীছ ও ফেকাহর কিতাবে পড়ে থাকি এবং যার ঘটনাবলী সীরাত ও ইতিহাস থেকে জেনে থাকি। কিন্তু বহুকাল থেকে আমাদের শহর ও নগর জীবনের ধারা ও প্রকৃতি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, উপরোল্লেখিত ইসলামী জীবন বৈশিষ্ট্যের কোন কোনটির বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়ত সারা জীবনেও হয়ে উঠে না। দৈবাৎ এ ধরণের কোন অবস্থার সম্মুখীন হলে আমরা সে ক্ষেত্রে লজ্জাজনক ব্যর্থতার পরিচয় দেই। অথচ কখনো কখনো একটি মাত্র তাবলীগী সফরে উল্লেখিত সকল কিংবা অধিকাংশ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ এসে যায় এবং সেগুলোর বাস্তব ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা হয়ে যায়।

তাছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বীনের প্রয়োগ ও ব্যবহার, বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের সাথে আচরণ ও মু'আমালা, সচ্চরিত্র আলিম ওলামা ও ধর্মপ্রাণ লোকদের সাহচর্য এবং সীরাতে নববী ও ছাহাবা–চরিত নিয়মিত অধ্যয়ন করার দ্বারা দ্বীনী হিকমত ও প্রজ্ঞা, সুচারু সাধারণ জ্ঞান ও মার্জিত রুচি অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং মানুষের অনুভব ও অনুভূতি এবং বোধ ও সংবেদনশীলতার উৎকর্ষ ঘটে থাকে। আমার বহু বন্ধু তাদের সফরসংগীদের মাঝে এ ধরণের উন্নতি ও উৎকর্ষ অনুভব করেছেন এবং বিভিন্ন পত্রে তা উল্লেখও করেছেন।

এ ধরণের তাবলীগী সফরে শরীক হওয়ার সুযোগ যাদের কখনো হয়নি তাদের পক্ষে এর বিবিধ কল্যাণ ও সুফল পুরোপুরি আন্দায করা খুবই মুশকিল। তবে ভাসা ভাসা ও সাধারণ একটা ধারণা দেয়ার জন্য একটি মামুলি তাবলীগী সফরের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী জনৈক গ্রাজুয়েট বন্ধুর পত্র থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। ব্যক্তিবর্গের নাম ইচ্ছা করেই উহ্য রাখা হয়েছে।

চৌঠা নভেম্বর রোজ শনিবার দুপুর তিনটায় জামা'আত 'খড়কপুর' রওয়ানা

১৯–

হলো।....... জামআতের আমীর নির্বাচিত হলেন, জামা'আতের সদস্য সংখ্যা ছিলো বাইশ। এতে একটি আলাদা জামা'আত ছাড়াও অন্যান্য এলাকা ও জামা'আতের প্রতিনিধিরাও শামিল ছিলেন। দশজন আগেও একবার তাবলীগী সফর করেছিলেন! আর অবশিষ্ট বারজনের এটাই হলো প্রথম অভিজ্ঞতা।

'খড়কপুর' হলো কলকাতা থেকে ৭২ মাইল দূরবর্তী এলাকা। রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে, তাও আবার বোম্বে মেইলের তৃতীয় শ্রেণী (যুদ্ধের সময়) পুরো জামা'আতের তাতে উঠতে পারা তারপর আবার শান্তি মতো সকলের জায়গা হয়ে যাওয়া অবশ্যই এ কাজের বিশেষ বরকত।

মাগরিবের কিছু আগে খড়কপুর পৌঁছা হলো। প্লাটফর্মে মাগরিবের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা হলো। নামাযের পর জামা'আত শহরের দিকে রওয়ানা হলো। শহরে প্রবেশের মুহূর্তে নিয়ম মতো দু'আ করা হলো। জামে মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির কাছ থেকে মসজিদে থাকার অনুমতি আগেই সংগ্রহ করা হয়েছিলো। খানার ইন্তিজামের দায়িত্ব .... এর হাতে সোপর্দ ছিলো। পুরো জামা'আত এক সাথে খানা খেলো। এশার নামাযের পর ১০/১৫ মিনিট সংক্ষিপ্ত ভাষায় জামা'আতের মাকছাদ বয়ান করা হলো এবং উপস্থিত লোকদেরকে গাশতে শামিল হওয়ার দাওয়াত দেয়া হলো। শোয়ার পূর্বে পুরো জামআত হিকায়াতে ছাহাবা থেকে কয়েক পৃষ্ঠা শ্রবণ করলো। তাহাজ্জুদের নামাযে জামা'আতের অধিকাংশ সদস্য শামিল হলো। ফজরের পর অযিফা ও ইশরাক থেকে ফারেগ হয়ে জামা'আত একসাথে নাশতা করলো। নাশতার পর সাড়ে বারটা পর্যন্ত তালীমের সিলসিলা অব্যাহত থাকলো। প্রথমতঃ আমি আল ফোরকান থেকে মাওলানা মঞ্জুর আহমদ নোমানী লিখিত প্রবন্ধ পড়ে শোনালাম। প্রবন্ধটি আল ফোরকান পত্রিকার জুমাদাল উলা ও উখরার দু'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো এবং তাতে জামা'আতের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত সম্পর্কিত পর্যাপ্ত মালমশলা ছিলো।

এরপর হিকায়াতে ছাহাবা থেকে কিছু পড়ে শোনানো হলো। আমাদের সাথে .... এর এক ক্বারী ছাহেব ছিলেন। তিনি প্রত্যেকের সুরাতুল ফাতেহা শুনলেন এবং ভুলশুদ্ধ করলেন। এরপর ফিকহর কিতাব থেকে অযুর ফরয, সুন্নত, মুসতাহাব বুঝিয়ে মুখস্থ করানো হলো। এরপর পালাক্রমে জামা'আতের

কয়েকজনের কাছ থেকে ছয় নম্বর (দাওয়াত ও তাবলীগের ছয়টি মৌলিক নীতি বা উছূল) শোনা হলো, সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও বলা হলো। এরপর আমি এবং আমীর ছাহেব আমাদের দীল্লী ও মেওয়াত সফরের হালাত বয়ান করলাম। এই সমগ্র কার্যক্রমে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা সময় ব্যয় হলো। ইতিমধ্যে খানার সময় হয়ে গেলো এবং খানা খাওয়া হলো।

বাদ যোহর মসজিদে বেশ বড়সড় সমাগম হয়ে গেলো। জলসায় এক সংক্ষিপ্ত বয়ানে আমি গাশতের নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করলাম। এরপর জামা'আত গাশতে রওয়ানা হয়ে গেলো। মুতাকাল্লিমের দায়িত্ব ছিলো .... এর উপর। স্থানীয় বহু সাথীও জামা'আতের সাথে যোগ দিলেন। আলহামদু লিল্লাহ, সবখানে আমাদের তাবলীগ প্রত্যাশার চেয়ে বেশী কামিয়াব হলো। সকল মুসলমান ভাই অত্যন্ত শান্তভাবে আমাদের কথা শুনেছেন। গাশত করতে করতে অন্য এক মহল্লায় চলে গিয়েছিলাম। আছরের নামায সেখানকার মসজিদে পড়া হলো। নামাযের পর সংক্ষিপ্ত বয়ানে তাদেরকে মেওয়াতের ঈমানী ইনকেলাব ও বিপ্লব সম্পর্কে অবহিত করা হলো। মসজিদের ইমাম ছাহেবের সহযোগিতায় এক জামা'আত তাশকীল করা হলো। নব গঠিত জামা'আতকে দাওয়াত ও তাবলীগের নমুনা দেখিয়ে মাগরিবের সময় আমরা জামে মসজিদে পৌঁছে গেলাম। মসজিদে উপস্থিতির সংখ্যা ছিলো প্রচুর। বিশেষতঃ গাশতে যাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো তাদের অনেককে দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ হলো। তারা নাওয়া ধোয়া করে ধোপদুরস্ত কাপড় পরে এক নতুন জীবন শুরু করার অপেক্ষায় ছিলো। আল্লাহ তাদের 'অবিচলতা' দান করুন। আমীন। নামাযের পর আমীর ছাহেব আমাকে বয়ান করতে বললেন। আমি বুঝতে পারিনি, আল্লাহ আমাকে দিয়ে কি কথা বলিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অপার করুণায় প্রত্যাশার চেয়ে বেশী আছর হলো এবং বেশ উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়লো। ফলে বয়ান শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত কোন তাশকীল ছাড়াই পঁচিশজন ব্যক্তি তাবলীগী জামা'আতের জন্য নাম পেশ করলো। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিও তাঁর নাম পেশ করলেন। তাঁকেই জামা'আতের আমীর নির্বাচন করা হলো। আলহামদু লিল্লাহ।

.... যেহেতু এখানেই অবস্থান করছেন। সেহেতু তাঁকে জামা'আত পরিচালনা করা এবং উছূল মুতাবেক কাজের তত্ত্বাবধান করার জন্য নিযুক্ত

করা হলো। জলসার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সাক্ষাৎকারীদের আসা যাওয়া অব্যাহত ছিলো। আল্লাহ পাক তাদের আবেগ উদ্দীপনা বহাল রাখুন এবং তাদের নিয়তে অবিচলতা ও বরকত দান করুন। আমীন। খানা থেকে ফারেগ হয়ে জামা'আত নিজ নিজ সামান উঠিয়ে স্টেশনে উপস্থিত হলো এবং সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে গেলো। আড়াইটার গাড়ী আসলো। আলহামদু লিল্লাহ এই যুদ্ধকালীন সংকটের সময়ও একটা বগী পাওয়া গেলো যাতে আরামসে পুরো জামা'আতের জায়গা হয়ে গেলো। চার পাঁচজন 'অল্পবয়স্ক' সদস্যের তো শোয়ারও জায়গা হয়ে গেলো। ফজরের নামায রেলগাড়ীতেই সকলে আদায় করলো। মেহেরবান আল্লাহ নামাযের যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সোমবার সকাল পৌনে আটটায় ফিরে আসা হলো। প্লাটফর্মে দু'আ করার পর পরস্পর মু'আনাকা ও আলিংগন করে সকলে নিজ নিজ ঘরে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

এ সফরের বিশেষ কিছু অনুভূতি

.... ছাহেব আমীরের দায়িত্ব এতো সুচারু রূপে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, অন্তর খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেলো। আমি আজ পর্যন্ত যত জামা'আতে শরীক হয়েছি কোন আমীর ছাহেবকে তাঁর মত সুযোগ্য ও কর্মতৎপর দেখিনি। রেলের সফরে প্রত্যেক সাথীর আরামের খেয়াল রাখা, বড় হওয়া সত্ত্বেও নিজের সামানের সাথে অন্যান্য সাথীর সামান জোর করে নিয়ে নেওয়া, খানা খাওয়ার সময় গ্লাস ভরে ভরে পানি খাওয়ানো, দস্তরখানে সকলে আরামে বসার পর নিজে খেতে বসা, রেলে নামাযের সময় নিজ হাতে সবাইকে অযু করানো, অযুর সময় আংগুল খেলাল করাসহ যাবতীয় সুন্নত মুস্তাহাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, শয়নকারীদের হেফাজতের খেয়াল রাখা, অধিক যিকিরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, ইত্যাদি কোন্ কোন্ বিষয় তুলে ধরবো? খেদমতের এমন সুউচ্চ মানদণ্ড তিনি স্থাপন করেছেন যে, আমাদের অন্য কারো তাতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হওয়া খুবই মুশকিল মনে হয়। এ সফরের সবচে' বড় অনুভূতি হলো পার্থিব মর্যাদা, অর্থ সম্পদ ও বয়স সর্ববিচারে আমাদের সবার বড় ব্যক্তিটির এভাবে সকলের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার প্রানান্ত প্রচেষ্টা। এই সেবা-প্রেমের কল্যাণে আল্লাহ পাক তাঁর উপর বিশেষ করুণা ও রহমত বর্ষণ করুন।

(দুই) আমীর ছাহেবের পরে .... ছাহেব তার ব্যক্তিত্ব দ্বারা আমাদেরকে বিশেষ প্রভাবিত করেছেন। প্রত্যেক বেলার খানা ও চা তৈরী করা, টিকেট সংগ্রহ করা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি অত্যন্ত সুচারু রূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। নিজের থেকে সমস্ত খরচ চালিয়ে গেছেন এবং সফরের পর প্রত্যেক সাথীকে বিশদ হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে পাওনা টাকা উশুল করে নিয়েছেন। কর্মকুশলতা ও পরিচালনা দক্ষতার তিনি এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আল্লাহ তার আবেগ ও জযবার আরো উন্নতি দান করুন।

(তিন) এর আগে আর কোন তাবলীগী সফরে যারা অংশ নেননি। তারা সকলে একবাক্যে বলেছেন যে, এ সময়গুলো ছিলো তাদের জীবনের সর্বোত্তম সময়। এমন সান্নিধ্য ও এমন আনন্দ জীবনে তাদের কখনো জুটেনি।

শিক্ষা ও শিক্ষাদানের এ রূপরেখায় আরো উন্নতি ও উৎকর্ষের অবকাশ রয়েছে। মাওলানা (রহঃ) এটাকে এতো পূর্ণাংগ ও সর্বাংগীন দেখতে চাচ্ছিলেন যাতে দ্বীন ও ইলমের সকল স্তরের মানুষ দীক্ষা ও উন্নতি লাভের পূর্ণ সুযোগ পেতে পারে। তাঁর চিন্তায় আলিম শ্রেণীর জন্য এ বিষয়ে তাদের ইলমী স্তর ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলাদা রূপরেখা ছিলো। এক পত্রে তিনি লিখেছেন—

আলিমদের জন্য আরবী জ্ঞানরাজি, ছাহাবা কেরামের কালাম ও বাণী, কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল এবং দ্বীন প্রচারে উদ্বুদ্ধকরণবিষয়ক 'মযমুন' সংগ্রহ ও সংকলন করার বিশেষ চিন্তাভাবনা ও সযত্ন প্রয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। ইলমসেবী মহলের জন্য এটা তৈরী হয়ে যাওয়া ভীষণ দরকার। এ ছাড়া আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইলমী অবনতি এবং অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। বস্তুতঃ উপরোক্ত কাজ উত্তম রূপে সম্পন্ন হওয়া না হওয়ার উপর ইলমসেবী মহলের আন্দোলনে আসা না আসা নির্ভর করছে। এ বিষয়ে অধম বান্দার মস্তিষ্কে এমন কিছু চিন্তা ভাবনা রয়েছে যা 'সময়ের পূর্বে হয়ে যাওয়ার আশংকায় মুখে আনতে মনে চায় না।

প্রকৃতপক্ষে ইলম ও দাওয়াতের এই সমগ্র ব্যবস্থা কাঠামোতে উৎকর্ষ সাধন ও উন্নততর রূপায়ণের বিরাট অবকাশ আছে। যুগের সাথে চলার, দ্বীন বিরোধী আন্দোলনের মুকাবেলা করার এবং সাধারণ মানুষের জন্য সেগুলোর

উত্তম বিকল্প হওয়ার পূর্ণতম যোগ্যতা এতে রয়েছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে, বর্তমান যুগের ধর্মহীন আন্দোলনগুলোর সবচে' বড় শক্তি এই যে, প্রথমেই তারা জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে তাদের নিজেদের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলে। তাদের প্রচারক ও কর্মীরা হয় বাস্তববাদী, কর্মনিষ্ঠ ও উদ্যমী মানুষ। ত্যাগ ও আত্মত্যাগের মনোভাবে উদ্দীপ্ত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের খাতিরে সব ধরণের কষ্ট স্বীকারে সদা প্রস্তুত। সাধারণ মানুষকে ব্যস্ত ও নিমগ্ন রাখার জন্য তাদের কাছে রয়েছে আকর্ষণীয় কর্মসূচী। আর এ সবই হচ্ছে আজকের অস্থিরচিত্ত মানুষের জন্য চৌম্বকীয় আকর্ষণের অধিকারী। এ সকল ধর্মহীন আন্দোলনের মুকাবেলা করার জন্য নিছক তত্ত্ব ও দর্শন যেমন উপযোগী নয় তেমনি মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্কহীন কাগুজে পরিকল্পনা ও যুক্তিতর্কও অর্থহীন। তদ্রূপ যে সকল দাওয়াত ও কর্মসূচী খাওয়াছ ও বিশিষ্ট লোকদের বৃত্তে আবর্তিত এবং সর্ব সাধারণকে সম্বোধন করা ও কর্মোদ্যেগী করার যোগ্যতাহীন সেগুলো দ্বারাও হালে পানি পাওয়ার কোন উপায় নেই। এই ধর্মহীন (কিংবা কমপক্ষে জড়বাদী) আন্দোলনগুলো সমস্ত দুনিয়াতে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের চক্রান্ত জাল সারা দুনিয়ায় বিছানো রয়েছে। সুতরাং সেই দ্বীনী আন্দোলনই শুধু এগুলোর সার্থক মুকাবেলা করতে পারবে যার নিবিড় সম্পর্ক হলো মাটি ও মানুষের সাথে। যে আন্দোলন সর্বসাধারণের সাথে সংযোগ ও সখ্যতা গড়ে তোলাকে মনে করে অপরিহার্য। যে আন্দোলনের কর্মীরা মানব সমাজের কোন শ্রেণীকেই উপেক্ষা করে না। গরীবের কুঁড়ে ঘর ও আমীরের বালাখানা সর্বত্র যাদের সমান গতিবিধি। মজদুরের সাথে তারা উঠাবসা করে এবং রাখালকেও সম্বোধন করে। কর্মচঞ্চলতা ও কর্মোদ্যম এবং সহনশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতায় ধর্মহীন আন্দোলনের উৎসাহী কর্মীদের চেয়ে কোন অংশেই তারা কম নয়। পক্ষান্তরে হিতাকাঙক্ষা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অনেক উপরে। কেননা তারা শুধু মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন চায় এবং তাদের বাহ্যিক দুরবস্থার ব্যাপারেই দরদ ও উৎকণ্ঠা অনুভব করে। অথচ দ্বীনী দাওয়াতের কর্মীদের কাজ ও দায়িত্ব এর চেয়ে অনেক উন্নত ও ব্যাপক। আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে ভুলে যে পাশবিক জীবনের পাপ পংকে ডুবে আছে তাদের অন্তরে রয়েছে সে ব্যথা। সেই পাপ পংক থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে তারা উদ্ধার করতে চায়। তাদের ধর্মীয়, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও

চিন্তানৈতিক অবস্থার সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধন করতে চায়। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ, ইসলামী শিষ্টাচার ও ইলমের পিপাসা জাগ্রত করতে চায়। তদুপরি এ দাওয়াতকর্মীরা হবে নিবেদিতপ্রাণ ও নিঃসার্থ মানুষ; যারা নিজেদের ভার নিজেরাই বহন করবে। অন্য কারো গলগ্রহ হবে না। তাহযীব ও সভ্যতা, আখলাক ও শিষ্টতা এবং শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য ও সুফল অর্জনের জন্য তাদের কাছে থাকবে অধিকতর সহজ ও কার্যকর পন্থা, যা বড় ধরনের অর্থ ব্যয় ছাড়াই উন্নত ফলাফল ও শুভ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। তারপর তাদেরকেও একই কাজে ও দায়িত্বে যুক্ত করব এবং অন্তহীন এক কর্মব্যস্ততায় তাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিবে। অর্থাৎ তাদের জীবন–বিপ্লবের জন্য অন্যরা যে মেহনত ও পরিশ্রম করেছে সে মেহনত ও পরিশ্রম তারাও শুরু করবে অন্যদের জীবনে ধর্মমুখী বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে। এই দাওয়াত–কর্মীদের কাছে থাকবে এমন কর্মসূচী ও ব্যবস্থা কাঠামো যা উম্মতের সকল শ্রেণী ও তবকার মাঝে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার সেতুবন্ধ রচনা করবে। উদ্দেশ্যের ঐক্য, একত্র সমাবেশ, সফরের সাহচর্য, পারস্পরিক সেবা ও সহযোগিতা এবং একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগ তাদের অন্তরে প্রবাহিত করবে প্রেম ও মুহব্বতের অন্তহীন ফল্গুধারা। কাজের এমন এক সম্ভাবনাময় পথ তারা খুলে দেবে যেখানে যুবসমাজ তাদের প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মশক্তি ব্যয় করার সুযোগ পাবে। যুবস্বভাবের জন্য এ এক অপরিহার্য প্রয়োজনও বটে। কেননা শুভ, সুন্দর ও সঠিক পথ না পেলে তারা ভুল পথে ছুটতে শুরু করবে। তখন ধ্বংসের শেষ মাথায় না গিয়ে তারা আর থামবে না।

মাওলানা মোহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) যে দাওয়াত পেশ করেছেন তাতে উপরোল্লেখিত এ সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে এবং উপস্থাপিত রূপরেখায় আরো বেশীরও অবকাশ রয়েছে। কেননা তা আসমানের অহী নয়। কোরআন ও হাদীছের সমঝ, দ্বীনের মূলনীতি ও তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান–এর আলোকনির্দেশে বর্তমান যুগে তিনি কাজের এক পদ্ধতি পেশ করেছেন এবং কোরআন সুন্নাহর সুগভীর অধ্যয়ন ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এর কিছু মূলনীতি ও নিয়মকানুন নির্ধারণ করেছেন, যা শরীয়ত থেকেই আহরিত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, তা অসংখ্য কল্যাণের উৎস। এখন শুধু প্রয়োজন এই যে, যাদেরকে আল্লাহ দ্বীনের ইলম ও

জ্ঞান এখলাছ ও আত্মনিবেদন এবং আকল ও সুবুদ্ধি দান করেছেন, তদুপরি যুগের চলতি হাওয়া ও ধারা প্রবাহ সম্পর্কেও বেখবর নন, তারা এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন এবং নিজেদের কর্মোদ্দীপনা, সাংগঠনিক শক্তি, আল্লাহ প্রদত্ত কুশলতা, উছূল ও নিয়মনিষ্ঠা, সর্বোপরি আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে একে উন্নত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

বিপদাশংকা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। ধর্মহীন আন্দোলনগুলো যে প্রবল গতি ও শক্তিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যে ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে এবং ফলতঃ ধর্ম ও ধর্মপ্রাণ লোকদের জন্য যে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা এখন কারো জন্যই প্রচ্ছন্ন বিষয় নয়। যদিও আমাদের দ্বীনী ও ইলমী মহলে এখনো বিপদের পূর্ণ অনুভূতি নেই এবং সার্বজনীন দাওয়াত, সার্বজনীন তালীম ও তারবিয়াত এবং সার্বজনীন প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রতি যথার্থ মনোযোগ ও সচেতনতা নেই। কিন্তু অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ হয় না, এটা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবো ততই মঙ্গল।

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ * اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ *

সমাপ্ত